ধুলোবালি

ধুলোবালি

বুদ্ধদেব গুহ

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

সকাল এগারোটা।

জিষ্ণু আর পরী বেরিয়ে গেছে অফিসে। কাক ডাকছে আলসেতে। হেমপ্রভা বারান্দাতে বসে আছেন চা খাওয়ার পর। এমন সময় ফোনটা বাজলো।

"হ্যালো।"

"কেমন আছো?"

ওপাশ থেকে হীরুবাবু বললেন।

"ভালোই। তবে আজ একাদশী তো! পায়ের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। তুমি কেমন আছো?"

"আর থাকা! চলে যাচ্ছে। রোজ সকালে আমার পায়ের পাতা দুটো আর ডান পা'টা গোল হয়ে ফুলছে।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন?"

"দেখাবো। হিতেন ডাক্তারকেই তো দেখাই। তবে ও আজকের আর কালকের দিনটা একটু ব্যস্ত থাকবে তো। অবশ্য গোদা কম্পাউণ্ডারকেও দেখিয়েছি। ওর ওখান থেকেই করছি ফোন। জাইলোরিক ট্যাবলেট দিয়েছে। ইউরিক এসিডের জন্যে। সারাজীবন খেতে হবে। সকাল বেলা একটি করে।"

"কম্পাউণ্ডারের ওষুধ খাওয়ার কী দরকার! ডাক্তার ব্যস্ত থাকবে কেন?"

"বাঃ। কাল শনিবার নয়? ঘোড়দৌড়ের দিন! আজ তারই প্রস্তুতি।"

"সে কি! রেসুড়ে ডাক্তার জোটালে কোত্থেকে?"

"আরে ও রেস খেলে থোরী! ও যে ঘোড়ার ডাক্তার। শুক্র আর শনিবারে মাঠে ওকে যেতেই হয়।"

"তাই বলো! এতোদিনে ঠিক ডাক্তারই ধরেছো। তুমিও তো ঘোড়াই।"

কথাটা গায়ে না মেখে হীরু বললেন, "শ্রীমন্ত কোথায়? তুমি একলা হবে কখন?"

"আজ ও নেই-ই । দেশে গেছে ।"
"কেন ?"
"কুকুরে কামড়েছে ছেলেকে ।"
"আর মোক্ষদা ?"
"সে তো মাসের প্রথম শুক্রবারে এই সময়ে থাকে না । জানোই তো !"
"মোক্ষদাও নেই এবং শ্রীমন্তও নেই আর তুমি এতক্ষণে আমাকে একটা ফোন করতে পারলে না ! বেশ লোক তো !"
"আমার বয়েই গেছে। যতো বয়স বাড়ছে তোমার এসবও আরো বাড়ছে।"
"বয়স কী বয়সে হয় হেম ! বয়সকালে স্বধর্মকে বেশি গলাটিপে রাখলে অসময়ে তা প্রকট হয় । এই নিয়ম । যা ভবিতব্য তাই ঘটছে । বুঝেছ হেম ।"
"বুঝছি কী আর না ! ভয় হয়, কোনদিন জিষ্ণু আর পরীর কাছে ধরাই না পড়ে যাই । ইতিমধ্যেই পড়েছি কী না কে জানে ? পরীর হাবভাব আমার ভালো লাগে না আজকাল । বড়ই উদ্ধত হয়েছে । আমাকে বিশেষ রকম তাচ্ছিল্য করছে । ভয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারি না কিছু । মুখের ওপর যদি বলে দেয় খারাপ কিছু ? ভয় করে বড় ।"
"আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি ।"
হঠাৎ অচেনা গলা বলে উঠলো ফোনে ।
হীরু বললেন, "কে ? কে ? কী বলছেন ?"
হেম চুপ করে গেলেন । বিপদের গন্ধ মেয়েরা অনেকই আগে পায় ।
"কে ?"
আবার বললেন হীরু ।
"বুড়ো বয়সে কী প্রকট হয় বলছিলি রে বুড়ো ?"
"কে আপনি ?"
"আমি তোমার যম । সবাইকে বলে দেব ।"
"কী ? কী বলে দিবিরে ছোঁড়া ? বাঁদর কোথাকার ।"
হীরু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন ।
অপর প্রান্ত বললো, "যা বললে ফাঁসবি তোরা বুড়োবুড়ি ।"
"কী । কী ইয়ার্কি হচ্ছে ?"
"ইয়ার্কি নয় বাপ ! সব সত্যি । তুমি আমাকে না চিনলে কী হয় আমি তোমাকে চিনি । দেখো কী করি ! মা-ন-তু ।"
"ধ্যেৎ ।"
বললেন, হীরু ।
হেমপ্রভা নীরব ।

"আমি ছেড়ে দিচ্ছি । বুঝেছো ! কোনো চ্যাংড়া ছোঁড়ার সঙ্গে ক্রস-কানেকশন হয়েছে ।"

হীরু বললেন ।

"হ্যাঁ গো কেষ্ট ঠাকুর । আমি হলাম গিয়ে চ্যাংড়া আর তুমি তো ভ্যাংডা হয়েও রসের বন্যা বওয়াচ্ছো ।"

"চোপ্ । এক চড়ে দাঁত ফেলে দেবো ।"

বলেই, রিসিভার নামিয়ে রাখলেন হীরু । প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলেন । কপালের শিরাগুলো দপদপ করছিলো । হীরু ফোন করছিলেন গোদা কম্পাউণ্ডারের ডাক্তারখানা থেকেই । হিতেন ডাক্তার বিকেলে এখানেই বসেন ছ-ঘণ্টা । গোদা কম্পাউণ্ডারবাবুকে নিজের সি এ বি-র সীজন টিকিটখানা প্রতি ক্রিকেট মরশুমে দিয়ে দেন হীরুবাবু । তাতেই বন্ধুত্ব অটুট আছে । ছিপছিপে কম্পাউণ্ডারবাবুর নাম গোদা । হীরুর চেয়ে একটু ছোটই হবে বয়সে । আজকাল লাল-নীল মিক্‌চার কলকাতাতে আর বানানোর চল নেই । আজকালকার ডাক্তারেরা তেমন প্রেসক্রিপশন লিখতেই জানে না । তাই কাজের মধ্যে ইনজেকশান দেওয়া, ড্রেসিং করা ; এই । কিছু রেগুলার বুড়ো রসিক পেশেন্ট আছেন । হর্মোন ইনজেকশান নিতে আসেন । নিউমার্কেট থেকে চড়াই পাখি কিনে নিয়ে এনে ভেজে খান । তাতে নাকি "ফাকিং-পাওয়ার" বাড়ে ।

চক্কোত্তি সাহেব বলেছিলেন গোদাকে ।

রোজ সল্ট লেক থেকে ইনজেকশান নিতে আসেন চক্কোত্তি সাহেব । নিজে কাকে ইনজেকশান দেন তা অবশ্য জানা নেই গোদার । নিজের স্ত্রীকে নিশ্চয়ই নয় । স্ত্রীকে দেখলে মনে হয় চক্কোত্তি সাহেবের ঠাকুমা । তিনি এসব রিপুমুক্ত হয়ে গেছেন অনেকদিন আগেই । সাঁই-বাবাই এখন তাঁর সব কিছু ।

গোদা বললো হীরুকে, "আরে চটো কেন? তাও তো বেঁচে গেছো যে, বে-থা করোনি । আমার বাড়িতে জ্যাঠতুতো দাদার মেয়েটা কলেজে যায় । তাকে যে কত চ্যাংড়ায় ফোন করে তা কী বলব ! আর তাদের কথার কী ছিরি ! শুনলে গা গরম হয়ে যায় । আমরা কোনো কথা বলার আগেই ঝড়ের মতো বলে দেয় । শালার কী দিনকালই যে হলো ।"

আমি বলি, "হ্যালো" –

উত্তরে সে বলে, "দূর শালা ! খ্যাঁচা বাপটা ধরেছে মাইরী । ফোন করার পয়সাই জল !"

হীরু হাসেন । গোদার কথা শুনে । তারপর বলেন, "পুলিশে খবর দাও না কেন ?"

"ভালোই বলেছো । আস্তো মেয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাই পুলিশ কিছু বলে না আর ফোন । কাল বিকেলে মহাসমারোহে পাড়ার সবকটা রিক্সাওয়ালাকে ধরে

নিয়ে গেলো । তাদের কী অপরাধ জানা গেল না । হল্লা এসেছিলো । আজ সকালেই দেখি তারা নিজের জায়গাতে ডিউটিতে ।"

"কী ব্যাপার ?"

"ওরা বললো, জন প্রতি একশো টাকা করে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ।"

"কীসের টাকা ?"

"বড়বাবুর মেয়ের বিয়ের প্রেজেন্ট । বড়বাবুর ছোট মেয়ের নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে ।"

গোদা কম্পাউণ্ডার বললো, "কী হবে এসব দেখে মন খারাপ করে । তার চেয়ে চলে যাও দাদা যেখানে যাচ্ছো । আমাকে তো একদিনটির তবে দেখালেও না মাইরী তোমার সোনার মূর্তিটিকে । কী যেন নাম ? হেম না কী যেন ! আমি কি তোমার ভাগে ভাগ বসাতুম ? তবে চালিয়ে তো গেলে ! প্রায় তিরিশ বছর হতে চললো । কী গো ? এবারে ইনজেকশানটান লাগলে বোলো । প্রবলেমটা বললেই হলো । সল্যুশান তো আমারই হাতে ।"

হীরু চিন্তান্বিতভাবে আবার ফোনটা ওঠালেন । ডায়াল ঘোরালেন । বললেন, "হ্যালো ।"

"আনন্দবাজার । কাকে চাইছেন ? ও । দয়া করে একটু ধরুন, একটু ধরুন । লাইন এনগেজ আছে ।"

"শুনুন, শুনুন, কত নম্বর ? নম্বরটা কত ?"

"এক্সটেনশান নাম্বার দিয়ে কী হবে ? এই নিন । দিন, 'দেশ'-এর ঘরে ।"

"হ্যালো । বলুন, আমি সঞ্জীব বলছি ।"

"সঞ্জীববাবু ? মানে ? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ?"

"হ্যাঁ ।"

"সঞ্জীববাবু, আমার কী সৌভাগ্য ।"

হীরু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন ।

"আমারও খুব সৌভাগ্য । আপনার জন্যে কী করতে পারি ?"

রসিক সঞ্জীববাবু বললেন ।

গদগদ হয়ে হীরুবাবু বললেন, "আজ্ঞে আপনাকে কিছুই করতে হবে না । রং-কানেকশানের দৌলতে আপনার সঙ্গে আজ কথা হয়ে গেলো । ভালো থাকবেন স্যার । ভালো লিখবেন । আমি আপনার একজন গ্রেট অ্যাডমায়রার । অবশ্য অগণ্যজনের মধ্যে একজন ।"

"অনেক ধন্যবাদ ।"

"নমস্কার ।"

"নমস্কার ।"

গোদা বললো হীরুবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, "হলোটা কি তোমার ?"

"আজ দিন খুব খারাপ। আবার খুব ভালোও। ভালো কারণ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। পড়েছো, ওঁর শ্বেতপাথরের টেবিল ? অন্য কোনো বই ?"

গোদাবাবু লেখাপড়ার ধার ধারেন না বিশেষ। তবে খবরের কাগজ পড়েন। বললেন, "ওঁর 'মেক্সিকো' পড়ছি আনন্দবাজারে। রবিবারে রবিবারে। দারুণ লাগছে।"

বলেই বললেন, "এ কলকেতা শহর। আর টেলিফোন ফেলিফোনের চেষ্টা না করে দুগগা বলে বেরিয়ে পড়ো তো দাদা। শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। রোদও চড়া হচ্ছে ক্রমশ।"

হীরুবাবু যখন ট্যাক্সি ধরে পৌঁছলেন গিয়ে হেমপ্রভার বাড়িতে তখন বেলা সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা। হেমই দরজা খুললেন।

"বাঃ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

হীরু বললেন।

"তুমি তো রোজই সুন্দর দেখছো আমাকে গত তিরিশ বছর ধরেই।"

"তা দেখি। মিথ্যে বলবো না।"

"মিথ্যে এই একটা ব্যাপারে না বললে কী হয়। মিথ্যেতে তো আপাদমস্তকই মোড়া তুমি। মোড়া আমাদের এই সম্পর্কও। যার বিয়ে করার সাহস হলো না আমাকে সমাজের ভয়ে, তাকে আর যাই বলি, সাহসী তো বলতে পারি না।"

"ভয় শুধু আমার কারণেই নয়। যদি সকলে জানতো যে পরী আমারই মেয়ে, স্থিরব্রতর মেয়ে নয়, তবে যে সম্মান আজ তুমি পরী এবং জিষ্ণুর কাছে পাও তা কি পেতে ?"

গম্ভীর মুখে হেমপ্রভা বললেন, "সেই সম্মানেই টান পড়েছে এখন। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। যদি সত্যিই ওরা জেনে যায় তবে ইহকালও গেলো, পরকালও। তাছাড়া ওরা তো চিরদিন আমার থাকবে না। জিষ্ণুর বিয়ে হলেই সে পর হয়ে যাবে। আজকালকার মেয়েদের তো দেখছিই। হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে দিয়েই চলে যাবে বৌ-এর হাত ধরে নতুন ফ্ল্যাটে। পরীও চলে যাবে স্বামীর সঙ্গে। তখন ?"

"তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি তখন তোমার কাছে এসেই থাকবো। মরার সময়ে যেন তোমার কোলে মাথা দিয়েই মরতে পারি।"

"বাজে কথা থাক। আমাকে যে অজুহাত দেখিয়ে গেলে সারাটা জীবন সে অজুহাত তোমার আর টিকবে না। সোনার মূর্তিও কালো হয়ে যায়। সময় বড় বলবান। ধুলোবালি সব জায়গাতেই পৌঁছয় হীরু।"

তারপর হেম একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কী খাবে ? খেয়ে যাও আজ

আমার সঙ্গে । ফিরে গিয়ে তো গদাধরের ঐ ঠাণ্ডা খাবার গিলবে । বড় অবহেলা করে ও তোমাকে ।”

“আমিও তো কম অবহেলা করিনি ওকে । তিরিশ বছর কাজ করছে আমার কাছে । কিন্তু কী দিয়েছি ওকে ? মুখের কথা ছাড়া ? তাছাড়া এ বয়সে যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো ।”

“সংযম বুঝি কেবল খাবারই বেলায় ?”

“হ্যাঁ ।”

হেসে ফেলে বললেন হীরু ।

“চলো, ঘরে বসবে তো !”

“বসবার জন্যে কি এসেছি ? না কি খেতে ?”

“আসো নি ?”

ধরা-পড়া হাসি হাসলেন হীরু । লজ্জার হাসি ।

বললেন, “স্বীকার করতে লজ্জা নেই ।”

“তা জানি । তোমার মতো নির্লজ্জ কমই আছে ।”

বিছানাতে গিয়ে বসলেন হেমপ্রভা । বয়স চল্লিশের কোঠার শেষে । কিন্তু শরীরের গড়ন-পেটন এতটুকু নষ্ট হয়নি । পরী ওঁর শরীরের বাঁধনটি পেয়েছে এবং হীরুর নাক-চোখ এবং দৈর্ঘ্য । স্থিরব্রত বেঁটে ছিলেন । তাই পুরুষের চোখ একবার পরীর উপরে পড়লে আর নড়ে না । পরী ডানা-কাটা পরীরই মতো সুন্দরী । কিন্তু হেমপ্রভার মুখের আলগা সৌন্দর্যটি পায়নি সে । অবশ্য যা পেয়েছে, তা খুব কম বাঙালী মেয়েই পায় ।

“জানালাগুলো বন্ধ করে দাও ।”

“সব ?”

“সব । বৃষ্টি আসছে ।”

“ঘরে, না বাইরে ?”

হেম হেসে বললেন, “ঘরে-বাইরে ।”

তারপর শাড়িটা ছেড়ে রাখলেন চেয়ারের উপরে । শায়া আর ব্লাউজ পরেই বিছানাতে গিয়ে শুলেন ।

“ব্লাউজটা খুলবে না ? ভিতরের জামা ?”

“না ! অত শখে আর কাজ নেই ! দিনের বেলা । কখন কে এসে পড়ে !”

“আহা ! রাতের বেলা কবে যেন আদর খেয়েছো আমার ! পরীও তো এসেছিল দিনের বেলাতেই ।”

“হ্যাঁ । দিনের পরী বলেই আসল পরী হলো না ।”

জানালা বন্ধ করতে-থাকা হীরুকে বললেন হেম ।

হীরু বিছানাতে গিয়ে যেই বসলেন অমনি নিচে কলিং বেল বাজলো ।

"দেখলে ! বলেছিলাম ! কথা শোনো না তুমি ।"

বিরক্ত ও উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন হেমপ্রভা ।

"তুমি থাকো । আমিই বরং দেখে আসি ।"

"না, তুমি খাওয়ার ঘরে গিয়ে বোসো । আমিই দেখছি ।"

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে হীরুবাবু ভাবছিলেন ছোট স্টেশানের স্টেশানমাস্টারেরা যেমন রাতের বেলার মেল ট্রেনকে বাতি দেখাতে হয় বলে দিনের বেলাতেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন নিরুপায়ে, ওঁর দশাও তেমনই ।

নিচে গিয়ে দরজা খোলার আগে আরও দুবার বেলটা বাজলো ।

দরজা খুলেই হেম দেখলেন তারিণীবাবু । রঙ-জ্বলে যাওয়া নীল-রঙা প্যান্টটার জায়গাতে তালি । সাদা সুতো দিয়ে । জামাটাও ছেঁড়া । কাঁধের কাছে । হাতে একটা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ছাতা । মুখটা গরমে তেতে বেগুনী হয়ে উঠেছে । হাঁপাচ্ছিলেন বৃদ্ধ তারিণীবাবু ।

"কী ব্যাপার ? না বলে-কয়ে এমন অসময়ে ?"

বিরক্ত গলায় ভুরু কুঁচকে বললেন হেম ।

"কোনো সময়ই তো আপনার সুসময় নয় । এদিকে আমিও আর পারি না যে হেম দেবী ।"

তারিণীবাবু এ বাড়ির বাড়িওয়ালা । তিরিশ বছর আগে তিরিশ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন । তারিণীবাবুর দুই ছেলেই ভালো চাকরি করে । কিন্তু বিয়ে করে অনেকদিনই আলাদা হয়ে গেছে । অবশ্য চাকরির কারণেও । একজন থাকে ইংল্যাণ্ডে । পাঁচ বছরে আসে একবার । অন্যজন জামশেদপুরে আছে । সে আসেই না । হয়তো কলকাতার খুব কাছে বলেই । মেয়ের বিয়ে হয়েছে চিত্তরঞ্জনে । জামাই নবকুমার অতি সাধারণ চাকরি করে লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরীর স্টোর্স-এ । ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা একেবারে ল্যাজে গোবরে । মেয়ে কাছে থাকলে হয়তো দেখতো কিন্তু তারিণীবাবুকে দেখার সামর্থ্য সে রাখে না । বৃদ্ধ এখন তিনশো টাকা পেনশান পান । পেনশানের এখনকার রমরমা তখনকার দিনে ছিলো না । বাড়ি ভাড়া তিরিশ বছরে তিরিশ থেকে বেড়ে হয়েছে একশো তিরিশ । আর বাড়েনি । হেমপ্রভাই বাড়াননি । অনেকবারই বলেছেন তারিণীবাবুকে, কোর্টে যান, অসুবিধে হলে ।

"হৈমদেবী । একটু জল পেতে পারি কি ?"

তারিণীবাবু বললেন ।

হেমপ্রভাকে তারিণীবাবু চিরদিনই হৈমদেবী বলেন । হেমপ্রভা কোনোদিনও আপত্তি করেননি ।

শুকনো গলায় হেমপ্রভা বললেন, "আসুন । ভিতরে এসে বসুন ।"

ওঁকে একতলার বসার ঘরে বসিয়ে হেমপ্রভা খাবার ঘরে এলেন দোতলা‍ে

হীরু বললেন, "কোন্ আপদ ?"

"বাড়িওয়ালা তারিণীবাবু । আপদেরও বাড়া । সেই ঘ্যান্‌ঘ্যানে আবদার । ভ বাড়াও ।"

"বাড়ি তো তোমাদেরই হয়ে গেছে । পাঁচ-দশ হাজারে কিনে নাও এখন । ব ভাড়াটে করছে । এখন তো ভাড়াটেদের দিকেই আইন । পুরোনো বাড়িওয়ালারা কেঁ কূল পাচ্ছে না ।"

তাড়া ছিলো, তাই কথার উত্তর না দিয়ে ট্রেতে করে ঠাণ্ডা জলের বোতল আ গেলাস নিয়ে গেলেন হেম । দুটি রসমুণ্ডি ছিলো ফ্রিজে কেষ্ট ঠাকুরের জন্যে তা নিলেন একটি প্লেটে ।

রসমুণ্ডিটা খেলেন না তারিণীবাবু । বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে পুরো বোতলে ঠাণ্ডা জলই খেয়ে ফেললেন ।

"আঃ । বড় পিপাসা পেয়েছিলো । মে মাসের গরম ।"

"বলুন, কী বলতে এসেছেন ।"

রুক্ষস্বরে হেম বললেন ।

"আমি তো একা । জানেনই তো । স্ত্রী তো গত কুড়ি বছর গত হয়েছেন ।"

"সে তো কুড়ি বছর হলোই জানি ।"

"এখন থাকবার মধ্যে আছে একটি কুকুর ।"

"কী কুকুর ? অ্যালসেশিয়ান ?"

"আজ্ঞে না । মালিকই খেতে পায় না তা অ্যালসেশিয়ান রাখবো কী করে সে একটি নেড়ি কুত্তা ।"

"অ !"

"আমি আর সে খাই । দুটি পেট । তিনশো পেনশান আর একশো তিরিশ ভাড়াতে কত হয় ?"

"চারশো তিরিশ ।"

"ভাগের বাড়িতে দেড়খানা ঘর পেয়েছি । তাতেই আছি গত পনেরো বছর তাও করপোরেশান ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিলে চলে যায় মাসে তিরিশ, মানে গড় হিসেবে ধরলে । চারশোতে কি চলে বলুন ? বাতের ওষুধ ব্লাড-প্রেসারের ওষুধ আছে, হার্টের ওষুধ আছে । এ সবেই তো চলে যায় একশো ।"

"সংক্ষেপে বলুন । আমার তাড়া আছে । একজন অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে ।"

"তা তো হতেই পারে । ভাড়াটা কি আর অন্তত একশো বাড়ানো যায় না ? মাসে ?"

"টাকা কি খোলামকুচি ?"

"জানি, তা নয় ।"

"কিন্তু আজ এবাড়ি ফাঁকা হলে কম পক্ষে এক হাজার টাকা ভাড়া হতো ।"

"তা হতো । কিন্তু এক বছরে বারোমাস । তিরিশটি বছর ধরে যে ভাড়া পেয়েছেন তা আজ জমিয়ে ব্যাঙ্কে রাখলে কত সুদ পেতেন ? হাজার টাকার উপরে । সেই সুদের টাকাটা আমার লস ।"

কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকলেন তারিণীবাবু হেমপ্রভার দিকে । ছাতাটা দিয়েই মুখের ঘাম মুছলেন । বুড়োরা শিশুদের মতো ইল-ম্যানারড্ হয় । জীবনের শেষে এসে ম্যানার্স-এর মতো ঐসব বাড়তি ফালতু আড়ম্বরের অসারতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়ে যান বলেই হয়তো ।

একটু দম নিয়ে তারিণীবাবু বললেন, "হেমদেবী, জিষ্ণুর অফিসের ঠিকানাটা দিতে পাবেন ?"

"অফিসটা তো কাজের জায়গা । উমেদারীর নয় । তাছাড়া আপনার ভাড়াটে তো আমি । জিষ্ণুর কী বলার থাকতে পারে এ ব্যাপাবে ? আপনারও তো তাকে বলার কিছুই নেই ।"

"তা জানি । তবে কোন সময় এলে ওকে বাড়িতে পাবো ?"

"এসে লাভ কী ? ওব কাছে ? তাছাড়া কখন থাকে না থাকে তা ঠিক বলতে পারি না । আজকালকার ছেলে ।"

"তবে হীরুবাবুর বাড়িতেই কি যাবো ?"

"হীরুবাবু ? তিনি আমাদেব কে ?"

হেম অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন ।

"কেউই নন ?"

অবাক এবং আহত গলায় শুধোলেন তারিণীবাবু ।

"কেউই নন তা বলবো না । দূর সম্পর্কেব আত্মীয়ের মতো । বন্ধুও বলতে পারেন । কিন্তু আমাদের ব্যাপারে আপনি তাঁকে বিব্রত করবেন কেন ? তাছাড়া তাঁর কথা আমি শুনবোই বা কেন ?"

"তাও তো বটে । তবে কী করি ?"

"বাড়িটা আমাকে বিক্রী করে দিন ।"

"বিক্রী ? কত টাকায় ?"

"দশ হাজার টাকায় ।"

"মাত্র দশ হাজার টাকায় ? আজকাল যে ছারপোকার মতো গাড়িগুলো বেরিয়েছে, মারুতি ; তার দামই তো একলাখ বারো হাজার ।"

"তা আমি জানি না । তাহলে আমার আর কিছুই করার নেই । আপনার

ছেলেমেয়েরা আপনাকে ত্যাগ করেছে । কিন্তু তার দায়িত্ব তো আমার নয় ।"

"তা ঠিক, আমার দায়িত্ব আপনার কেন হতে যাবে ?"

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, "তবে কী করব বলতে পারেন হৈমদেবী ?"

"তা আমি আর কি করে বলব ? বেলা বাড়ছে । আমার কাজ আছে । এবারে আপনি আসুন । এই অসময়ে কখনই আসবেন না । মিছিমিছি আসেন কেন ? বলেইছিতো কেস করে দিন । এমন উত্ত্যক্ত করলে রেন্ট-কণ্ট্রোলে ভাড়া জমা দেবো এবার থেকে । তা কি ভালো হবে ?"

"না । না । আমি চলি । ঠিক আছে । আমাকে সেই বাগবাজারের খাল পাড় থেকে আসতে হয় তো । মিনি-বাস চড়ার বিলাসিতাও আজ আর করতে পারি না । যা গরম পড়েছে ।"

"আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখে না কেন ? নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে আপনার ।"

"কী করে বলব বলুন ? কপালের দোষ । তবে হ্যাঁ, দোষই তো । দোষ বলতেই পারেন । যৌবনের প্রথম থেকে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল তাদের ভালো করা ; তাদের ভবিষ্যৎ । নিজের দিকে একবারও তাকাইনি । সব কিছু তাদেরই দিয়েছি । তাদের লেখাপড়ার জন্যে । তাদের বিয়েতে । এটাই দোষ । মস্ত দোষ হৈমদেবী ।"

"তা নয় । তাদের ঠিক করে মানুষ করতে পারেননি । ছেলেমেয়ে মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা ? ক'জন তা পারে ?"

"মানুষ তো করেছিলামই । বড় জন এঞ্জিনীয়ার, ছোট জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট । তাদের মানুষ করে তোলার চেষ্টা তো আমার বৃথা হয়নি । একে কি মানুষ করা বলে না হৈমদেবী ? আমি তো সামান্য টিকিট কালেকটারের চাকরি করতাম । তাদেরই জন্যে আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কম্যুট্ করেছিলাম সেই কতদিন আগে । আমার সাধ্যের বাইরে গিয়েও পড়িয়েছিলাম তাদের । একটু চুপ করে থেকে তারিণীবাবু বললেন, আমার জ্ঞাতিরাও আপনি যা বললেন তাইই বলেন । সবই নাকি আমার দোষে । বলেন, টিকিট কালেকটার হয়ে ঘুষের টাকায় ছেলেদের লাট-বেলাট বানিয়েছো এখন ছেলেরাই তোমাকে না দেখলে আমরা কী করতে পারি ? ভগবানের হাত তো দেখা যায় না হৈমদেবী । তাঁর মার আসে ঠিক সময়ে। কারোরই নিস্তার নেই। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হয়। আজ আর কাল।"

বুড়ো হলে মানুষ বড় বেশি কথা বলে । অসহ্য একেবারে । ভাবছিলেন, হেম ।

একটু ঢোক গিলে তারিণীবাবু বললেন, "আসলে আমার জ্ঞাতিদের কারো অবস্থাই তো ভালো নয় । নুন আনতেই পান্তা ফুরোয় । এই বাড়িটিই বাবা আমাকে আলাদা করে দিয়ে গেছিলেন । প্রথম থেকেই আমি এখানে এসেই থাকতে পারতাম । কিন্তু

তখন তিরিশ টাকারও যে অনেক দাম ছিলো আমার কাছে হৈমদেবী !"

"দাম ছিলো বৈকি ! আপনার কাছে যেমন ছিলো আমার মতো একজন প্রায় অসহায় সদ্য-বিধবার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি ছিলো । কথাটা মানেন তো ?"

অতীতের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে হেমপ্রভা বললেন —

"আমি তো সেই কথাই বলছি আপনাকে । আপনি বুঝতেই চাইছেন না । আমি বুঝি ।"

"জানেন, বড় খোকার জন্যে প্রাইভেট টিউটার-এর দরকার ছিলো । খুকির গানের মাস্টার । তাই ভাবলাম, বাড়িটা ভাড়াই দিয়ে দিই ।" তারিণীবাবু বললেন । "বড় খোকা এখন কভেন্ট্রিতে আছে ইংলণ্ডে ।"

"তাই ? কবে গেলো ? দিল্লীতে ছিলো না ?"

"হ্যাঁ । ওখানে যাওয়ার আগে ছিলো !"

হেমপ্রভা এবারে দাঁড়িয়ে উঠলেন ।

বললেন, "আপনার চাকরিতে ঘুষ-ঘাষও তে ছিলো একটু-আধটু । জ্ঞাতিরা যা বলেন তার সবটাইতো আর মিথ্যে নয় ।"

তারিণীবাবু একটুও লজ্জিত হলেন না ।

বললেন, "মফঃস্বলেই পোস্টিং ছিলো চিরদিন । কলাটা-মুলোটা জুটতো । একেবারে শেষের দিকে বড স্টেশন পেলাম । তা হৈমদেবী মিথ্যে বলবো না আপনাকে ; রিটায়ার করার সময় হাজার তিরিশেক জমিয়েও ছিলাম ক্যাশ । শেষ জীবনের রোজগার । হার্ড-ক্যাশ । আমাদের সময় ঘুষখোরদের, সমাজে মাথা নিচু করেই হাঁটতো হতো । আজকের মতো দিনকাল ছিলো না । হাঁসের বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরিয়েই যেমন সাঁতার কাটে, এখনকার দিনের ছেলেরা প্রায় সেরকমই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই ঘুষ খায় । স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের দুধ খাওয়ার মতো । এদের মধ্যে বিবেক-টিবেক বলে কোনো গোলমেলে ব্যাপারই নেই ।"

হেমপ্রভা বৃদ্ধর প্রলাপ থামিয়ে বললেন, "কি করলেন সেই টাকা ? তিরিশ হাজার ?"

"সেই তিরিশ হাজার ?"

"হ্যাঁ ।"

"সঞ্চয়িতা ।"

"সঞ্চয়িতা ? মরুন তাহলে । অতি লোভে তাঁতি নষ্ট । ছত্রিশ পার্সেন্টি ইন্টারেস্ট । তখন বাগবাজার আর শ্যামবাজারের বাজারে যারাই গলদা চিংড়ি বা ইলিশ কিনতো তারা সবাই কিনতো সঞ্চয়িতার সুদের টাকায় । ওঃ কী গরমই না হয়েছিলো মানুষের । বেশ হয়েছে । লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ।"

"আমি কী করব ?"

"যা ভালো মনে করেন ।"

"জিষ্ণুর ফোন নাম্বারটা ?"

"না । দেওয়া যাবে না । জিষ্ণু কে ? বলেইছি তো ! আপনি কোর্টে কেস করুন বরং তারিণীবাবু । কুকুরটাকে ওয়ারিশ করে যাবেন । আপনার যা অবস্থা দেখছি, বেশি দিন যে আছেন তাও তো মনে হচ্ছে না ।"

"আঃ । তাইই আশীর্বাদ করুন হৈমদেবী । তাই আশীর্বাদ করুন । যত তাড়াতাড়ি যাই ততই মঙ্গল ।"

তারিণীবাবু চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎই বললেন, "আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেদিন আপনি হীরুবাবুর মধ্যস্থতায় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তখন আপনার মন এবং মুখের চেহারাও কিন্তু অনেকই নরম ছিলো । সদ্য-বিধবা আপনাকে দেখে আমার দয়া হয়েছিলো । তাই ঐ ভাড়াতে .... । নইলে, তখনও এ বাড়ির ভাড়া ইজিলি একশো টাকা হতে পারতো মাসে । কী হতো না ?"

"হ্যাঁ । তাবিণীবাবু আপনি ঠিকই বলেছেন । কিন্তু এক কথাই অনেকবার হলো । এবার —"

"আপনার মনের ভাব আর মন নরম ছিলো না ?"

হেম বললেন, "তখন অনেকই নরম ছিলো আমার মন । শুধু মনই কেন, অনেক কিছুই নরম ছিলো । বাইরেটা এই তিরিশ বছরে যেমন শক্ত হয়ে গেছে, ভিতরটাও হয়েছে । নিশ্চয়ই হয়েছে । আপনাবও কি হয়নি ?"

এই কথাটা তারিণীবাবুকে অফ-গার্ড করে দিলো মুহূর্তে । তারিণীবাবু উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোলেন । এগিয়ে গিয়ে নিজেই দরজাব খিল খুললেন ।

বেশ ঝুঁকে হাঁটেন এখন । আগে কেমন টানটান চেহারা ছিলো । পেছন থেকে লক্ষ্য করলেন হেম । ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ বাড়ির সব দরজা-জানালা বার্মা টিক-এর । জানেন ? বাবা, বার্মার বিখ্যাত সেগুন কাঠের কারবারী স্যালউইন টিম্বার থেকে আনিয়েছিলেন এই কাঠ । ল্যাজারাস কোম্পানীও রেঙ্গুন থেকে কাঠ আনাতো এই স্যালউইন টিম্বার কোম্পানী থেকেই । বার্মার স্যালউইন নদীর দুপাশে ছিলো নিবিড় সেগুনের জঙ্গল । ব্রিটিশ আর্মির জেনারাল উইংগেটের নাম শুনেছে কখনও হৈমদেবী ? যিনি শুধুই পেঁয়াজ খেয়ে থাকতেন ? তাঁর আর্মির অসাধ্যসাধনের ক্ষমতায় হেড কোয়াটার্স-এ আর্মির অফিসারেরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'উইংগেটস সার্কাস' । জানেন ?"

বুড়ো হলে মানুষ বড়ই বাজে বকে । ভাবছিলেন হেম । নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন ।

"জানি না । আপনি এবারে এগোন তারিণীবাবু ।"

দরজা খুলেই, তারিণীবাবু বললেন, "উরে বাবাঃ মেঘ গজরাচ্ছে । জোর বৃষ্টি হবে ।"

হেমপ্রভা মাথা নাড়লেন ।

চলে যেতে যেতেও তারিণীবাবু একবার হেম-এর দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "আমাকে দেখে সাবধান হবেন হৈমদেবী ।"

"কেন ? কীসের সাবধান ?"

"আপনি যেমন ভাসুরপো আর মেয়ের জন্যে করছেন, আমিও নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে তার চেয়েও বেশি করেছি । নিজের দিকে তাকাবেন । কিছু আশা করবেন না সংসারে কারো কাছ থেকেই । আমার মতো বোকা হবেন না ।"

হেমপ্রভা বেশ ধাক্কা খেলেন কথাটিতে ।

তারিণীবাবু চলে গেলে, দরজায় খিল দিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে উপরে এসে দেখলেন যে হীরুর আর তর সয়নি । হৈমর বিছানাতে প্রায় বিবস্ত্র হয়েই পাখাটা "অন" করে দিয়ে শুয়ে আছেন।

হেম গম্ভীর হয়ে গেছিলেন । তারিণীবাবুর শেষ কথাটি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিলো ।

"কী এতো আসল-সুদের কারবার করছিলে এতক্ষণ ?"

রসিকতা করে বললেন হীরুবাবু ।

হেমপ্রভা কথা না বলে হাসলেন ।

জানালা-বন্ধ প্রায়ান্ধকার ঘরে তাঁর দিকে তাকিয়ে হীরুবাবুর মনে হলো এখনও হেম যুবতীই আছেন । হারায়নি কোনো কিছুই । হেমের মতো সুন্দরী, জেদী এবং স্বয়ম্ভর নারী তিনি কমই দেখেছেন জীবনে । নইলে আর নিজে সারাজীবন বিয়ে না করে কেন ...

হেমপ্রভা বললেন, "বোলো না আর ! জ্বালালো ঐ বাড়িওয়ালা তারিণীবাবু।"

"বেচারা । তোমার ঢলঢলে মুখখানি দেখে মাসে মাত্র তিরিশ টাকায় এ বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন । আজ তার কী দুর্গতি । চার কাঠার উপরে বাড়ি । এ বাড়ির দাম আজকে চার-পাঁচ লাখ হবে ।"

"তা হবে । সবাই তো তোমার মতো চালাক নয় । বেশীরভাগ পুরুষই তারিণীবাবুর মতোই বোকা । ঢলঢলে মুখ আর ঝরঝরে শরীর দেখে যে ভুল করেছিলেন সারাটা জীবনই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো । এবং হবেও তাঁকে ।"

"আমি তো এক নম্বরের বোকা ।"

হীরুবাবু বললেন ।

"বোকাই বটে । কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নিয়েছো সব কিছুই । এখন দেনা হয়ে গেছে আমার কাছে পাওনার বদলে ।"

“মিটিয়ে দেবো । মিটিয়ে দেবো, এখনও যদি সব মিটে গিয়ে না থাকে । পরীর বিয়েও আমিই দিয়ে দেবো । ভেবো না কিছু ।”

“পরী হয়তো ভাবতেই দেবেনা আমাদের । তবু পরীর বিয়ে হয়ে গেলে আমি আব তুমি তীর্থে চলে যাবো । তখন লোকে কে কী বললো তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা থাকবে না । আমার অন্ততঃ থাকবে না । তোমারও থাকা উচিত নয় । লোকভয় ক [illegible] আর বাঁচতে পারি না । বড় কষ্ট ।”

“আজ তুমি বড় কথা বলছো হেম । এসো তো এবারে ।”

প্রথমবারের অনুরোধে “না” করেছিলেন । তাই হীরুকে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় রাখার খেসারত হিসেবে নিরাবরণ হয়েই এলেন এবারে হেমপ্রভা । আয়নাতে তাঁর শরীর অন্ধকারে ঝিলিক মারলো । এখনও কোথাওই একটু বাড়তি মেদ নেই । তলপেটে অতি সামান্য ছাড়া। ওখানে না থাকলে খারাপই দেখাতো । খুশি হলেন হেমপ্রভা নিজেকে দেখে ।

হীরু অধৈর্য দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন হেমপ্রভার ঠাণ্ডা, মসৃণ, উজ্জ্বল, কোমল শরীরকে । হেমপ্রভার শরীরে কোনদিনও কোনো দুর্গন্ধ পাননি তিনি । চূড়ান্ত গরমেও না। অথচ হেমপ্রভা মাথায় লক্ষ্মীবিলাস তেল ছাড়া সর্বাঙ্গে কোথাওই কোনোদিন প্রসাধন তো দূরের কথা পাউডার বা তেলও ব্যবহার করেন নি । পদ্মিনী নারী ।

মনে মনে বলেন হীরু ।

হেমপ্রভা সবে নিজের শরীরটাকে যেই আলগা করে দিয়েছেন হীরুকে গ্রহণ করবেন বলে নিঃশব্দ আড়ম্বরে অমনি কলিং বেলটা আবার বাজলো ।

হীরু দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন ।

হেমপ্রভা বললেন, “দাঁড়াক গে! যে এসেছে সে। যত্তো আপদ অসময়ে।”

হীরু এক সেকেণ্ড সময় নিলেন ভাবতে । এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলটা বেজে উঠলো একই সঙ্গে বারবার । আবার ঝনঝন করে । হীরুবাবুর গড়ে তোলা ইমারৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

হেমপ্রভা উঠে পড়ে জামাকাপড় পরতে পরতে বললেন, “নিশ্চয়ই পরী । ও ছাড়া এমন অধৈর্যর মতো বেল আর কেউই দেয় না । তোমার যে এতো ধৈর্য তার কি ছিটেফোঁটাও পেতে পারতো না মেয়েটা ?”

হীরু উঠে পড়ে বললেন, “তুমিই তো বলে এলে চিরদিন যে ও আমারই মেয়ে । কার যে মেয়ে তা স্থিরব্রতও জানতো না হয়তো । আমি তো জানিই না । ছেলেমেয়ে যে আসলে কার তা মায়েরাই জানে ।”

“তাড়াতাড়ি করতো । কথা বলো না এতো ।”

রাগ ও বিরক্তির গলায় বললেন হেমপ্রভা ।

"কী বলবে ? দোর খুলতে দেরী হওয়ার কারণ ?"

চিন্তান্বিত গলায় হীরু শুধোলেন হেমপ্রভাকে ।

"বলবো, বাথরুমে ছিলাম । তারিণীবাবু আসাতে চানে যেতে দেরী হয়ে গেছিলো ।"

"আমি কোথায় থাকবো ?"

ধরা-পড়া চোরের মতো হীরুবাবু বললেন ।

"তুমি জিষ্ণুর ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে থাকো ।"

"দুসস, পরকীয়ায় বড় ফ্যাচাং । এই বয়েসে আর পোষায় না ।"

"তিরিশ বছর পরে বুঝলে বুঝি ? বিয়ে করার মুরোদ থাকলে তো পরকীয়া করতেই হতো না ।"

"বিয়ে করা লোক দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। পরকীযা মানুষকে নতুন রাখে।"

হীরু গিয়ে জিষ্ণুর ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে খবরের কাগজটা নিয়ে বসলেন । বেলটা বেজেই চলেছে । ঝন্ঝন ঝন্ঝন । হীরুবাবুর মাথার মধ্যে অতীত ভাঙছে কাঁচের বাসনের মতো । হীরুবাবু ভাবছিলেন, পরী এসে এক্ষুণি কলকল করে কথা বলতে বলতে বারান্দাতে ঢুকবে । মাঝে মাঝে বড় ব্যথা বোধ করেন । নিজের হয়েও মেয়েটা নিজের হলো না । পরীকে দেখলেই বুকের মধ্যে নানা গভীর বোধ উথাল-পাতাল করে । অপত্য । অথচ সমাজ তাঁকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলো ।

পরী কিন্তু এলো না । আসেনি । শ্রীমন্তর গলা শুনলেন একটু পরেই হীরুবাবু ।

শ্রীমন্ত বলেছিলো হেমকে, "আর বোলোনা গো মা । মিছিমিছি হয়রানিটা করালে । মদনাটা চিরকালই অমনই বে-আক্কেলে । কুকুরে কামড়েছে বটে, ছোট ছেলেকেও বটে ; তবে আমার ছেলেকে নয় ।"

"তবে ?"

"আমার যে জ্যাঠতুতো ভাই, গোবর্ধন, বাবার ধান-জমি যে মেরে দিলে গত বছর পঞ্চায়েতকে ঘুষ খাইয়ে, সেই তারই ছেলেকে । ছেলেটা মরলে বাঁচি । খামোকা গরমের মধ্যে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে গেলাম । ধর্মের কল বাতাসে নড়ে । পাপ করেচো, পাচিত্তির করবে না ?"

"তোমার রান্নাও তো করিনি । তাড়াতাড়ি যা হোক দুটো ফুটিয়ে নাও তোমার জন্যে ।"

বিরক্তির গলায় হেমপ্রভা বললেন ।

"আর হীরুবাবু এসে বসে আছেন বাড়িওয়ালা আসবেন বলে । তিনিও তো এলেন না ।"

"বাবু কোথায় ?"

"দ্যাখো কোথায় ? বোধহয় দাদাবাবুর বারান্দায় আছেন ।"

ইতিমধ্যে হীরু এসে দাঁড়ালেন ।

"এতো বেলা যখন হলো দুটি খেয়েই যাও। গিয়ে তো ঠাণ্ডা খাবে। গদাধরকে কিন্তু তাড়ানো দরকার। বড়ই অযত্ন করে ও তোমার। এ বয়েসে এতো সইবে কেন ?"

"না, না চলেই যাই।"

"সে কি বাবু !" এবার শ্রীমন্ত বললো। "এই রোদে চলে যাবেন কি ? আমি খাবার বেড়ে দিচ্ছি।"

"তোমায় বাড়তে হবে না শ্রীমন্ত। তুমি আগে চান-টান কর। গরমে এসেচো। আমিই বেড়ে দিচ্ছি।"

হেমপ্রভা বললেন।

"তাই করি।"

শ্রীমন্ত বললো।

শ্রীমন্ত তার পুঁটুলি নিয়ে ছাদে নিজের ঘরে গেলো। ছাদেই চান করবে। মোক্ষদা যখন থাকে, দোতলাতেই থাকে। তখন নিরিবিলি হওয়া হেম-এর পক্ষে আরও মুশকিল।

হেমপ্রভা হীরুর চোখে চিরন্তন পুরুষের অধৈর্য কাম দেখতে পেলেন। মুখে বললেন, "আজ থাক। শ্রীমন্ত হুট করে নেমে আসবে। বাধার পর বাধা আসছে আজ।"

হীরু বললেন, "যাই হোক। আমি আজ তোমাকে চাই-ই।"

হেমপ্রভা আস্তে শব্দ না করে দুয়ার দিলেন। ঠিক সেই সময়েই দরজায় ধাক্কা দিলো শ্রীমন্ত। বললো, "মা, বাবুকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। চলে গেলেন না কি ? আপনি কি পুজোয় ?"

হেমপ্রভা ভাবলেন, পুজো নিশ্চয়ই। তবে তিনি এখন দেবীর ভূমিকায়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্তিতে বললেন, "হ্যাঁ। পুজোয়।"

শ্রীমন্ত নিচে নামতেই নিঃশব্দে আবার দরজা খুলে হেমপ্রভা হীরুকে বললেন, "তুমি শিগগির পরীর ঘরে চলে যাও। শ্রীমন্তকে বলবে যে, আমি পুজো করছি। আসছি দু মিনিটে। কী যে করোনা ! তোমার জন্যে আমার সর্বস্ব যাবে।"

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হেমপ্রভা ভাবছিলেন, মিথ্যার এই দোষ। একটা মিথ্যা বললে দশটা মিথ্যা দিয়ে তা ঢাকতে হয়।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই হেমপ্রভা দেখলেন শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তরও এ বাড়িতে কুড়ি বছর হলো। আর মোক্ষদার প্রায় পঁচিশ বছর। শ্রীমন্তর চুলের প্রায় সবই সাদা। সাদা চুল ওর কাটা-কাটা মুখকে এক সম্ভ্রান্ততা দিয়েছে। মোক্ষদার বয়স শ্রীমন্তর চেয়ে বেশি হলেও ওর কপালের দুপাশটুকুই সাদা হয়েছে শুধু।

শ্রীমন্ত হেমপ্রভার চোখে তাকালো। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলো।

শ্রীমন্ত বললো, "দরজা তো ভেতর থেকেই খিল দেওয়া ছিলো।"

"দিদিমণির ঘরে দ্যাখতো । সেখানেই আছেন তাহলে ।"

"দিদিমণির ও দাদাবাবুর ঘর — বারান্দা দেখেই তবে আপনার ঘরে ধাক্কা দিয়েছিলুম মা । বাবু তো কোথাওই নেই ।"

হেমপ্রভার চোখ জ্বলে উঠলো মুহূর্তের জন্যে শ্রীমন্তর চোখে তাঁর চোখ পড়তেই । শ্রীমন্তর চোখে দুঃখ-মিশ্রিত বিস্ময় ছিলো । হেমপ্রভাকে শ্রীমন্ত সম্মান করতো । আজ....

হেমপ্রভা বললেন, "এ দুঘরেই আবার দ্যাখো, পাবে নিশ্চয়ই । জলজ্যান্ত মানুষটা তো উপে যাবে না ।"

এমন সময় পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে হীরু বললেন, "ব্যাপারখানা কী ? তোমরা কি পুলিশে ফোন করবে নাকি ? এই তো আমি !"

হেমপ্রভা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলেন যে আজ হীরুকে বাধা দেওয়া উচিত ছিলো । খুবই উচিত ছিলো । কিন্তু তাঁর ভেতরেও এক তাগিদ বোধ করছিলেন যেন । সবদিন এমন করেন না । বিপদের ঝুঁকি আর নেই বলেই মাঝে মাঝে আজকাল শরীরকে প্রবলভাবে বোধ করেন । আগুন বাধা পেলে জোর হয় বোধহয় । ভাবছিলেন মোক্ষদার কাছে তো বহুবারই দিনে এবং রাতে ধরা পড়েছেন । আজ প্রথম শ্রীমন্তর কাছেও পড়লেন । মেঘলা আকাশে দুপুরের কলকাতায় ঘুরে ঘুরে চিল উড়ছিলো । স্টেইনলেস স্টীল-এর বাসনওয়ালি আর ডাবওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিলো নির্জন দগ্ধ গলিতে । খাবার গরম করতে করতে হেমপ্রভা ভাবছিলেন যে মোক্ষদা সব জেনেও তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছে । অবশ্য একথা মোক্ষদা জানেনা যে পরীর বাবা হীরুই । শিবব্রতকে মোক্ষদা চোখেও দেখেনি কখনও । মোক্ষদাও বাল্যবিধবা । তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ । এবং কটি তিল । দুশ্চরিত্রর লক্ষণ । ছেলেবেলায় আম চুরি করতে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় লেগে গাল চিরে গেছিলো । নইলো চেহারাটা ভারী স্নিগ্ধ । হিজল বনের ছায়ামাখা মুখখানি । এ বাড়িতে যে পুরুষই আসে মোক্ষদার মুখে তার চোখ আটকাবেই । শরীরের বাঁধনও চমৎকার । বাদার নোনা-নোনা গন্ধ লেগে আছে যেন । মোক্ষদা বাল্যবিধবা বলেই হয়তো হেমপ্রভার দুঃখের কিছুটা বোঝে । এবং হয়তো বোঝে বলেই ওঁর দুঃখ পূরণের অপরাধটাকে খাটো করে দেখে । অবশ্য হেমপ্রভাও ওকে ছাড় দেন । ওর এক গ্রামতুতো দাদা প্রায়ই দুপুরবেলা আসে ছুটির দিনে ওর সঙ্গে দেখা করতে । কোনো কোনো দিন হেমপ্রভা এই বাজারেও তাকে খেয়ে যেতে বলেন । রান্নাঘর, সংলগ্ন বারান্দার ছায়াচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘব এসবই মোক্ষদার রাজত্ব । সেই গ্রামতুতো দাদা রামু এলে হেমপ্রভা শব্দ করে কপাট বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকে যান । বলে যান, চারটের সময় চা দিও মোক্ষদা । তার আগে আমাকে তুলো না । আমি ঘুমোব । ফোন এলে তুমিই ধরো । যেই করুক, বোলো যে চারটের পরে করতে ।

মোক্ষদা বুদ্ধিমতী । বোঝে তার খেলার বেলার আয়ুষ্কাল । এবং তা নির্বিঘ্ন ।

হেমপ্রভা দরজা খোলার অনেক আগেই খেলা সাঙ্গ করে মোক্ষদার গ্রামতুতো

দাদা ফিরে যায়। খেলাটা যে কী প্রকারের তা জানার কোনো কৌতূহল হেমপ্রভার ছিলো না কখনই। ওরা দুজনে হয়তো মুখোমুখি বসে গল্পই করে। যাইই করুক মোক্ষদা, হেমপ্রভা জানেন অন্তরে অন্তরে যে কোনো মানুষের পক্ষেই একা দীর্ঘদিন থাকা বড় কষ্টের। মন তো বটেই, শরীরও দোসর চায়। হেমপ্রভা পাপী। তাঁর এই পাপ যৌবনেই এবং স্বামীকে বঞ্চনা করেই। বিয়ের অতো অল্পদিনের মধ্যেই পরী গর্ভে আসে তাঁর অথচ সে সন্তান স্থিরব্রতর নয়। স্থির জানেন এ কথা হেমপ্রভা এবং হীরু, হীরেন্দ্র অধিকারী।

কেন, কী করে এসব ঘটলো সে সব অনেক কথা। অনেক দিনের কথাও। মনে আনতে চাননা হেমপ্রভা। শুধু একটি কথা ভেবে এখনও দুঃখ পান। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্থিরব্রত একটিই কথা বলেছিলেন : পরী কোথায় ? আমার পরী ? ওকে আনো।

বহু বছর হয়ে গেছে। অপরাধবোধ এখন ভোঁতা হয়ে এসেছে। এমন কী মাঝে মাঝে মনে হয়, ব্যাপারটা মিথ্যা।

দুঃস্বপ্ন একটা।

হীরু বললেন, "চলি হেম।"

"হ্যাঁ যাও। ও খেয়ে যাও। নইলে শ্রীমন্ত কি মনে করবে ?"

"কিছু মনে করবে না। যাই।"

একতলায় নেমে হেমপ্রভা দরজা খুলে দিলেন।

হীরু বললেন, "আসি। হেম।"

বলে, দুহাতের পাতা দিয়ে হেমপ্রভার দুটি গাল ছুঁলেন।

মাথা নাড়লেন হেম। মাথা নেড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে হঠাৎই তারিণীবাবুর কথাকটি মনে পড়ে গেলো হেমপ্রভার। এবং মনে পড়ে ভয় হলো খুব। আকাশ কালো করে তো ছিলোই।

খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। পায়রারা ছটফট করে উঠলো আলসেতে। ডানা ঝটপট করে উঠলো আলসেতে। ডানা ঝটপট করতে লাগলো। কে জানে, হীরু বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে পারলেন কি না। ট্যাক্সি পেলেন কিনা ? একটি মারুতি বুক করেছেন হীরু। পাবেন শিগগিরই।

ভেবে আর কি করবেন হেমপ্রভা ? কিছু বৃষ্টি নিজেকে ভেজায়, কিছু বৃষ্টি অপরকে। আরও কিছু বৃষ্টি আছে যা সকলকেই ভেজায়। মাথার উপরের আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া মানুষকে সেইসব বৃষ্টি থেকে বাঁচানো যায় না। কে জানে তারিণীবাবুও হয়তো ভিজে গেলেন ! সকলের জন্যই এক ধরনের চাপা কষ্ট বোধ করেন হেম বুকের মধ্যে। নিজের জন্যেও করেন না যে তাও নয়।

আরো জোরে বৃষ্টি নেমে এলো অন্ধকার করে চারদিক। মন খারাপ লাগে বড় একা মানুষের এমন এমন দুপুরে।

"একটা গান গাও না পরী ?"

"পুষি থাকতে আমি কেন ?"

"পুষির গান তো শুনতেই পাবে জিষ্ণু সারাজীবন ।" পুষি বললো ।

"আমার গান কেন শুনতে পাবে না ?"

"বাঃ রে । তুমি কি চিরদিনই কুমারী থাকবে । এ বাড়িতেই থাকবে ?"

"যদি থাকি ? তোমার আপত্তি ?"

"এমন করে কথা বলছো কেন তুমি পরী ?"

জিষ্ণু এবার বললো মাঝে পড়ে, "আহা বলুকই না । আমরা আমরা কথা বলছি, তুমিই বা এর মধ্যে কথা বলতে এলে কেন ?"

"ঠিক আছে ।"

"তোমার গলাটা কিন্তু সত্যিই ভালো । একটু চর্চা করলে......"

পুষি বললো, "আমার সবই ভালো । কিছুবই চর্চা যখন করলাম না তখন আর শুধু গানেরই বা কেন ?"

"তোমরা কি ঝগড়াই করবে না কি গান শুনতে পাবো একটা ।"

"আমি গাইবো না । পুষি গাইলে, গাক । শুনব আমি । আমার ইচ্ছে করছে না আজ ।"

"তাহলে পুষিই গাও । গাও পুষি ।"

জিষ্ণু বললো ।

"কী গান ? 'হৃদয়নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে' গাইবো ?"

"আবার সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ! তোমরা পারোও বাবা । কথাগুলো, সুরগুলো তো সব পচে গেলো, উনিশশো নব্বুই পেরুলে বাঁচা যায় ।"

পরী বললো ।

"কেন ?"

"তখন আমি আমার সুরে, আমার তালে, আমার রাগেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবো । এখন যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড সমালোচকরা, স্বরলিপির অথরিটিরা, নিজেদের খেয়াল-খুশি ও নিজ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের কারণে সকলের মাথাতেই চাঁটি মেরে বেড়াচ্ছেন তা আর করতে

• হবেন না। দে উইল বী কাট টু দেয়ার ওন সাইজেস। যাঁরাই এতদিন যা-নয়-তাই করে গেছেন মনের সুখে, তাদের ভাতে হাত পড়বে। সুখে কাঁটা।"

"আহা! কারোরই ভাতে হাত পড়ার চিন্তা না করাই ভালো।"

জিষ্ণু বললে, "তা বললে হবে কেন? তেমন তেমন সমঝদার শ্রোতা সমালোচকদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনাদর কখনই হবে না। যে যাই বলুক রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন জনগণের সঙ্গীত হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তা আসলে কোনোদিনও ছিলো না।"

"তবে ভুষিমালেরা সব ফুটে যাবে। তুমি যাই বলো জিষ্ণু, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার অনেক ক্ষতি করেছে।"

পরী বললো, "ও বাবাঃ, তুমি তো সেই সব সাহিত্যিকদের মতোই বলছ দেখছি।"

জিষ্ণু হেসে বললো, "কী বলেছিলেন তারা?"

"বলেছিলেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার ক্ষতি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ না লিখতে পারতেন ছোটগল্প না উপন্যাস। শরৎ চাটুজ্যে লেখকই নন।"

"খারাপটা কী বলেছিলেন? আমারও তো তাই মত। তবে আমি বলব, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড় ঔপন্যাসিক আর জীবনানন্দও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড় কবি ছিলেন।"

পুষি আহত গলায় বললো, "বলছো রবীন্দ্রনাথ তাহলে কিছুমাত্রই ছিলেন না।"

"পস্টারিটি তাই প্রমাণ করবে

পরী বললো।

"থাকলে হয়তো গানটুকুই থাকবে"

জিষ্ণু বিব্রত হয়ে বললো, "প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক গানটা কি হবে পরী?"

"আজ গান থাক। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো নয়ই তার চেয়ে মাইকেল জ্যাকসন বা হুইটনি হাস্টনের কোনো গান শোনাও পরী"

পরী পুষির কথার উত্তর দিলো না ঠোঁট উল্টে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো

তারপর দীর্ঘ নীরবতা। তিন জন তিন দিকে চেয়ে রইলো।

পরীর দিকে চেয়ে পুষি বললো, "কমপ্যুটার ব্যাপারটা কি পরী? অনেকদিন ধরে অনেককেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করেছে কিন্তু লজ্জায় পারিনি।"

"লজ্জা কেন?" পরী শুধলো।

"বাঙাল ভাববে।"

"বাঙালদের বাঙালত্ব সম্বন্ধে লজ্জা থাকা উচিত নয়। আমরা যে কলকাতার লোক তাতে গর্বিতই বোধ করি আমরা। লজ্জা আসে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকে।"

"আমি প্রচুর গর্বিত বাঙালদের চিনি । এবং তাদের গর্ব করার কারণও আছে ।"

"সকলের সে লজ্জা থাকে না ।"

পরী হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলো কথাটা মুখ কালো করে । কথাটা ও নিছক রসিকতার জন্যেই বলেছিলো ।

জিষ্ণু বললো, "আজ তোমার কি হয়েছে পরী ?"

"কই ? কিছু না তো !"

অপমানটা গায়ে না মেখে পুষি বললো, "আমার কম্প্যুটারের প্রশ্নটা কিন্তু এখনও উত্তর দিলে না ।"

পরী বললো, "কম্প্যুটার হচ্ছে তোমাদের রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার রাজ্যের যন্ত্র । যেখানে মানুষের নাম থাকে না, ফুলের নাম থাকে না, পাখির নাম মুছে দেওয়া হয় । সব কিছুকেই সংখ্যায় এনে ফেলা হয় যে রাজ্যে । সংখ্যাতেই ডিটারমিনড হয় সব কিছুর আইডেনটিটি । কোডিফায়েড হয়ে যায় সবাই । যেই ডাটা ফিড করে বোতাম টিপে দেবে কম্প্যুটারে, চিচিইং-ফাঁক-এর মতোই, যে যাই জানতে চাইছে তার উত্তর, দরজাখোলা সংখ্যায় এসে দাঁড়াবে স্ক্রীনের উপরে । তার পরে তাকে ডি-কোডিফাই করে নাও । অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট । ইয়েস ।"

বলেই, পরী কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিলো বাঁ হাতের এক ঝটকাতে ।

"আর ড্যাটা ফীড করবার সময়ই যদি গণ্ডগোল হয়ে যায় ?"

বুদ্ধিদীপ্ত চিকন চোখ তুলে পুষি শুধোলো ।

"তবে তো গেলোই সব । গার্বেজ ফীড করলে গার্বেজই বেরোবে ।"

"শুনেছি, কম্প্যুটারের জন্যে এয়ার-কণ্ডিশানড ঘর লাগে ?"

"হ্যাঁ । ধুলোবালি একেবারেই সহ্য করতে পারে না কম্প্যুটার । আমারই মতো । অ্যালার্জি ।"

"আর যে মানুষ তাকে অপারেট করে সে যদি ধূলিমলিন হয় ?"

"তার কস্টিউমের কথা বলছো ?"

দীঘল গভীর চোখ তুলে পরী শুধোলো, পুষির চোখে চোখ রেখে ।

"না । মানে তা নয় । আজকালকার মানুষেরা তো বাইরে অন্তত, সব সময়ই ফিটফাট ।"

"ও । মনের ময়লার কথা বলছো ?"

বলেই, রহস্যজনক ভাবে হাসলো পরী ।

হয়তো পুষির প্রশ্নের মধ্যে কিছু রহস্য ছিলও ।

"হ্যাঁ । তাই ।"

"হয়তো তাতেও আপত্তি থাকার কথা ছিল কম্প্যুটারের এবং আমার তো বটেই ।

কিন্তু ফরচুনেট্লি মন তো দেখা যায় না ।" পরী বললো ।

"ভাগ্যিস যায় না ।"

"যে যুগ এসেছে তাতে বাইরেটাই সব । অন্তঃসারশূন্য যুগ এ ।"

পুষি বললো হেসে ।

কিন্তু পরী এবং জিষ্ণু বুঝলো সে হাসিটা হাসি নয় ।

"আসি ।"

বলেই, চেয়ার ছেলে উঠতে উঠতে বললো পুষি, "আজ !"

"চলো, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি ।"

বলেই, জিষ্ণু ডাকলো, "শ্রীমন্তদা, নিচের ঘরটা খোলো তো, স্কুটারটা বের করি ।"

"না থাক । আমার বড় ভয় করে স্কুটারে চড়তে । এখন যা ভীড় থাকবে পথে । তাছাড়া খোঁড়াখুঁড়ি আছে সার্কুলার রোডে ।"

"আমার কবে আসবে পুষি ?"

পরী শুধোলো হেসে । এবারে আন্তরিকভাবেই ।

"তুমি যেদিন বলবে ।"

হেসে বললো পুষিও । এবারে বাসি হাসি নয় । টাট্কা হাসি ।

"কাকিমাকে বলে আসি ।"

পুষি আবার বললো ।

"মা নেই তো ! তোমাকে বলেই তো বেরোলেন, ভুলে গেলে ?"

"ও হ্যাঁ ।"

ওরা সকলে মিলে নিচে নেমে এলো বাইরের দরজা অবধি । ওরা নেমে গেলে মোক্ষদা ঘরের বারান্দায় গেল কফির পেয়ালার ট্রে-টা নিয়ে আসতে ।

জিষ্ণু বললো, "চলো পুষি তোমাকে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিই ।"

আসলে কিছু কথাও ছিল জিষ্ণুর পুষির সঙ্গে । পরীর ব্যবহারের জন্যে ক্ষমাও চাওয়ার ছিলো । জিষ্ণু বুঝতে পারে না কেন তার খুড়তুতো বোন পরী বেজীর মতো আক্রমণ করে পুষিকে দেখতে পেলেই । আর পুষি যেন লাজুক চিকন কোনো সাপ । লড়াই না করে মাথা নিচু করে পালিয়ে যায় বারবার ।

জিষ্ণু ভাবছিলো, পুষির সঙ্গে ওর বিয়ের পর এ বাড়িতে আর থাকা যাবে না । পরী হয়তো বিষ খাইয়েই মেরে রাখবে কোনোদিন পুষিকে । পরী যদিও জিষ্ণুর আপন বোন নয়, খুড়তুতো বোন, তবু আপনের চেয়েও বেশি । পরীকে বুঝতে পারে না জিষ্ণু । ভাবী ননদের পক্ষে ভাবী বৌদিকে যতখানি ঈর্ষা বা হিংসা করা সম্ভব তার সব সম্ভাব্য মাত্রাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে পরী । পুষিকে ও এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারে না । গত ছ'মাস, যেদিন থেকে পুষির সঙ্গে ওর আলাপ এবং বাড়িতে নিয়ে আসা,

যেদিন থেকেই ও এটা লক্ষ্য করছে। অথচ পুষি কোনো দিক দিয়েই পরীর যোগ্য নয়। তবু কেন যে পরীর এতো রাগ পুষির ওপর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না জিষ্ণু।

"তুমি ফিরে যাও। তুমি তো রোজই ট্যাক্সি ধরাও পুষিকে। আমিই ধরিয়ে দিচ্ছি আজ। পথে এক জায়গায় নেমেও যাবো। কাজ আছে আমার একটু।"

পরী বললো।

একটু অবাক হলো জিষ্ণু। বললো, "ফিরবে কখন পরী? কাকিমার তো নেমন্তন্ন। খাবো তো শুধু আমি আর তুমিই।"

"আমার দেরি হতেও পারে। তুমি সময়মতোই খেয়ে নিও। শ্রীমন্তদা আর মোক্ষদাদিকে বসিয়ে রেখো না।"

"না। আমি অপেক্ষা করবো। বেশি দেরি কোরো না তুমি।"

পরক্ষণেই বললো, "যাচ্ছোটা কোথায়? রাত প্রায় নটাতো বাজে।"

জিষ্ণুর গলাতে একাধিক কারণে বিরক্তি ছিলো একটু।

পরী বললো, "জাহান্নম্।"

তারপরই বললো, "বলতে বাধ্য নই। আমরা স্বাধীন জেনানা। কী বলো পুষি?"

বলেই, হাসলো পরী। পুষিও হাসলো লাজুক লাজুক মুখে।

মাথাময় রেশমী কালো চুল ঝাঁকিয়ে পুষির হাত ধরে ঢেউ তুলে পথে নেমেই ঘাড় ঘুরিয়ে পরী বললো, "কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কখন ফিরবো? ফিরবো কি না আদৌ? এসব প্রশ্ন তুমি আমাকে কোনোদিনও কোরো না। আমি কি তোমার বউ? বউ যদি হতাম তাহলেও এসব প্রশ্ন করলে উত্তর দিতাম না। আমি অন্য-রকম। আমার নাম পরী, আমি আসমানের পরী। তুমি কি জানো না তা? এতোদিনেও?"

পুষি হেসে উঠলো পরীর কথাতে এবং কথা বলার ভঙ্গীতেও।

"তুমি কি জানো না তা? এতোদিনেও।" এই প্রশ্নটা পুষিকে ভাবিয়ে তুললো। এমন অদ্ভুত ভাই-বোনের সম্পর্ক কখনও দেখেনি ও।

জিষ্ণু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো।

পুষি যাবার সময় হাত তুললো জিষ্ণুর দিকে। তার উত্তরে হাত তুলতেও ভুলে গেলো জিষ্ণু।

দরজা বন্ধ করে দোতলাতে উঠে নিজের ঘরের বারান্দায় এসে বসলো ও আলো নিভিয়ে।

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে একটা। গানুবাবুদের বাড়ির লন্-এর বিভিন্ন গাছ-গাছালি থেকে মিশ্রফুলের গন্ধ উড়ে আসছে। গন্ধটা ঝাঁকাঝাঁকি করছে বারান্দায়।

হাওয়ার সঙ্গে বারান্দার এ প্রান্ত এবং ও প্রান্তের সীমা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েই ধাক্কা খেয়ে ঝুরঝুরে হয়ে ঝরে যাচ্ছে নিঃশব্দে । হরজাই গন্ধ, কোনো অদৃশ্য তরলিমার মতো ; চুঁইয়ে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে বারান্দাময় ।

পরী জিষ্ণুর চেয়ে তিন বছরের ছোট । দুজনের দুজনকে তুইতোকারি করাই উচিত ছিলো ছেলেবেলা থেকেই । জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো পিঠোপিঠি ভাইবোন । কিন্তু শিশুকাল থেকেই পরীর ব্যক্তিত্বটা এমনই যে ওকে "তুই" কখনই বলা যায়নি । জিষ্ণু তো দূরের কথা, কাকিমা, মানে পরীর গর্ভধারিণী মা, অথবা বাড়ির বহু-পুরোনো কাজের লোকেরাও কেউই শিশুকালেও ওকে "তুই" বলে ডাকতে সাহস পায়নি । জিষ্ণু তো নয়ই !

অথচ এই পরীই সেদিন জিষ্ণুকে শুনিয়ে কাকে যেন বলছিলো যে, "অন্য সেক্স-এর কাউকে 'তুমি' সম্বোধন করতে নেই কখনও । তাতে সম্পর্কটা প্রেমের হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে । 'আপনি' অথবা 'তুই' বলাই ভালো ।"

যাকে বলেছিলো, সে শুনে বলেছিলো, "প্রেমের হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নয় কেন ? আশঙ্কা কেন ?"

"কিছু প্রেম হয়তো থাকে, যা আনন্দের নয়, দুঃখের । সুন্দর সম্ভাবনার নয়, আশঙ্কারই ।"

হেসে বলেছিলো পরী ।

বড় স্বাধীনচেতা, অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে এই পরী । পড়াশুনোতে চিরদিনই ভালো ছিলো, জিষ্ণুর চেয়েও । ম্যাথমেটিকস-এ এম. এস-সি করে ছ'মাসের জন্যে স্টেটস-এ গেছিলো স্কলারশিপ নিয়ে । ফারস্ট-ক্লাস-ফারস্ট হয়েছিলো এম. এস-সিতে । ফিরে এসে একটি খুব বড় মালটিন্যাশনাল কম্পানীতে কম্প্যুটার ডিভিশানের হেড হয়ে চাকরী করছে । অবশ্য ক'টি মালটিন্যাশনাল কম্পানীই আর এখন বিদেশী আছে ? শুধু 'ফেরা' আইনের আওতাতে পড়ছে বলেই নয়, বেশিই কিনে নিয়েছে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ।

দেশের সব জায়গায়ই ব্রাঞ্চ আছে পরীদের কোম্পানির । ওকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয় দিল্লী, বোম্বে, ম্যাড্রাস, ব্যাঙ্গালোর । জিষ্ণুর চেয়ে অনেক বেশি মাইনেও পায় পরী । পরীর চরিত্রে এমন কিছু আছে যে মাঝে মাঝেই জিষ্ণু এবং অন্য সকলেরই মনে হয় যে ও পুরুষ মেয়ে নয় । অথচ যখন ও মেয়ে হতে চায় তখন ও সব মেয়ের চেয়েই বেশি মেয়ে ।

যেদিন পুষিকে প্রথমদিন নিয়ে আসে জিষ্ণু এ বাড়িতে সেদিন থেকেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছে ও পরীর মধ্যে । ও যেন কেমন হিংস্র, অসভ্য প্রকৃতির হয়ে উঠছে। পুষির সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অভদ্র ব্যবহার করছে ।

লজ্জিত হয়ে একদিন জিষ্ণু বলেছিলো পুষিকে "এ বাড়িতে তুমি আর এসো না । আমিও তোমাকে কোনোদিনও সঙ্গে নিয়ে আসবো না ।"

পুষি হেসে উঠেছিলো জোরে । বলেছিলো, "বলো কী ? তোমাকে বিয়েই যদি করব বলে মনস্থ করেছি তবে তোমার একমাত্র কাজিন বলো, বোন বলো আমার একমাত্র ননদিনী বলো, তার সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারলে চলবে কেন ? আই বিলিভ ইন উইনিং ওভার মাই অ্যাডভার্সারিজ । নট টু ফাইট উইথ দেম । কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না । অনেক ভেবেছি জিষ্ণু এ নিয়ে, রাতের পর রাত । পরীর আমার প্রতি যে বিরূপতা সেটা কিন্তু তোমারই কারণে । তোমাকে ভালোবাসে বলেই ও আমাকে সহ্য করতে পারে না । ভাইবোনের ভালোবাসা নয় । এ এক বিশেষ ভালোবাসা । একজন মেয়ের চোখে অন্য মেয়ে ধরা ঠিকই পড়ে ।"

"বাঃ ।"

লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে জিষ্ণু বলেছিলো, "একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি একই বাড়িতে । কাকিমাও কখনও কোনো তফাৎ করেননি আমাদের দুজনের মধ্যে । আমার যে মা-বাবা নেই তা এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে দেননি কাকিমা । তাই পিঠোপিঠি বলেই শুধু নয়, একমাত্র সঙ্গী, আমার একমাত্র কাজিন, একমাত্র সঙ্গী ঐ পরী । তা ছাড়া জানো, আমাদের ছেলেবেলায় কাকিমার খুব কড়া শাসন ছিলো । আমাদের ঘরেই কোনো বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে আসাটা মানাও ছিলো । আমরাও কোথাওই যেতাম না । ওই আমার সব ছিলো আর আমিও ওর তাই । আমাকে ভালো তো বাসবেই । আমরা অন্য দশজনের মতো করে বড়ো হয়ে উঠিনি । তাই হয়তো কিছুটা অস্বাভাবিক লাগে তোমার চোখে ।"

পুষি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলো ! তারপর বলেছিলো, "তা তো ঠিকই । কিন্তু তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার প্রতি পরীর ঈর্ষাটা ঠিক যে ধরনের তা কিন্তু ভাই-বোনের ভালোবাসাজনিত নয় । বুঝেছো তুমি ? কী বলতে চাইছি ।"

"না, বুঝিনি ।"

রেগে গিয়ে বলেছিলো জিষ্ণু, "তোমার কথা সত্যিই বুঝিনি । তুমি বলতে চাও কী ?"

"ভুল বুঝো না । তোমাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি । তোমার সম্বন্ধে আমার চিন্তা করা ও চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক । তোমার দিক দিয়ে যে কিছুমাত্র দুর্বলতা নেই পরীর প্রতি, মানে ভাইয়ের যতটুকু ও যে রকম দুর্বলতা বোনের প্রতি থাকার কথা সেটুকু ছাড়া নেই যে, তা আমি জানি । কিন্তু পরীর দিকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই ।"

"তুমি কি পাগল হলে পুষি ?"

"দ্যাখো জিষ্ণু, আমরা যে যুগে, যে পল্যুশান-এর মধ্যে, যে টেনশানে এবং যে

শহরে বাস করছি তাতে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ তো পাগলই । পুরো পাগল না হলেও, আংশিক পাগল । এক একজনের পাগলামির প্রকাশ একেকরকম । সুস্থ বাকি আর কেউই নেই । থাকা সম্ভব নয় জিষ্ণু এতো বক্রতা, ভান, ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের মধ্যে ! বড় ময়লা, আবর্জনা, ধুঁয়ো, ধুলো চারদিকে । যেখানে নিঃশ্বাস নেওয়াই কষ্টের সেখানে মানুষ সুস্থ থাকেই বা কী করে ! কতরকম বিকৃতিই দেখি চারপাশে যে, সুস্থতাকেই এখন বিকৃতি বলে মনে হয় ।"

বারান্দাতে এক বসে বসে নানাকথা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যাচ্ছিলো ।

গানুবাবুদের লনের মার্কারী ভেপার ল্যাম্পটা দুলছিলো হাওয়ায় । সমস্ত বাগানটাই যেন দুলছিল ।

পরী ওর খুড়তুতো বোন, ওকে ভালোবাসে ?

হাঃ ! পাগলের কথা ! নিজের মনেই হেসে উঠলো জিষ্ণু । পরীর অফিসেই তো কত হ্যাণ্ডসাম, ওয়েল-সেটলড্, ভালো পরিবারের এক্সট্রিমলি ওয়েল-অফ্ ছেলে আছে । তারা মাঝে মাঝে ফোন করে বাড়িতেও পরীকে । তাদের গলার স্বর শুনেই বোঝে জিষ্ণু যে, পরীর প্রেমে তারা ডগমগ । বাড়িতে আসে না যদিও কেউই । পরী বলে, আমরা বড় হয়েছি যদিও বেশ আরামেই কিন্তু এই গলিতে, এই বাড়িতে কোনো ডিসেন্ট রেসপেক্টবল বাইরের লোককে আনা যায় না ।

জিষ্ণু শিগগিরই ফ্ল্যাট বুক করবে একটা । ওদের কোম্পানি থেকেই অফিসারেরা কো-অপারেটিভ করে করছে । পরীকে তো কোম্পানি থেকেই সানী পার্ক-এ ফ্ল্যাট অ্যালট করেছিলো । নেয়নি ও । তবে যে কোনোদিন চাইলেই ও সাউথের পশ এলাকাতে মনের মতো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে শিফ্ট করতে পারে । গাড়ি অবশ্য পেয়েছে তবে বাড়িতে গ্যারাজ নেই, কাছে পিঠেও পায়নি ভাড়াতে । তাই গাড়ি আটঘণ্টা ডিউটি করে চলে যায় ।

একদিন জিষ্ণুকে বলেছিলো পরী, "কবেই চলে যেতাম। যাইনি শুধু তোমার জন্যে ।"

"আর কাকিমা ?"

"ওঃ আই হেইট্ দ্যাট লেডি ।"

জিষ্ণু কথা বাড়ায়নি । কেন জানে না কাকিমাকে পরী মায়ের সম্মান ও মর্যাদা আদৌ দেয় না । বছর দুয়েক হলো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে ও । জিষ্ণু যতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করে তাঁকে নিজের মায়েরই মতো পরী তা আদৌ করে না । কাকিমাও যেন পরীকে ভয় পান। এ বাড়িতে পরীই শেষ কথা । পরীকে কিছু বলতে হলে কাকিমা জিষ্ণুকে দিয়েই বলান। সাম্প্রতিক অতীত থেকে ।

কতক্ষণ কেটে গেছে বারান্দায় বসে হুঁশ ছিলো না জিষ্ণুর । এমন সময় হালকা পায়ে পরী এলো । এসে, বারান্দার দোলনাটাতে বসলো দুপা তুলে আসন করে ।

কোলের কাছে একটা তাকিয়া নিয়ে। পুরো পাড়াটা নির্জন হয়ে গেছে। উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখার আগেই গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজলো।

কোথায়.গেছিলে ?

বলতে গিয়েও থেমে গেল জিষ্ণু।

বললো, "খাবে তো এখন ?"

"বলে এসেছি মোক্ষদাদি'কে।"

পরী বললো।

তারপরই বললো, "চারটে খেয়ে এলাম।"

"কী ?"

"জিন্।"

"তাই ?"

সোজা হয়ে বসলো জিষ্ণু। পরী বললো, "নেশা হয়ে গেছে আমার। অফিসের ার বাড়ি ফিরে চানটান করে তিন চারটে খাই রোজ।"

"বাড়িতেই ?"

"হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়ছো কেন ? আমার অফিসের, আমার স্ট্যাটাসের রুষরাতো বাড়িতে বার মেইন্‌টেইন করে। বার-এ বেয়ারা পর্যন্ত উর্দি পরে টুপি রে মজুত থাকে আটটা থেকে। কোম্পানির পয়সাতে। আর আমি কি মেয়ে লে......"

"না। তা নয়। তবে আমাকেও নিয়ে গেলে না কেন ?"

"দূর। পাবলিক বার-এ একা একা বসে মদ খেতে দারুণ লাগে। তুমি মেয়ে লে বুঝতে পারতে মজাটা কেমন ? অনেক কিছুই মিস্ করলে এ জীবনে ! এ দেশে কটা জন্তু আর জঙ্গলে বা চিড়িয়াখানায় আছে ? সবাই ভীড় করেছে এসে হরগুলোতে। কত হতকুচ্ছিত ক্যাডাভেরাস্ মানুষেরা যে কাছে আসতে চায়, আলাপ রতে চায়। সুন্দরী হওয়ারও দরকার নেই। শুধুমাত্র মেয়ে হলেই চলবে। সবচেয়ে নজয় করি আমি তাদের চোখের দৃষ্টি। জিন্-এ আর কতটুকু নেশা হয়। জিন ই আমি সিপ্ করে করে ওরা খায় আমাকে চোখ দিয়ে চেটে চেটে। তুমি আমাকে রভার্টেড বলতে পারো। হয়তো আমি তাই। কিন্তু কে নয় ? চারদিকে চেয়ে াখোতো, নয় কে ? মিথ্যুক ভণ্ড বিকৃত নয় কে আজ ?"

"কাল থেকে বাড়িতেই খেও পরী। আমি এনে রেখে দেবো। বার-এ যেও ।"

"তাহলে তোমার ঘরে এসে খাবো। আমার একা খেতে ভালো লাগে না।"

"আমি রাম খাই।"

জিষ্ণু বললো।

"তুমি তাই খেও ।"

"কিন্তু কাকিমা ? মোক্ষদাদি ? শ্রীমন্তদা ?"

"লোকভয় ? হিঃ । মাই ফুট । জিষ্ণু, আমাদের একটাই জীবন এবং তারও প্রায় অর্ধেক শেষ করে এনেছি । ভুল করে ফিফটি পার্সেন্ট লস্ট হয়েছে ।"

"তার প্রায়শ্চিত্ত কি রোজ মদ খেয়েই করতে হবে ।"

"ছিঃ । তা নয় । এখনই, যা যখন খুশি হবে তাই করতে হবে । পরে করার সময় আর নাও পাওযা যেতে পারে । কে কী ভাববে বা বলবে তা নিয়ে ভেবে নষ্ট করার মতো সময় আর নেই । সত্যিই নষ্ট করার সময় নেই । যা করতে চাই তাই করব এখন ।"

"কিন্তু কাকিমা !"

"তুমি চুপ করো জিষ্ণু ।"

"আমার না হয় কাকিমা, তোমার যে মা পরী ! আমাদের বুকে করে মানুষ করেছেন। কাকার কর্তব্যও উনি একাই করেছেন । ভুলে যেও না কখনও ।"

"স্টপ ইট জিষ্ণু । মিশনারী ফাদারের মতো জ্ঞান দিও না । আই অ্যাম সিক অফ ইট। আর শুনতে ভালো লাগে না ।"

"কাকিমা যদি কখনও ঘরে ঢুকে এসে কিছু বলেন ?"

"আসবেন না, বলবেন না । মা আমাকে ভালো করেই চেনেন । শী উড নট ডেয়ার টু ড্যু ইট ।"

"যদি আসেন ? তুমি এতো স্যাঙ্গুইন হচ্ছো কী করে ?"

"আই উইল ফেস হার । তবে তুমি জেনে রাখো যে, মা আসবেন না । আই নো ইট ফর সার্টেন ।"

"কথা বোলো না কিন্তু, আরও খেতে ইচ্ছে করছে আমার । এই আমার দোষ খেলে আর থামতে পারি না ।"

"খাওয়াতে বাহাদুরি নেই । সমাজের সব স্তরের মানুষেরাই, ভালোমন্দ, চোর বদমাস, স্মাগলার-খুনী সব লোকই মদ খায় । থামতে জানাটাই শিক্ষা ।"

"আমি থামতে চাই না । জানি না । পাজী লোকেরা গুনে গুনে মদ খায় তারা মীন। তোমার মতো ।"

"অকেশনাল পার্টি-টার্টিতে অনেকেই খায়। আমিও খাই। তুমিও নিশ্চয়ই খেতে। কিন্তু এমন নেশা করলে কবে থেকে যে সন্ধ্যেবেলা না হলেই চলে না ?"

"নেশা ।"

"হ্যাঁ ।"

"পনেরোই আগস্ট, উনিশশো পঁচাশি ।"

শ্রীমন্তদা এসে বললো, "দাদাবাবু, দিদিমণি মোক্ষদা, খাবার সাজিয়ে দিয়েছে টেবলে ।"

জিষ্ণু বললো, "চলো । আমরা যাচ্ছি । চলো, পরী ।"

"চলো ।"

খেতে খেতে জিষ্ণু বার বার মনে করার চেষ্টা করছিলো পনেরই আগস্ট, উনিশশো পঁচাশি। ঐ তারিখটি খুব চেনা, চেনা লাগছে । অথচ মনে করতে পারছে না চেনা কেন ?

"কি ভাবছো ?"

পরী বললো, খাওয়া থামিয়ে ।

ভালো করে পরীর মুখে চেয়ে দেখলো জিষ্ণু । পরী অত্যন্তই সুন্দরী ।

দাদারা, ভাইরা অন্য চোখে বোনেদের দিদিদের মুখে চায় । এই চোখ কি অন্য চোখ ? এতো বছর কেন লক্ষ্য করেনি পরীকে এমন করে কে জানে ! অথচ পরীর সঙ্গেই বড় হয়েছে । কত খেলা, স্মৃতি, প্রথম কৈশোরের গা-শিরশির করা নানা অনুভূতি । মনে পড়ে ।

"কী ভাবছো জিষ্ণু ঃ"

বললো, পরী ।

"নাঃ । কিছু না ।"

"ভাবা খুব ভালো । ভাবনা শুধু মানুষেরই প্রেবোগেটিভ । এমন করে ভাবতে তো আর কোনো প্রাণীই পারে না ।"

"জানি ।" জিষ্ণু বললো ।

খেয়ে উঠে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো জিষ্ণুর যে এইট্টি ফাইভের পনেরোই অগাস্ট সকালে চানচানির বাড়িতে ওদের প্রতিবেশি পুষির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো জিষ্ণুর ।

হঠাৎ হেসে উঠলো জিষ্ণু ।

"হাসলে যে ?"

"কুইজ-এর আন্‌সার পেলাম ।"

"কী ?"

"মনে পড়ে গেছে । এইট্টি ফাইভের ফিফটিনথ্ অগাস্ট পুষির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো আমার ।"

"তাই ? স্ট্রেইঞ্জ ! তার সঙ্গে আমার ড্রিঙ্ক করার কী সম্পর্ক ?" পরী বললো । ক্যাজুয়ালি ।

"না । সম্পর্ক থাকবে কেন ?"

তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে জিষ্ণু বললো, হোয়াট্ আ কো-ইনসিডেন্স ।

চৌমাথাতে মিনি থেকে নামতেই প্রায় গায়ের পাশ দিয়েই একটি স্কুটার চলে গেলো।

পিনিয়নে বসে আছে যে মেয়েটি, কালো চুড়িদার এবং সাদা কুর্তা পরে তাব গায়ের পারফ্যুমের গন্ধ এসে নাকে লাগলো জিষ্ণুর ।

ছেলেটি লম্বা চওড়া । সুগঠিত চেহারা । কালো গেঞ্জী আর সাদা ট্রাউজার পরা । মেয়েটি যেন কী বললো ছেলেটিকে । ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়ানো জিষ্ণুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলো, জেব্রা-ক্রসিংটা পেরিয়ে জিষ্ণু রাস্তা পেরোবে কিনা । জিষ্ণুর মুখের উপরে চোখ রেখেই ছেলেটি হেসে উঠলো মেয়েটির কথাতে । জিষ্ণুর কানে না পৌঁছনো কথাতে ।

পুরো হাসি নয় । ঠোঁট দুটি কাঁপলো শুধু । মেয়েটিও মুখ ঘুরিয়ে তাকালো । দেখতে ভালোই । কিন্তু জিষ্ণুর চোখে ভালো লাগলো না । ভালো হলেই কি সকলকেই ভালো লাগে ?

ওরা কি জিষ্ণুকে নিয়ে ঠাট্টা করছে ? ওই কি ওদের হাসির খোরাক ।

আজকাল জিষ্ণুর কেবলই এরকম মনে হয় । অফিসে, বাড়িতে, পাড়ায়, পথে-ঘাটে । মনে হয়, ওকে নিয়ে সকলেই ঠাট্টা করছে, মুখ টিপে হাসছে । প্রত্যেকটি পরিচিত, অর্ধপরিচিত মানুষ এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে ওর বিরুদ্ধে ।

এরকম ছিলো না জিষ্ণু । পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিলো নিজের উপরে । পুষি হঠাৎ চলে যাবার পর রোজই ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে । আগে এক মিলিগ্রাম করে খেতো । আজকাল দুই মিলিগ্রাম করে খেতে হয় । নইলে ঘুম আসে না কিছুতেই । সমস্ত সকালটা ঘোর ঘোর লাগে । বাসের দরজার হ্যাণ্ডেল পিছলে যায় হাত থেকে, যদি কখনও বাসে ওঠে । পিছলে যায় কলম । চান করার সময় হাত পিছলে সাবান পড়ে যায় বার বার । দাড়ি কামানোর সময় গাল কেটে যায় । কেউ যদি পেছন থেকে ডেকে ওঠে নাম ধরে পথে, কী বাসে, কী অফিসে, অনেকক্ষণ সময় লেগে যায় ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিতে । তারপর তাকে অথবা তার গলার স্বরকে চিনতেও অনেক সময় লাগে । চেনা-অচেনা সব মানুষের গলাকেই ডাস্টবীনের উপরে-বসা দাঁড়কাকের গলা বলে ভুল হয় ।

জিষ্ণু আর সেই জিষ্ণু নেই । অন্য মানুষ হয়ে গেছে ।

স্কুটারে-বসা ছেলেটি জিষ্ণুর চেয়ে দু-এক বছরের বড় হলেও হতে পারে

মেয়েটি একেবারে পুষিরই সমবয়সী ।

ট্রাফিকের লাল আলোটা হলুদ হলো । জিষ্ণুর মনে হলো চিরদিনই হলুদ হয়ে থাকলেই ভালো হতো । "ফর এভার অ্যাম্বার" নামের । অনেক দিনের পুরোনো প্রিন্টের একটি ইংরিজি ছবি দেখেছিলো । কিন্তু ওর মনে হওয়া-হওয়িতে কিছুমাত্রই এসে যায় না সংসারের । হলুদ, সবুজ হলো । আবারও হলুদ হবে । তারপরে লাল ।

ছেলেটি খুব জোরে স্কুটার ছুটিয়ে চলে গেলো । জিষ্ণু নিজেও একদিন যেতো । ও অনেকখানি পথ ফুটপাথের ভীড় ঠেলে দৌড়ে গেলো ওদের পেছনে পেছনে । হাত তুলে চেঁচিয়ে বলতো গেলো, না না । এই যে শুনছেন ! এরকম করবেন না, প্লীজ ।

কিন্তু স্কুটাবের পেছনের লাল আলোটা যানবাহনের ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো এক মিনিটের মধ্যে । একটা ভয়মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস পড়লো । হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো ও মোড়ে ।

স্যাঙ্গুভ্যালিতে যখন ঢুকলো তখন কেউই আসেনি । অনেকই বছর পরে এলো । আজ শনিবার । জিষ্ণুর ছুটি । সকলের তো নয় ! অফিস যাদের আছে, তাঁরা বাড়ি ফিরে চানটান করে কিছু খেয়ে-দেয়ে তবেই হয়তো আসবে ।

বছর দশেকের পুরোনো দলটা আঁব নেই । এখন যা আছে তা নিছকই ভগ্নাংশ । সুমিত মারা গেলো হঠাৎ এনকেফেলাইটিস-এ । মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে । এতো ভালো চাকরিটা! বিয়ে করেছিলো সুমিতাকে ভালোবেসে । ওদের ছেলেটার বয়স তখন তিন মাস । দুজনেব নামে নাম মিলিয়ে ছেলের নাম রেখেছিলো স্মিত ।

সুমিত, সুমিতা এবং স্মিতর কথা মনে পড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ও সান্ত্বনা পেলো । সুমিতা টেলিফোন অপারেটরের কাজ করে একটি কমার্শিয়াল ফার্ম-এ ।

জিষ্ণুদের স্যাঙ্গুভ্যালির দলটা ভেঙে গেছে কিছু সুখের ও কিছু দুঃখেরও কারণে । নরেন, পিণ্টে, চিনু, ঋতেন, যথাক্রমে প্যারিস, মিজৌরী, লানডান এবং অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে । যারা গেছে, তাবা কেউ এঞ্জিনীয়ার কেউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কেউ ডাক্তার অথবা আর্টিস্ট । যারা থেকে গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লেখালেখি করে । দু-একজন গদ্য । বেশিই কবিতা । চলে যাওয়ার দল ওয়েল-সেটলড ইন লাইফ । কালার্ড ছবি পাঠায় ওদের নতুন বাড়ি-গাড়ির । কেউ কেউ বা তার বাড়ির বাথরুমের বাথটাব্-এ পাইপ-মুখে শুয়ে আছে, তার ছবি । বস্তিবাসীর হঠাৎই লানডানে পৌঁছনো আদিখ্যেতার দলিল । গার্ল-ফ্রেণ্ডদের ছবিও পাঠাতো কেউ কেউ । যখন হা-ভাতেপনা ছিলো । এখন গার্লফেণ্ড, সাদা চামড়া মেয়েমানুষ, জল-ভাত হয়ে যাওয়াতে আর পাঠায় না । বাথটাব-এ পাইপ মুখে শুয়ে থাকার ছবিও নয় । এক-একজন মানুষ কী আশ্চর্যরকমভাবে পাল্টে যায় । আর তাদের পাল্টাবার রকমটাই বা কত বিভিন্ন জিষ্ণু ভেবে অবাক হয় ।

জিষ্ণুও কিছু বড়লোক নয় । তবে সচ্ছল । কিন্তু ওর রক্তের মধ্যে কোনো বদগন্ধ হীনম্মন্যতা থেকে জন্মানো কোনোরকম আদিখ্যেতাই ছিলো না । ছিলো না যে, তা জেনে, গর্ব বোধ করে ।

পিণ্টে লিখেছিলো : "সাদা মেয়ে অনেকই হলো । বিয়ে করতে হবে দিশি মেয়েকেই । দিশি বৌ-এর কোনো বিকল্প নেই । সাতদিনের জন্যে যাবো দেশে । আর এবারে বিয়ে করেই ফিরবো । মেয়ে দ্যাখ্ । অন্য সবাইকে বল । শহরে ঢেঁড়া পেটা ।"

জিষ্ণু উত্তরে লিখেছিলো যে, "সাতদিনের নোটিশে ভালো তেলওয়ালা চিতলমাছেব পেটি অথবা বড় কইও পাওয়া যায় না যে ধনেপাতা কাঁচা লংকা দিয়ে ঝোল খাবি । বিয়ে করার মতো মেয়ে তো দূরের কথা ।"

উত্তরে পিণ্টে লিখেছিলো খুব রেগে গিয়ে : "এই জন্যেই বাঙালীদের কিসসু হলো না । বিয়ে করাব মতো মেয়ে মানে কি ? মেয়ে মাত্রই তো এক । একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । শুধু পিগমেনটেশান আর চুলের রঙেই যা তফাৎ ! আর মন ? মেয়েদের মন দেবতারা বোঝে না আর আমি কোন দুঃখে তা বোঝাবুঝির মধ্যে যেতে যাবো ?"

পিণ্টে আবারও লিখেছে : "ওরে লেথার্জিক বঙ্গসন্তান ! উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি করে আমার বৌ দ্যাখ । যেন ইংরিজিটা একটু জানে, কথা চালাবার মতো, বাকিটা আমি শিখিয়ে নেবো । ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড-ট্যাকগ্রাউণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই । এ যুগে কে বস্তী থেকে এসেছে আর কে পথের ফুটপাথে মানুষ হয়েছে তাতে যায় আসে না কিছুই । কার কাছে মাল আছে, ক্ষমতা, লোকের ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা, সেটাই বড় কথা । আমার সবই আছে । আমার বউ-এর কিছুমাত্র না থাকলেও চলে যাবে । তার মা-বাবা না থাকলেই ভালো । থাকলে তো শেষে তারা আমার ঘাড়েই চাপবে । মেয়ে এবং তার মা-বাবা তো এখানের এতো স্বাচ্ছল্য দেখে ওভারহোয়েলমড হয়ে যাবে ।

চেহারাও চাই সাদা-মাটা । মামা-বাড়ি কাকার বাড়ি মানুষ হওয়া মেয়ে হলেই ভালো । অপ্রেসড থাকবে মোটামুটি । চাহিদা-ফাহিদাও কম থাকবে । দেখতে বেশি ভালো হলে বিদেশে বিপদ । ফাঁকা বাড়ি । নিজে সারাদিন বাইরে । বউ চরতে চরতে শেষে অন্য ভিটেয় গিয়ে উঠবে । মেয়েদের সঙ্গে ছাগলদের মানসিকতার খুব মিল আছে । যাহা পায় তাহাই খায় । অন্যর বউ ভাগাবার এলেম অনেকেরই আছে এদেশে দিশিদের । কারো বা তা হোলটাইম অকুপেশান । নিজের বউকে ঠেকিয়ে রাখার এলেমও খুব বেশি লোকের নেই । আমার জন্যে মেয়ে দেখছিস যে এ কথা আমার মাকে কিছুই বলবার দরকার নেই । বাবাকেও নয় । আমরা পেছনে স্কুল কলেজে পড়াশুনো করার জন্যে যা খরচ করেছে বুড়ো, মানে আমার বাবা, তা অনেকদিন

আগেই ফেরত দিয়ে দিয়েছি । আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই । বিজয়াতে চিঠি-ফিঠি লিখি কিন্তু টাকা-পয়সা আর একটুও দিতে পারবো না । তুই হয়তো জানিস না যে বুঁচির বিয়ের সমস্ত খরচও আমি দিয়েছিলাম। আমাদের মা-বাপেরা স্রেফ ছেলেমেয়ে প্যায়দাই করেছিলো । আর কোন্ কম্মোটা করেছে বল, ছেলেমেয়ের জন্যে ? সাত টাকা মাইনের স্কুলে পড়াশুনা শিখে গর্দভ হয়েছি । এ দেশের টেলিগ্রাফের তারে নুন ছিটিয়ে বরফ গলিয়ে প্রথম জীবন আরম্ভ করেছি । আমাকে তখন কেউই দেখেনি । আমিও কাউকে দেখবো না । অনেকই কষ্ট করেছি । অনেক । ব্যাপারটা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ।

একা বসে থাকলেই জিষ্ণুর মাথার মধ্যে একটা নিঃশব্দ কমপ্যুটার চলে । মানুষজন, চেনা-মুখ, আর ভালো লাগে না । অথচ বেশিক্ষণ একা থাকলে জিষ্ণুর মনে হয় যে, পাগল হয়ে যাবে ।

এক কাপ চা নিয়ে বসে রইলো মিনিট পনেরো ।

কেউই এলো না । জুনিয়র ব্যাচ ও তস্য জুনিয়র ব্যাচের অনেকেই এলো । হাসলো । তারপর নিজেদের তুমুল হৈ-হল্লাতে ডুবে গেলো । জিষ্ণুর মনে হয় প্রতিদিন যে-পরিমাণ জীবনশক্তি কলকাতার রেস্তোরাঁ ও কফি হাউসগুলোতে নষ্ট হয়, তার এক কণাও চ্যানেলাইজ করতে পারলে এবং তা দিয়ে থার্মাল বা হাইড্যাল স্টেশান চালাতে পারলে কলকাতায় কোনোদিনও লোডশেডিং হতো না ।

জিষ্ণুরাও অবশ্য সময় নষ্ট করেছে ওদের বয়সে । অনেকই জীবনশক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেও এখনও যেটুকু বাকি আছে তা দিয়েই বা কী করে ? খরচ করার সুস্থ ও স্বাভাবিক পথ না থাকলে জীবনীশক্তি নিজেকেই খেয়ে ফেলে অনুক্ষণ কুরেকুরে । কখনও ড্রাগ । এই নিরুপায় যৌবনকে, জীবনীশক্তিকে চুষে চুষে খেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় । কখনও ক্যানসারের মতো নিঃশব্দে খায় ; কখনও বা আত্মরতির গোপন উৎসারে ; আবার কখনও বোমার সশব্দ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে । নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন পথ আছে, প্রকৃতি আছে, রকম আছে । কেউ স্বেচ্ছায় সেই পথ বেছে নেয় ; কেউ অনিচ্ছায় । কেউ অন্যের ইচ্ছায় ।

এখনও ওরা একজনও এলো না । টিভিতে বোধহয় ভালো কোনো ছবি আছে । আর বসে থেকে লাভ নেই । দোষ তো ওরই । যার দেওয়ার মতো সময় নেই তার কোনো বন্ধু থাকে না । নষ্ট কবার মতো সময় না থাকলে আড্ডাও মারা যায় না । নিয়ত আড্ডাবাজরা ব্যস্ত মানুষদের পছন্দ যে করে না শুধু তাই নয় ; এক ধবনের ঘৃণাও করে !

চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে এলো জিষ্ণু ।

জনস্রোত বয়ে চলেছে অবিরত । পানের দোকানে, সিগারেটের দোকানে ভীড় । ভীড় ম্যাগাজিন আর কাগজের দোকানেও । মুহূর্তে মুহূর্তে বাস যাচ্ছে, ট্রাম, মিনি,

ট্যাক্সি, গাড়ি । কত স্ত্রী-পুরুষ, নদীর উজান-ভাঁটার মতো পথের উজান-ভাঁটা বেয়ে, কত জায়গায় চলে যাচ্ছে, কত জায়গা থেকে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ফিরছে কত লোক ! অথচ শুধু জিষ্ণুরই এই মুহূর্তে কোথাওই যাবার নেই । সমস্ত পৃথিবীর উপর এক তীব্র অসূয়া আর বিরক্তি এসে গেছে এবং সেই বিরক্তির স্বাদ সর্বক্ষণ জিভে লেগে থাকে ।

জিষ্ণুর কোথাওই যাবার নেই ।

বহুবছর আসতে পারেনি এই "আড্ডায়" । ও কোনোদিনই আড্ডাবাজ নয় তবে এলে, স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হতো বলে কখনও কখনও আসতো । আজ এলো । অথচ আজ কেউই নেই । গত তিনটে বছর পুষির সঙ্গেই প্রত্যেকটি অবসরের মুহূর্ত কেটেছে । হয় পুষিদের বাড়িতে, নয় জিষ্ণুদের বাড়িতে, রবীন্দ্রসদনে, বইমেলাতে, নন্দনে ।

যেদিনই একা থাকতে ইচ্ছে করে না ঠিক সেদিনই পৃথিবী চারপাশ থেকে সরে গিয়ে তার একাকিত্বর গহ্বরকে গভীরতর করে ।

প্রমোশনটা আটকে ছিলো । তাও এসেছে দুমাস আগে । খুবই বড় লিফট্ । এখন স্কাই ইজ দা লিমিট । জিষ্ণুর প্রমোশনের পর পুষির মা আর জিষ্ণুর কাকিমা দুজনে মিলেই এনগেজমেন্টের দিন ঠিক করেছিলেন আগামী বুধবার । দু'পক্ষেরই আত্মীয়স্বজন আসবেন বলে কথা ছিলো জিষ্ণুদেরই বাড়িতে । সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান হয়ে যাবারও কথা ছিলো । গজেন ক্যাটারারকেও বলে দিয়েছিলো জিষ্ণু । পরীই মেনু ঠিক করেছিলো সেদিন রাতের খাবারের । অবশ্য পুষির ইচ্ছে ছিলো শীতকালেই বিয়েটা হোক ।

জিষ্ণু বলেছিলো, "ভালোই তো হতো । বসন্তে হলে তোমার মা তো আর লেপ দিতেন না ।"

"কী অসভ্য !"

বলে, হেসেছিলো পুষি ।

"সমস্তটুকু আমাকেই মা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছেন আর একটা লেপের দামই বেশি হলো তোমার কাছে ?"

"লেপ কি শুধু লেপই ? নতুন-গন্ধ লেপের নিচে কিছু না-পরা নতুন-গন্ধ বউ নিয়ে শোওয়ার মজাটাই আলাদা । ভাবলেই তো আমার গা শিরশির করে ।"

জিষ্ণু হেসে বলেছিলো ।

"আনকোরা নতুন আর রাখলে কোথায় ? লেবেল-টেবেল তো ছেঁড়া হয়েছেই । শুভদৃষ্টির সময় যারা নতুন বউ-এর মুখ দেখে প্রথমবারে তারাই যথার্থ নতুন-বউ পায় ।"

সাঙ্গুভ্যালির সামনে দিয়ে খুব জোরে আরো একটা স্কুটার গেলো । পেছনে-

বসা মেয়েটি হয়তো ছেলেটির বান্ধবীই হবে । জোরে জাপটে ধরে আছে চালককে । কিছুটা প্রয়োজনে, বেশিটা সান্নিধ্য এবং উষ্ণতার জন্যে । সাদার উপর হাল্কা বেগুনী-রঙা ছাপার কাজ করা একটি শাড়ি পরেছে মেয়েটি । ছেলেটির মাথায় হেলমেট্ ।

হেলমেট্ তো জিষ্ণুও পরেছিলো । তাই বেঁচে গেছিলো অবশ্য । পুষির মাথায় হেলমেট্ ছিলো না । হেলমেট্ ছিলো না, কিন্তু মিনিবাসটা অন্যায়ভাবে, জোরে, বে-আইনী করে ওভারটেক না করতে গেলে....

মিনিবাসের ড্রাইভারদের মুখগুলো দেখা যায় না । সবগুলো মুখকেই একইরকম মনে হয় । ওদের মায়া দয়া নেই । দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, অনভিজ্ঞ, অনিয়মানুবর্তী যূথবদ্ধ পুলিশ ও প্রশাসনের মদতপুষ্ট একদল খুনী ওরা । কত পরিবারকে যে অভুক্ত রেখেছে, কত মানুষকে যে জিষ্ণুরই মতো ঘর বাঁধতে দেয়নি নিজেদের হঠকারী সমাজবিরোধিতায় তা যদি ওরা জানতো ! ওদের বিবেক, টায়ারের কাদারই মতো ধুয়ে ফেলেছে ওরা । কত রক্তচাপের রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে যে মেরেছে ওরা, পঙ্গু করেছে যে কতজনকে আর লেখাজোখা নেই । হয়তো জেনেশুনেই করে । "জনগণের" নাম করে সবকিছুকেই করা সম্ভব এখন । এই শহরে ট্রাফিক আইন বলে যদি কিছু মাত্রও থাকতো ! যদি রিভলবার পিস্তল চালাতে পারতো জিষ্ণু তবে যে ড্রাইভার স্কুটার থেকে পড়ে-যাওয়া পুষিকে চাপা দিয়েছিলো, সেই ড্রাইভারকে খুঁজে বের করে নিজে হাতেই গুলি করে মারতো ।

জিষ্ণু শুনেছে, যে-মিনিবাস চাপা দিয়েছিলো পুষিকে সেই মিনিবাসের সেই ড্রাইভার জামিন পেয়ে গেছে অনেকদিনই । একই মালিকের অন্য মিনিবাস চালাচ্ছে নাকি এখন । কনফার্মড খুনী । পোটেনশিয়াল খুনীও । আবারও স্টিয়ারিং হাতে অ্যাক্সিলেরাটরে পা দিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে ।

থুতু ফেললো রাস্তায় জিষ্ণু ।

ও কোথাওই কখনও থুতু ফেলে না । ফেললো তবু, ঘৃণার সঙ্গে । ওর মতো কোটি কোটি অসহায় মানুষের প্রতিবাদের এই-ই রকম । কিন্তু ফেলেই লজ্জা পেলো খুব ।

পুষি তো ফিরবে না ।

দারুণ একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙা কাঞ্চীপুরম্ শাড়িতে পুষিকে সাজানো হয়েছিলো শ্মশানযাত্রার আগে । এনগেজ্মেন্টের দিন যে শাড়ি পরার কথা ছিলো সেই শাড়িটাতেই । কাজল, চন্দন দিয়ে সাজিয়েছিলো ওর বন্ধুরা নববধূর মতো । মুখে একটুও বিকৃতি ছিলো না । মনে হচ্ছিলো, যে হাসছে । যেন জিষ্ণুকে এক্ষুণি বলে উঠব, "অ্যাই অসভ্যতা কোরো না ।"

সে পর্যন্ত সবই সুন্দর ছিলো । তারপর ইলেকট্রিক ফারনেসের সামনে ওকে খাট থেকে নামিয়ে বাঁশের একটা ফ্রেমের উপর শোয়ানো হলো । ফারনেসের লোহার

দরজাটা যেন যমদুয়ারের দরজাই খুলছে এমন প্রচণ্ড ঝনঝন্ শব্দ করে উঠে খুলে গেলো। শ্মশানের কর্মচারীরা ভাবলেশহীন মুখে ঠেলে দিলো পুষিকে সেই লাল উত্তপ্ত গুহাতে। তখন বৈদ্যুতিক আগুনের সেই লাল আভাতে পুষির বুদ্ধি-প্রসারিত মাজা মুখটি ক্ষণিকের জন্য এক অসামান্য সৌন্দর্য পেলো যা ওকে ফুলশয্যার রাতে জিষ্ণুর আদরও হয়তো দিতে পারতো না। তারপরই অদেখা আগ্নেয়গিরির জীবন্ত জ্বালামুখের মতো ফারনেস্ তাকে সহসাই গ্রাস করে নিলো। একেবারেই সহসা। পুষি ক্রমশ লাল হতে হতে লাল আভা মণ্ডিত হয়ে হঠাৎ লাল আগুনের সঙ্গে মিলে গেলো। দড়াম শব্দ করে যমদুয়ারের লোহার দরজা পড়লো। আগুন মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষে কেড়ে নিলো ওকে।

মিনিবাসের ড্রাইভারটাকে পেলে জিষ্ণু অমনি করেই একদিন ঠেসে দিতো শালাকে খোলা ফারনেসের মধ্যে একেবারেই জ্যান্ত অবস্থায়। তবুও কি কমতো জ্বালা!

ভাবছিলো, জিষ্ণু।

কী করবে, কোথায় যাবে ভাবছিলো জিষ্ণু, এমন সময় পিকলুর সঙ্গে দেখা। পিকলু একটা লাল মারুতি গাড়ির সামনে বাঁদিকের সীট থেকে মোড়ে নামলো।

"কী রে! কেমন আছিস?"

পিকলুকে দেখেই জিষ্ণু শুধোলো।

"এই!"

নিরুত্তাপ গলায় বললো, পিকলু।

"কবে এলি? কৃষ্ণনগর থেকে? তোর না আজকাল ওখানেই ডিউটি?"

"প্রতি সপ্তাহেই তো আসি উইক-এণ্ডে।"

খবরটা জিষ্ণু রাখে না বলে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন বললো পিকলু।

"খুসি কেমন আছে? কন্যা।"

"জিষ্ণু, তোর সঙ্গে একটু দরকার ছিলো। তোর বাড়িতেই হয়তো যেতাম কালকে সকালে। এখানে এসেছিলাম, ভাবলাম যদি ওদের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দরকারটা জরুরী।"

পিকলু বললো।

তারপরই বললো, "কোথাও বসবি? যাচ্ছিলি কোথাও? তুই?"

"নাঃ। আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।"

কথাটার মধ্যে যে শূন্যময় হাহাকার ছিলো সেটা পিকলুর কানে গেলো না। ও নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলো মনে হলো।

পিকলু ভাবলেশহীন চোখ জিষ্ণুর চোখে মেলে বললো, "সন্নিসী-টন্নিসী হবি নাকি? কী এমন ঘটলো তোর পানা-পড়া পুকুরের জীবনে।"

কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। উদ্দেশ্যহীনভাবে জিষ্ণু পথের দিকে চেয়ে

রইলো।

"তবে চল্ আমাদের বাড়িতেই যাই।"

পিকলু হঠাৎ বললো। জিষ্ণু যে যাবে না, তা জেনেই।

"হ্যাঁ। গেলে অবশ্য মন্দ হতো না। খুসির সঙ্গে দেখা হয়নি বহুদিন।"

পিকলু মনে মনে বললো, বহু বছর।

"আজ থাক। আজ এখান থেকে আমাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে। ভুলেই গেছিলাম।"

জিষ্ণু বললো।

"যাবি কোথায়? পরী কেমন আছে? সেদিন দেখলুম শ্যামবাজারের মোড়ে একটি সিড়িঙ্গে লোকের গাড়ি থেকে নামতে নামতে একেবারে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ে হাসছে। কী র‍্যা!"

"হাসতেই পারে।"

জিষ্ণু বললো।

"হাসির উপর ট্যাক্স তো বসেনি এখনও। তবে যে-কোনোদিন বসিয়ে দেবে কলকাতা কর্পোরেশন। গলায় গামছা দিয়ে ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপারে তাঁদের জুড়ি নেই। বদলে কিছুমাত্র করুন আর নাই করুন।"

"লোকটা কে? বিয়ে করবে নাকি? পরীকে?"

পিকলু পুরোনো কথার জের টেনে বললো।

"কী করে বলবো? সেটা ওর, মানে ওদের পার্সোনাল ব্যাপার। তাছাড়া, বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব হলো না নাকি তোর পক্ষে?"

"খুড়তুতো বোন কার সঙ্গে প্রেম করছে খবর পর্যন্ত রাখবি না তা বলে?"

"কারো গাড়ি থেকে হেসে নামলেই যদি প্রেম হয়ে যেত তবে তো ... তাছাড়া, পরী স্বাবলম্বী। নিজের যোগ্যতাতে স্বচ্ছল। বয়সও হয়েছে প্রেমের, বিয়েরও; ওর যা-খুশি তাই করতে পারে ও।"

"বাবা। তুই যে খুব মডার্ণ হয়ে গেছিস আজকাল দেখতে পাচ্ছি।"

"চিরদিনই ছিলাম। তুই খোঁজ রাখিসনি হয়তো। মানুষের মানসিকতাও গাছেদেরই মতো! আলোর হদিস পেলেই ডানা ছড়ায় সেদিকে; পাতা ছাড়ে।"

"এই শুরু হলো তোর ভ্যাদভ্যাদে কাব্যি।"

তারপরই বললো, "তোর তো প্রোমোশন হয়েছে শুনেছি। কী রে জিষ্ণু?"

"কার কাছে শুনলি?"

"মদনের কাছে।"

"কে মদন?"

"তোদের কোম্পানীতেই কাজ করে রে। তবে ভেরী স্মল ফ্রাই। অন্য

ডিপার্টমেন্টে । তোকে কে না চেনে তোর অফিসে ।"

"চেনাই স্বাভাবিক ।"

"ও ।"

বড় রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগলো দুজনে । জিষ্ণু ভাবছিলো যে পিকলুও বদলে গেছে অনেকই পিন্টেরই মতো । জিষ্ণু নিজেও হয়তো বদলেছে অনেক । কে জানে !

"পুষির কী খবর জিষ্ণু ?"

জবাব দেবে কি না ভাবলো জিষ্ণু একবার । পিকলু ওর ছেলেবেলার বন্ধু । তাকে এই দুঃখের খবর বলে হালকা হতে পারবে একটু নিশ্চয়ই । সব কথা তো সকলকে বলাও যায় না । বলাও উচিত নয় । কিন্তু ....

"কী রে ? কথা বলছিস না যে !"

"পুষি মারা গেছে গত মাসের প্রথম শনিবার । অনেকদিনই হলো ।"

"সে কি রে ? কী করে ?"

"আমার স্কুটারকে ধাক্কা মেরেছিলো মিনিবাস । আমার হেলমেট্ ছিলো বলে বেঁচে গেছি । ও...."

"ভেরি স্যাড ।"

পিকলু বললো মেকানিক্যালি ।

জিষ্ণু বুঝলো যে, পুষির চলে যাওয়ার খবরটা ওর হৃদয়ের কতখানি গভীর থেকে উঠেছিলো, কথাটা পিকলুর হৃদয়ের ততখানি গভীরে আদৌ গিয়ে পৌঁছলো না

পিকলু সম্বন্ধে জিষ্ণু চিরদিনই অন্ধ ছিলো । এবং পিকলু হয়তো অন্ধ ছিলো জিষ্ণুর হৃদয়ে ওর প্রতি যে উষ্ণতা আছে সে সম্বন্ধে । মানুষ বলে, বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে । পিকলুদের অবস্থা জিষ্ণুদের তুলনায় চিরদিনই খারাপ ছিলো । কিন্তু জিষ্ণু সকলকেই বলতো সমানে সমানে ছাড়া বন্ধুত্ব হয় না ওসব বাজে কথা । বলতো, পিকলুর মতো উদার হৃদয়ের ছেলে ও দেখেনি । পিকলুর মনে কোনোই মালিন্য নেই । ওর কোনো হীনমন্যতাও নেই। বরং ওর ঔদার্যের পাশে জিষ্ণুই সবসময় হীনমন্যতা বোধ করে । মানসিকতার, রুচির, মতামতের সমতা থাকাটাই বড় কথা প্রত্যেককেই বলতো জিষ্ণু । পিকলুর মতো বন্ধু ওর আর একজনও নেই ।

পিন্টে কিন্তু বলতো চিরদিনই যে, পিকলু শালা কিন্তু তোকে তেল দেয় । তোর মোসাহেবী করে । হি ইজ আ স্নেক ইন দ্যা গ্রাস্ ।

জিষ্ণু এ কথা শুনে খুব রেগে যেতো । বলতো, ওর আর আমার সম্পর্ক এতোদিনের এবং এতোই পুরোনো যে তুই সেই বন্ধুত্বের সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলিস না কোনোদিনও। পিকলুকে তুই কতটুকু জানিস ?

জিষ্ণুর কথাতে পিন্টে চুপ করে যেতো ।

সম্পর্ক অনেকই পুরোনো হয়ে গেলে, সে দাম্পত্য সম্পর্কই হোক কী বন্ধুত্ব

সেই সম্পর্ক যে বালির উপরেই গাঁথা হয়েছিলো এই নির্মম সত্য স্বীকার করার সাহস এবং ইচ্ছা সম্পর্ক-সম্পৃক্ত দুজনের কারোই হয় না । অবশ্য জিষ্ণু আর পিকলুর সম্পর্কটি অনেকদিন হয় সময়ের পরীক্ষা পাস করে গেছে ।

হেদোয় এসে ওরা ঘাসেই বসলো । কোনো বেঞ্চিই খালি ছিলো না ।

পিকলু বললো, "স্কুটার আনিসনি ?"

"নাঃ । স্কুটারটা বিক্রি করে দিচ্ছি । গারাজে দিয়েছি । মেরামতের জন্যে । ওরাই খদ্দের দেখে বিক্রি করে দেবে ।"

"কত দাম ধরেছিস ?"

"জানি না । সাত-আট পাবো বোধহয়।"

"আমাকে দিবি ? আমি কিন্তু পাঁচের বেশি দিতে পারবো না । তাও পাঁচটি ইনস্টলমেণ্টে দেবো। এবং পাঁচ বছরে । ভেবে দ্যাখ, তোর লস হবে কি না ?"

"নিতে পারিস, কিন্তু !"

"কিন্তু কি ?"

"ঐ স্কুটার তোর কাছে থাকলেও তো আমার চোখ পড়বেই । পুষির কথা মনে হবে। তাছাড়া, আনলাকিও তো বটে । নিবি ? অ্যাকসিডেন্টের স্কুটার ।"

"প্রেম থাকা ভালো । তবে এতোখানি সেন্টিমেণ্টাল হওয়াটা ঠিক নয় । আসলে তোর মানসিকতাটাও তোর লেখারই মতো । ভ্যাদভ্যাদে । মেদবহুল । মেইনস্ট্রীম-এ আয় জিষ্ণু। সবাই যা করে তাই কর । নদী হয়ে যা, দ্বীপ হয়ে থাকিস না ।"

একটু চুপ করে থেকে পিকলু বললো, "তোর লেখা-টেখা কেমন চলছে ?"

"এই ।"

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলো জিষ্ণু ।

জিষ্ণু একটু অবাক এবং আহত হয়েছিলো, পুষির মৃত্যুর আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না বলে পিকলুর উপর ! আশ্চর্য !

পুজোয় কোথায় লিখছিস এবারে ?

"সুরজিৎ ঘোষ তাঁর 'প্রমা'-তে একটি উপন্যাস লিখতে বলেছেন । আর সমরেন্দ্র সেনগুপ্তও বলেছেন ওঁর 'বিভাব'-এর জন্যে । ধূর্জটি চন্দ বলেছেন "এবং"-এ লিখতে । জামশেদপুর থেকে কমল চক্রবর্তীও 'কৌরব'-এ একটি প্রবন্ধর কথা বলেছেন । কিন্তু কোথাওই লেখা হবে কি না জানি না । এবারে হয়তো কোথাওই লিখব না । লেখালেখি আনন্দ-নির্ভর। সবসময়ই লিখতে হলে তা শাস্তি বলেই মনে হয় ।"

"তোর লেখার মতো এতো সেন্টিমেণ্টাল লেখা আজকাল চলে না । আজকাল টানটান এবং বীর্যবান গদ্যর দিন । একটিও বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ থাকবে

না তাতে। টেলেক্স মেসেজ আর সাহিত্যে কোনো তফাৎ নেই আর আজকাল। বুয়েচিস। সেন্টিমেণ্ট-ফেন্টিমেণ্ট ছাড়। ফালতু।"

জিষ্ণু একটুক্ষণ চুপ করে থাকলো।

বললো, "সেন্টিমেণ্ট ব্যাপারটাতো মানুষেরই একচেটিয়া। এই শব্দ তো জানোয়ারদের অভিধানে নেই। আমার তো মনে হয়, মানুষ যেদিন পুরোপুরি সেন্টিমেণ্ট-বর্জিত হবে সেদিন মানুষ আর মানুষই থাকবে না। তুই হয়তো বলতে পারিস যে, সেন্টিমেণ্টের প্রকাশটাই আধুনিকতার পরিপন্থী। এ কথা আমিও জানি। যদিও আংশিকভাবে। কিন্তু আমি তো শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে লাউডস্পীকারে আমার দুঃখের বা সেন্টিমেণ্টের কথা জানাচ্ছি না। সেন্টিমেণ্টাল লেখামাত্রই খারাপ এ কথা বলা বোধহয় যায় না।"

"তাহলে তো তুই শরৎ চাটুজ্যেকেও বড় লেখক বলবি।"

"আমি তো বলিই। সবসময়ই বলি। তবে আজ এসব প্রসঙ্গ থাক পিকলু। লেখা নিয়ে আলোচনা করার মতো মনের আবস্থাও আমার নেই এ মুহূর্তে। সেইজন্যেই বলছিলাম, এবার পুজোয় কোথাওই নাও লিখতেও পারি।"

পিকলু জিষ্ণুর উষ্মা বুঝতে পেলো তার কথায়।

সান্ত্বনা দেবার গলায় বললো, "বয়স তো আব পার হযনি। তোর মতো ছেলের মেয়ের অভাব নাকি রে জিষ্ণু। এক পুষি গেছে তো কত পুষি আসবে।"

কথাটাতে ধাক্বা খেলো জিষ্ণু।

"তুই বড ক্রুড হয়ে গেছিস পিকলু।"

"জীবন। জীবনই কবেছে বে।"

দু'কাঁধ শ্রাগ কবে পিকলু ফিলজফিক্যালি বললো।

"সকলেই তো তোর মতে টু-পাইস কামাচ্ছে না। দুধে-ভাতে তো নেই। তুই কি বুঝবি আমাদের কথা। কত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ। তুই কেন ক্রুডনেসের কথা বললি বুঝলাম না। জীবনে অনেক কিছুকেই মেনে নিতে হয়। না মেনে উপায় নেই বলে।"

জিষ্ণু জবাব দিলো না কোনো।

যাদের তর্ক করার যুক্তি থাকে না, তারাই এমন বলে। পিকলু সত্যিই বদলে গেছে অনেক। আজকাল দেখাও হয় ন-মাসে ছ-মাসে। বিয়ের পর থেকেই ও অনেক বদলে গেছে। হয়তো জিষ্ণুও যাবে। যখন বিয়ে করবে।

এক মুহূর্ত পরেই পিকলু বললো, "আমি কথাটা উইথড্র করছি। তোকে আহত করে থাকলে আমি দুঃখিত। তবে যাই বলিস, ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে। পুষি ওজ নো ম্যাচ ফর উ্য।"

"এ প্রসঙ্গ থাক পিকলু। বরং তুই যে কাজের কথা বলার জন্যে এখানে নিয়ে এলি আমাকে সেকথা বল।"

জিষ্ণু বললো আহত গলায় ।

ওর মুখেও রাগ ছিলো ।

"হ্যাঁ ! কন্যার মুখে ভাত দিচ্ছি আগামী সপ্তাহের শনিবার । মানে আজ থেকে বারো দিন পরে ।"

"এই রে ।"

জিষ্ণু বললো ।

"আমি যে থাকছি না । সেই শনিবার দীঘা যাবো । সুধাংশু আর প্রণব হোটেল করেছে। খুব সুন্দর নাকি হোটেল । একেবারেই সমুদ্রের উপরে । ওরা জোর করেই নিয়ে যাবে, আমারও মন ভালো নয় । তাই ভাবলাম ।"

"কী নাম ? হোটেলের ?"

"হোটেল ব্লু-ভিউ ।" সাহিত্যিক শংকর নামকরণ করে দিয়েছেন ।

"সুধাংশুটি কে ?"

"ও আমার ভাইয়ের মতো । দে'জ পাবলিশিং-এর । আমার একটি উপন্যাস ছেপেছে। প্রথম বই ।"

"আর প্রণব ।"

"প্রণব কর । ঐ অঞ্চলের বনেদী বড়লোক । দীঘাতেই বাড়ি ।"

"তাহলে ওদের একটু বলে আসিস না খুসিকে আর কন্যাকে নিয়ে দীঘাতে যাবো একবার। তোর জানা যখন, ডিসকাউন্ট দেবে নিশ্চয়ই । বিনা পয়সাতে থাকতে পারলে তো আরও ভালো হয় । কী রে ! মনে করে বলবি তো !"

"দেখবো ।"

জিষ্ণু বললো ।

"এবার কাজের কথাটা বল ।"

"বাবাকে তো জানিসই । ক্যান্টাংকারাস্ ক্যার্যাকটর । মানুষ বুড়ো হলে যা হয় আর কী ! তারপর বাজে মানুষ বুড়ো হলে হয় শঙ্খচূড় সাপ । একেবারেই অবুঝ এবং মতলবী হয়ে গেছেন । কন্যার মুখেভাতে আমার শ্বশুরবাড়ির একগাদা লোককে নেমন্তন্ন করে দিয়েছেন । মানা করেছিলাম । কিন্তু কে শুনছে বল্ ? এদিকে আমার কি পৈতৃক জমিদারী আছে ? না আমি তোর মতো বড় চাকরি করি ? তুই-ই বল্ ।"

"তোর কথার মানে ঠিক বুঝলাম না ।"

জিষ্ণু বললো ।

তারপর বললো, "ভালোই তো । প্রথম নাতনীর মুখে ভাত। বলবেনই বা না কেন ।"

"তা বলুন । কিন্তু তার আগে নিজের ছেলের রেস্তো সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া দরকার ছিলো ।"

জিষ্ণু চুপ করে রইলো ।

"এদিকে আমি পড়েছি মহা বিপদে । বুঝলি । প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে অ্যাপ্লাই করেছিলাম । লোনটা স্যাংশানও হয়েছে । কিন্তু পাওয়া যাবে সেই তোর গিয়ে মুখে ভাতের পরের সপ্তাহে । এখন তুই আমার মুখ রক্ষা না করলে চলবে না ।"

"আমি ?"

"কী করতে হবে ?"

"পাঁচ হাজার টাকা কালই চাই ।"

"আমি ? কিন্তু কাল তো ব্যাংক বন্ধ ।"

"ও । তাহলে পরশু সকালেই তোর বাড়ি যাবো ।"

"চেক-বই যে অফিসেই থাকে । অফিসেই আসিস ।"

"তাই যাবো । তাড়া করছি এইজন্যে যে, আমাকে আবার মঙ্গলবার একবার বর্ধমানে যেতে হবে খুসিকে নিয়ে । সেখানে আবার গিয়ে ছোট শালাজের সাধ । লোক বলতে তো আমি একা । দাদার কথা তো জানিসই । আলাদা থাকে । সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে আসবে । কোনো কাজেই তাকে দিয়ে হবার নয় । সাহায্য তো দূরের কথা ।"

"আমি উঠি ।"

হঠাৎই জিষ্ণু বললো, উঠে পড়ে ।

"বুজলি জিষ্ণু, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেলেই আমি তোকে এসে দিয়ে যাবো । স্টপগ্যাপ হিসেবেই তোর সাহায্য চাইছি । ওঃ । আর একটা কথা । ঐ পাঁচটা হাজার, সাড়ে-সাত যদি করিস তো খুবই ভালো হয় । এতো লোককে বাবা বলে ফেলেছেন । একেবারে সেনাইল্ হয়ে গেছেন মানুষটা । আর যা বাজার ! টাকার কি কোনো দাম আছে?"

"সাড়ে-সাত হাজার দিতে হলে তো দু ব্যাংকে চেক কাটতে হয় । লিকুইড ফাণ্ডস তো বেশি থাকে না । আমার এক ব্যাংকে অত টাকা নেই । এফ. ডি বা অন্য ইনভেস্টমেন্টেই থাকে । যতটুকু আছে ।"

"তাই না হয় কাটবি । গরজ বড় বলাই । দরকার যখন আমার তখন দুই ব্যাংকেই আমাকে ছুটতে হবে ।"

"যা ভালো মনে করিস ।"

"কাল, মানে পরশু তোর বাড়ি, সরি, অফিসে কখন যাবো বল্ ?"

"ন'টা নাগাদ আয় । সাড়ে ন'টায় আমার মীটিং আছে একটা । ব্যাঙ্গালোর থেকে কাস্টোমার আসছেন ।"

"পৌনে দশটায় গেলে হয় না ? আমার মেজ সম্বন্ধী আবার আসবেন সোনারপুর থেকে । তার শালীর বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করতে । আমারই গিয়ে যত ঝামেলা

রবাড়ির সকলের আমিই যেন লোকাল গার্জেন। তাকে বিদেয় করে তারপর আসতে হবে।"

"ঠিক সাড়ে ন'টায় কিন্তু আমাকে মীটিং-এ বসতেই হবে।"

"দেখি। তা হলে ন'টায় যাওয়ারই চেষ্টা করবো। আমি তা হলে চলি। এই ই রইলো কিন্তু। সাড়ে-সাত। সাত দিনের জন্যে। এবং স্কুটারটা।"

বলেই, বড় রাস্তায় পৌঁছেই একটি মিনি ধরে পিকলু চলে গেলো।

জিষ্ণু ভাবছিলো যে, পিকলুর শ্বশুরবাড়িতে পিকলু একজন কেউ-কেটা। এই ম কী! কার আদর-যত্ন ভাগ্য যে কোন্ ঘরে ঠিক করা থাকে বিধাতাই জানেন। জামাই যতই করুক শ্বশুরবাড়ির জন্যে, শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা তাকে কোনোদিনই রাখে না। কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও থাকে না তাদের। এই কথা বলেন জিষ্ণুদের সে নগেনদা। বড় ভালো মানুষ। সত্যিই শ্বশুরবাড়ির জন্যে অনেকই করেছেন এক সময়। ওঁর ভিতরে যে এক গভীর দুঃখ এবং অভিমান কাজ করে তা ঝ জিষ্ণু। অন্যর দুঃখ কম মানুষেই বোঝে। টাকা পয়সা দিয়ে করাটা বড় কথা। হৃদয় নিংড়ে যা দিয়েছিলেন তার সবই ফেলা যে গেলো ওঁর দুঃখ এটাই।

পুষির কারণে আজ সন্ধ্যেবেলায় জিষ্ণুর যে বিষণ্ণতা ছিলো তা আরও গভীর পিকলুর জন্যে। পুষি কোনোদিনও জিষ্ণুর কাছে কিছুই চায়নি। কিছুমাত্র নয়। খেলেও পয়সা পুষিই দিয়েছে জোর করে। ওরা খুব যে অবস্থাপন্ন ছিলো এমনও। পুষির চাকরিটাও তেমন বড় কিছু ছিলো না। পুষি ওর উচ্ছ্বাস আর জীবনীশক্তি ই সব অভাব পুষিয়ে নিতো।

পুষি একদিন বলেছিলো, আমি "উইমেন্স লিব"-এ বিশ্বাস করি না। বিয়ের চাকরি ঠিক ছেড়ে দেবো। দেখো। তখন তো তোমার পয়সাতেই খাবো-পরবো তাতে আমার সম্মানে একটুও লাগবে না। তোমাকে এতো ভালবাসবো, তোমার য্য এতো কিছু করবো যে, তুমিই ভাববে ঈস্স! কী লজ্জার কথা।

বলেছিলো, আমাকে মাসে দুশো টাকা করে পকেট-মানি দেবে কিন্তু।

বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ালো জিষ্ণু নানা কথা ভাবতে ভাবতে। একটা মিনিবাস শ আওয়াজ করে এগিয়ে গেলো। পুষির হাসি মুখটি ভেসে উঠলো জিষ্ণুর নে। কনডাকটর্ শূন্যে লাথি ছোঁড়ার মতো পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগলো। য় রক্ত চড়ে গেলো জিষ্ণুর। ভাবলো, পাটা ধরে ফেলে এক টানে তাকে নিচে য়ে তার কলার ধরে মাথাটা ঠুকে দেয় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা নাৎসী জার্মানীর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের বন্দীদের মতো তে গিয়ে উঠে, মাথা নীচু করে হাতল ধরে দাঁড়ালেন।

কনডাকটরকে মারার স্বপ্ন উবে গেলো জিষ্ণুর। কলকাতার মানুষের মতো শক্তি- সম্পন্ন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন; নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত

মানুষ বোধহয় শুধু ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীর কোনো বড় শহরেই নেই । যে দে
অধিকাংশ মানুষ একজন মহিলার হাওয়ায় চাবুক মারার শব্দেই ত্রস্ত হয়ে নতজ
হয় বসে তাঁর পদলেহন করেন সেই দেশের মানুষদের এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়
যোগ্যতাও অবশ্য নেই । দুচোখ জলে ভরে আসে জিষ্ণুর এই ক্ষুন্নিবৃত্তির বৃ
ঘূর্ণায়মান নিরুপায়, সর্বংসহ, প্রতিবাদহীন, পরনির্ভর অগণ্য নারী-পুরুষের দি
চেয়ে ।

পিকলু যেদিন আসবে বলেছিলো সেদিন আসেনি। ওর জন্যে অপেক্ষায় থেকে থেকে মীটিং প্রায় আধঘণ্টা দেরী করে আরম্ভ করেছিলো।

জিষ্ণু অফিসে কাজ করছিলো। আজকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আসার কথা বম্বে থেকে। বম্বে থেকে কলকাতার ফ্লাইট খুব ভোরেই ছাড়ে। কিন্তু মাড়োয়ার টেলেক্স এলো এখুনি যে "টেকনিক্যাল ফল্ট"-এর জন্যে ফ্লাইট চার ঘণ্টা ডিলেড্। দশটাতে যদি বম্বে থেকে ছাড়ে তবে বারোটা দশ নাগাদ দমদম-এ নামবে প্লেন এবং সেখান থেকে অফিসে পৌঁছতে আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট। রিজিওন্যাল ম্যানেজাব এবং লোকাল পি. আর. ও. এয়ারপোর্টে বসে আছেন সকাল পৌনে আটটা থেকে। ওঁদেব সঙ্গেও কথা হয়েছে জিষ্ণুর। এখন বারোটা বাজে। এম. ডি. যে-কোনো মুহূর্তেই এসে পৌঁছতে পারেন। কাজ-পাগলা মানুষ। খাওয়া-টাওয়ার কথা মনে থাকে না। এসেই কাজে বসবেন। ওয়ার্কহলিক!

ঠিক সেই সময়ই বেয়ারা স্লিপ নিয়ে এলো পিকলুর। খুবই বিরক্ত হলো জিষ্ণু। যেদিন ওর আসার কথা, আগের দিন রাতে ঘুম না হওয়া সত্ত্বেও কোনোক্রমে কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় পিকলুর জন্যেই এসে পৌঁছেছিলো। অথচ সেদিন পিকলু আসেতোনিই একটা ফোন পর্যন্ত করেনি আসতে পারছে না জানিয়ে। মধ্যে সাত দিন কেটে গেছে। ওর মেয়ের মুখেভাতও হয়ে যাবার কথা। এরকম "কুডনট কেয়ার-লেস", অ্যাটিচুডের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব তো দূরের কথা সম্পর্ক রাখাও মুশকিল কোনো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে।

পিকলু ঢুকতেই জিষ্ণু বিরক্ত গলায় বললো, "এক্ষুনি এম. ডি. আসছেন। বড় টেনসানে আছি। কী ব্যাপার হলো তোর?"

"আর বলিস না। বর্ধমানের শালা। এমন ইরেসপনসিবল্। দে দে চেকটা কেটে দে। মনে আছে তো। সাড়ে-সাত বলেছিলি? বলেছিলি দু' ব্যাঙ্কের চেক কাটবি।"

"তোর মেয়ের মুখে ভাত তো হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"তবে ?"

"তবে কি ? কোনোক্রমে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার নিয়ে ম্যানেজ করলাম ।"

"আমাকে নেমন্তন্ন করলি না ? টাকাটা দিতে পারিনি বলে কি নেমন্তন্ন থেকেও বাদ দিলি ?"

"আরে নেমন্তন্ন আর কী । গরীবের ব্যাপার ! অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকেই বলেছিলাম । আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন । বাবার ইরেসপনসিবল কাণ্ড সব । জানিসই তো । দে টাকাটা দে ।"

"আমি বুঝি ঘনিষ্ঠদের একজন নই ? আমি শুধুই তোর ব্যাঙ্কার ?" জিষ্ণু বললো ।

ঠিক এই ভাবে জিষ্ণু কোনোদিনও কথা বলেনি পিকলুর সঙ্গে । পিকলু সেটা লক্ষ করে অপ্রতিভ গলায় বললো, "মানে না, না । তুই ভুল বুঝছিস ।"

"তোর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা পাসনি? যার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছিলি ?"

জিষ্ণু জানবার জন্যে স্টাবর্ন হয়ে বললো ।

"আরে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কথা আর বলিস না । ইনএফিসিয়েন্সীর চূড়ান্ত ।"

জিষ্ণুর এবারে পিকলুর ওপর একটু রাগ হলো । বললো, "নো ওয়াণ্ডার । তুই যদি সে অফিসেব একটি স্পেসিমেন হোস্ । কাজটা করিস কখন তোরা ?"

"আরে আমার তো ঘুরে বেড়ানোই কাজ । কাজ না করলে সরকার কি এমনিতেই চলছে । চাকা বন্ধ হয়ে যেতো তো ! আমাব জবটাই এইরকম । রোদে-বৃষ্টিতে ঘুরতে কার আর ভালো লাগে বল ?"

জিষ্ণু বললো, মনে মনে, কেমন যে চলছে সরকারী চাকা তা বেসরকারী সকলেই হাড়ে হাড়েই জানে ।

বললো "আমার আজ সত্যিই খুব টেনসান ।"

বলেই, ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলে একটি খাম দিলো পিকলুকে ।

"নেমন্তন্নই যখন করলি না, আমি যখন তোর ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে পড়িই না তখন তোর বাড়িতে তোর মেয়ের মুখে ভাত উপলক্ষ্যে আর এখন যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না । এতে তিনশো টাকা আছে । খুসিকে বলিস পছন্দমতো কিছু কিনে দেবে কন্যার জন্যে ।"

"আর চেকটা ?"

"আজ আমার সময় নেই পিকলু । সত্যিই বলছি । তুই রাতে একটা ফোন করিস বাড়িতে বরং ।"

"রাতে ? কোথায় ?"

"বাড়িতে । বললামই তো ।"

"বাড়িতে তো চেক বই থাকে না ।"

"তা থাকে না । আমার একটা কমিটমেন্ট আছে । সেটা ছিলো না তোর সঙ্গে যেদিন স্যাঙ্গুভ্যালির সামনে দেখা হয় তখন । গত বুধবারে সেটা অ্যারাইজ করেছে ।"

"কী ব্যাপার ?"

"সেটা তোকে জানাতে পারছি না । কিন্তু খুবই জরুরি ।"

"এমন কথাও আছে যে তুই আমাকেও জানাতে পারিস না ।"

"থাকবে না কেন ? আমি তো তোর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পড়ি না ।"

কথাটা বলে, বলতে পেরে খুশি হলো জিষ্ণু ।

এতো বছরের অন্তরঙ্গতম বন্ধুর ব্যবহারটা ওর কাছে এই প্রথমবার যেন কেমন ঠেকলো। যতখানি ব্যথিত হলো, ততখানি ক্রুদ্ধ হতে পারলো না । কিন্তু পিকলু সম্বন্ধে জিষ্ণু যা ভাবছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে এ পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে পারবে না ও । এতো বড় দুর্বিপাক একজন পুরুষের জীবনে আর হতে পারে না ।

"তুই ব্যাপারটাকে বেশি সীরিয়াসলি নিচ্ছিস ।"

অ্যাপোলজিটাকালি বললো পিকলু ।

"বেশি আদৌ নয় । ঠিক যতখানি সীরিয়াসলি নেওয়া উচিত ততখানি সীরিয়াসলিই নিচ্ছি ।"

"বাঃ বাঃ । খুব রেগেছিস দেখছি ?"

পিকলু বললো ।

জিষ্ণু চুপ করে থাকলো ।

"তা রাগ না হয় হয়েছে কিন্তু চা তো খাওয়াবি এক কাপ ? না তাও নয়।"

"দ্যাখ আজকের দিন এবং ঠিক এই সময়টা আমার আতিথেয়তা করাব নয় । তাকে বলেছি যে এম. ডি. যে-কোনো মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পাবেন । এমন একদিনও কি হয়েছে যে তুই আমার অফিসে এসেছিস আর চা খাওয়াইনি তোকে ?"

পিকলু এবার উঠে দাঁড়ালো ।

বললো, "তুই একটা চাকর হয়ে গেছিস । আ রিয়্যালি চাকর । পাতি-বুর্জোয়া ।"

"চাকর তো বটেই । চাকরি যখন করি । আর সব বুর্জোয়াই সমান । পাতি আর রাজা । চাকরি করি । খেটে খেতে হয় । মনিবকে ভয় করতে হয় । কী করবো বল ?"

মৃদু হাসলো পিকলু । টিভি সিরিয়ালের ভিলেনের মতো । তারপর গোল্ড-ফ্লেক

সিগারেটে টান দিয়ে ধুঁয়োটা উপরে ছুঁড়ে দিলো। এয়ার কণ্ডিশানারের এগজস্ট ধুঁয়োর কুণ্ডলিটাকে ঠেলে পিকলুর দিকেই ফিরিয়ে দিলো।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে পিকলু বললো, "বুর্জোয়াদের কাছে কাজ করে তুইও একটা রিয়্যাল বুর্জোয়া হয়ে উঠেছিস। একটা শ্রেণী তোদের কখনও মেনে নেবে না।"

"কোন্ শ্রেণী যে মানলো তা তো আজও বুঝলাম না। ভূমিহীন কৃষকেরই মতো আমিও একজন শ্রেণীহীন মানুষ। নিজের জন্যেই কষ্ট হয় আমার নিজের। তোর তো হবেই! আশ্চর্য হই না।"

পিকলু বললো, "তবে ঐ কথাই রইলো। ফোন করবো রাতে। আজ অবশ্য হবে না। কৃষ্ণনগরে চলে যাচ্ছি। ফিরেই করব।"

ও চলে যেতেই চানচানি ঘরে ঢুকে বললো, "চলো ইয়ার বাহারসে লাঞ্চ কর্‌কে আয়েগা।"

"এম. ডি. ?"

উৎকণ্ঠিত গলায় শুধলো জিষ্ণু।

"মাড়োয়া হ্যাজ সেন্ট আ টেলেক্স জাস্ট ন্যাউ। দ্যা টেক্‌নিক্যাল স্ন্যাগ। মাই ফুট! দ্যা ফ্লাইট ইজ ক্যানসেলড। ট্যুওর প্রোগ্রাম উইল বী ইন্টিমেটেড লেটার।"

"আজ ব্যাঙ্গালোরে চলে গ্যায়ে বড়াসাব। হুঁইয়েসে হায়দারাবাদ। মে বী, উইল কাম হিয়ার নেকসট উইক ফ্রম হায়দারাবাদ। নাউ দেযারস্ আ রেগুলার ফ্লাইট টু অ্যাণ্ড ফ্রম ক্যালকাটা। নাথিং টু ওয়ারীবাউট!"

জিষ্ণুর মনটা এম. ডি-র আসন্ন ভিজিট এবং পিকলুর আসার কারণে খুবই টেন্স হয়ে ছিলো।

বললো, খুশি হয়ে; "লেট্‌স গো।"

"কাঁহা যায়ে গা ?"

"কোয়ালিটিমে চালো। নজদিকমে পড়েগা।"

চানচানি বললো, 'স্কাইরুমে খানা কব খিলায়গা? পিংকি দো দফে ইয়াদ দিলায়া।"

"যো রোজ তু ফিক্‌স্ করোগে। মেরী খুশ্‌নসীবী!" জিষ্ণু বললো।

এই মালটিন্যাশানাল কোম্পানীতে জয়েন করে ওর হিন্দী এবং ইংরিজী দুই-ই একটু ইমপ্রুভ করেছে।

"চালো।"

বীয়ার অর্ডার করেছিলো চানচানি। গত এক সপ্তাহ হলো সকাল সাড়ে আটটাতে অফিসে আসছে আর যাচ্ছে রাত নটাতে। শনি-রবিও বাদ যায়নি। নতুন এম ডি.র এই প্রথম ভিজিট। সকলেই টেন্স হয়ে আছে।

মানুষটা নাকি ভালো কিন্তু সবসময়ই হাইপারটেন্সড হয়ে থাকেন এই দোষ। াইভেট সেক্টরের এই দোষ। কেউ কুড়ি হাজার টাকা মাইনে পেলেও নো বডি াজ হু উইল গেট দ্যা স্যাক? অ্যাণ্ড হোয়েন?

বীয়ার যখন আনলো বেয়ারা তখন চানচানির বন্ধু মাইক মিনেজিস্ তাকে াকলো। সে অন্য কোণাতে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলো। আই. টি. সি. তে আছে। একাই ়লো।

চানচানি বললো, "তুম অর্ডার কর দো ইয়ার ম্যায় আভ্‌ভি আয়। মেরী কলেজকি াস্ত। তুম্‌সে মিলায়গা বাদ্‌মে।"

এমন সময় টেবল থেকে উঠে এসে মাইক মিনেজিস জিষ্ণুকে উইশ করে ালেন। ভদ্রলোক। চানচানি বললো মাইকও আমারই মতো চ্যাটার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। নচানি বলে গেলো, কলেজকি দোস্ত। বড় দুঃখের সঙ্গে ভাবলো জিষ্ণু যে, স্কুল- লেজের কোনো বন্ধুর সঙ্গেই মিলিত হবার সাধ আর নেই ওর। কোনো বন্ধুর সঙ্গেই ়। পিকলু আজ অফিস থেকে মেয়ের প্রেজেণ্ট তিনশ টাকা নিয়ে চলে যাবার রই পুরো ব্যাপারটা এবং তারপর অনেকগুলো পুরোনো ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক ়য়েছিলো। মরমে মরে ছিলো জিষ্ণু।

পিকলুর এক বোন ছিলো। একমাত্র বোন। ওরা এক বোন এক ভাই। পিকলু ানের বিয়ের পাঁচ বছর আগে থেকেই চাকরী করছিলো। যদিও পিকলুর অবস্থা ষ্ণুর চেয়ে অনেকই খারাপ ছিলো তবুও চিরদিনই পিকলু জিষ্ণুর চেয়ে ভালো ামাকাপড় পরেছে, ভালো সিগারেট খেয়েছে, নিজের খরচে কোনদিনই কোনো ার্পণ্য করেনি।

বোন চম্পার বিয়ের সময় পিকলুকে জিষ্ণু জিগগেস করেছিলো, "কী দিচ্ছিস ই চম্পাকে? টাকা পয়সা জমিয়ে রেখেছিস তো কিছু?"

পিকলু ননশালাণ্টলী বলেছিলো, "কী বলব তোকে জিষ্ণু, এক পয়সাও সেভিং াই আমার।"

অবাক হয়ে গেছিলো জিষ্ণু বন্ধুর অভাবনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে।

একটু ভেবে বলেছিলো, "এই কথা কাউকে বলবি না।"

তারপর পিকলুকে বউবাজারে নিয়ে গিয়ে তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকার কটি গয়না কিনে দিয়েছিলো চম্পার জন্যে। নিজে যা দেবার তাতো দিয়েই ছিলো। র বার করে বলে দিয়েছিলো পিকলুকে, দ্যাখ্ পিকলু, কেউই যেন না জানে যে ামি দিয়েছি ওটা। জানলে, তোকে সকলেই অমানুষ ভাববে।

অমানুষ কেউই ভাবেনি।

পিকলুর নিজের বিয়ের সময়ও পিকলু এসেছিলো জিষ্ণুর কাছে। জিষ্ণু তখন কটা এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতে কাজ করে। এই কোম্পানীতে জয়েন করেনি

তখনও । পিকলু তখনও বলেছিলো, "পাঁচ হাজার টাকা ধার দিবি, প্রভিডেন্ট ফাং
অ্যাপ্লাই করেছি । বৌভাতের খরচের জন্যে । বাবা ও মামাই সব করছেন । ত
আমারও তো কিছু দিতে হয় । টাকাটা পেয়ে নিশ্চয়ই যাবো তবে দু একদিন দে
হবে । টাকাটা পেলেই তোকে আমি শোধ করে দেবো ।"

জিষ্ণুকে ঈশ্বর পিকলুর চেয়ে বেশি দিয়েছিলেন । শুধু অর্থই নয়, হৃদয়ও
অনেকই বেশি । অনেকই দিকে । তাছাড়া পিকলু ছিলো জিষ্ণুর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু
ওর জন্যে ওর প্রয়োজনে এটুকু করতে পেরে ভালো লেগেছিলো খুবই । খুশি মনে
দিয়ে দিয়েছিলো টাকাটা ।

কিন্তু পিকলুর বিয়ের পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বছরের প
বছর কেটে গেছিলো । জিষ্ণু পথ চেয়ে বসেছিলো পিকলুর । টাকাটার জন্যে নয়
টাকাটা পিকলু দিতে এলে সে বলবে, "মার খাবি তুই । টাকাটা রেখে দে । ফের
দিতে যে চেয়েছিস, এতেই ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে ।" ভেবেছিলো জিষ্ণু,
এইটুকু আনন্দ থেকে অন্তত বঞ্চিত হবে না ও । শ্রদ্ধা না করতে পারলে এ
অপরকে ; বন্ধুত্ব তো নিশ্চয়ই, অন্য কোনো সম্পর্কই টেঁকে না এ পৃথিবীতে । কি
টাকা ফেরতই দিতে আসেনি পিকলু । এবং জিষ্ণুকেও ঐ কথাটা বলার সুযো
দেয়নি । কোনোদিনই কোনো টাকা ফেরত দিতে আসেনি সে ।

তার পর যখন মেয়ে হলো পিকলুর ? বর্ধমানের বেস্ট নার্সিং হোমে ভর্তি করা
পিকলু খুসিকে । কাকাবাবুর, মানে পিকলুর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে যেন মনান্তর ঘটেছি
পিকলুর । কলকাতায় ডেলিভারী হবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো । শ্বশুরবাড়ির সূ
বর্ধমানেই সব ঠিকঠাক করলো পিকলু । খুসি, পিকলুর স্ত্রী, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে
এই খবর পেয়ে সবচেয়ে আগে যে ট্রেন পেলো তাই ধরে বর্ধমানে পৌঁছেই সো
নার্সিংহোমে পৌঁছেছিলো জিষ্ণু । গিয়ে দেখে, পিকলু মাথায় হাত দিয়ে বসে আ
একা । প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো তখন । শ্রাবণ মাস ছিলো । মনে আছে ।

পিকলু বললো, ইওর শালা খেতে গেছে । ফিরলেই ও খেতে যাবে !

শালা ফিরলে, জিষ্ণু পিকলুকে নিয়ে ওর অফিসের কোলিগ্ ঝণ্টুদার বা
গেছিলো । বৌদি সেদিন অনেক রান্না করেছিলেন সকাল থেকে । কাদের যে
খেতে বলেছিলেন । অনেক পদ দিয়ে ঐ অবেলাতে খাইয়ে দিলেন । খেয়ে, সাইকে
রিক্শা করে ফেরার সময় পিকলুকে আবারও জিগগেস করেছিলো জিষ্ণু, কো
সাহায্যর দরকার আছে কি না ?

পিকলু বিষণ্ন মুখে বলেছিলো, "সেজারিয়ান্ হবে । টাকা পয়সার জোগা
নেই ।"

কথাটা শুনে খুবই অবাক লেগেছিলো জিষ্ণুর । কিন্তু অবিশ্বাস হয়নি । না
এর আগে কোনোদিনও অবিশ্বাস করেনি পিকলুকে । ওর প্রাণের সখাকে । তখন

বিশ্বাস অটুট ছিলো । তবে দুঃখ হয়েছিলো বন্ধুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে । সঙ্গে সঙ্গে রিক্‌শা ফিরিয়ে নিয়ে ঝন্টুদার বাড়ি হয়ে জিষ্ণু তিন হাজার টাকা ধার করে পিকলুকে দিয়েছিলো । সেই টাকাও পিকলু শোধ করেনি । শোধ করার কথা বলেওনি কখনও । ঝন্টুদাকে শোধ করে দিয়েছিলো সেই টাকা জিষ্ণু, নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও । ছ মাসের মধ্যে ।

বন্ধুর সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাল্যবন্ধুর সম্বন্ধে এসব কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে কষ্ট হয় । তাছাড়া জিষ্ণুর বন্ধুবান্ধব তো কোনোদিনই বেশি ছিলো না । যতটুকু সময় পেতো ও, পড়াশোনা, গানবাজনা, ছবি আঁকা নিয়েই থাকতো । পুরোপুরিই ইনট্রোভার্ট ছিলো । তাই তার ছেলেবেলার বন্ধু পিকলু যে এইরকম ব্যবহার করবে তার সঙ্গে বারবার, জেনে শুনে, একথা বিশ্বাস করতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিলো ওর । সত্যি কথা বলতে কী, এই মুহূর্তেও এই তঞ্চকতা যে সত্যি সে কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ও ।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটাতো সত্যি সত্যিই অভাবনীয় ! বিশ্বাসে চিড় সহজে ধরে না । অন্তত জিষ্ণুর । বহুভাবে নিশ্চিত না হয়ে কখনও কারো সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করে না ও । পিকলুর মেয়ের মুখেভাতও হয়ে গেছে । সবই মিটে গেছে । প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা যেদিন পাওয়ার কথা, সেই দিনটিও অনেক দিন পেরিয়ে গেছে, অথচ পিকলুকে সে টাকাটা দিতে পারেনি বলে জিষ্ণুকে পিকলু নেমন্তন্ন পর্যন্ত করলো না এবং সব মিটে যাওয়ার পরেও টাকা চাইতে এলো । জবরদস্তি করলো । মিথ্যে করে কাবুলিওয়ালার কথা বললো । যেন পিকলুর নিজের জীবনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে ওর শ্বশুরবাড়ির মানুষদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর সবটুকু দায়িত্ব শুধু জিষ্ণুরই । এতো বড় চক্ষুলজ্জাহীন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষকে বন্ধু বলে মানা আর সম্ভব নয় । রাগ নয় ; দুঃখে জিষ্ণু মরে যাচ্ছিলো ।

বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে মুখটা তেতো লাগছিলো । বন্ধু যে, যে উষ্ণ হৃদয়ে তার বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের হৃৎপিণ্ড কেটেও একদিন দিতে পারতো যাকে, সেও এমন তঞ্চকতা করলো জিষ্ণুর সঙ্গে ! জিষ্ণুর মতো বন্ধুর সঙ্গে ? জিষ্ণু ভাবছিলো, একদিন পিকলুর মেয়ে খুকিও বড় হবে । খুসির কানেও কীভাবে কথাটা পৌঁছেছে পিকলু তার নিজস্ব কায়দায় তাও জিষ্ণু জানে না । হয়তো জিষ্ণুকেই ভিলেইন সাজিয়ে রেখেছে নিজেকে হীরো বানাতে । পিকলুর খলবৃত্তির কারণে খুসি এবং খুকির সঙ্গেও হয়তো জিষ্ণুর সম্পর্ক চিরদিনেরই মতো খারাপ হয়ে যাবে । অথবা হয়তো থাকবেই না ।

কান্না পাচ্ছিলো জিষ্ণুর । বুক ভেঙে যাচ্ছিলো এই কথাগুলি ভাবতে অথবা বিশ্বাস করতে ।

এমন সময় চানচানি ফিরে এলো ।

বাঁচলো জিষ্ণু ।
"হ্যাভনট উ্য প্লেসড্ দ্যা অর্ডার ফর ফুড ?"
"নো ।"
বললো, অন্যমনস্ক গলায় জিষ্ণু ।
"আজীব্ আদমী তু ইয়ার্ । অফিস কব্ লোওটেঙ্গে ?"
"স্টুয়ার্ড ! স্টুয়ার্ড !"
বলে, ডাকলো চানচানি ।

রাত অনেক হয়েছিলো। গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে একটা বাজলো। জিষ্ণুদের গলিতে গানুবাবুদের বাড়ি আর পেটা ঘড়ি এখনও মধ্যযুগীয় আবহাওয়াকে মরতে দেয়নি। বেশ লাগে।

জানালার পাশে লেখার টেবলে বসে ছিলো জিষ্ণু। টেবললাইটের পাশেই ওর শোওয়ার খাট। বইপত্র, তানপুরা, হারমনিয়ম, ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই সারা ঘরে ছড়ানো ছিটানো। হাঁটতে গেলে বই সরিয়েই হাঁটতে হয়। আর শ্রীমন্তদা শুচিবাইগ্রস্ত মানুষ। সবকিছুই ঝকঝকে তকতকে করে পরিষ্কার না করতে পারলে তার খিদে হয় না। রোজ ডাঁই-করা কাপড় কেচে ইস্ত্রী না করলেও। এই ঘর পরিষ্কার করা নিয়ে বহু পুরোনো কাজের লোক শ্রীমন্তদার সঙ্গে মারামারি লাগে। জিষ্ণু তাকে ঘরে হাত দিতে দেয় না পাছে সব জিনিস এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীমন্তদা হাত দেবেই দেবে। তার "গোছানো" মানেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীমন্তদা হাত দেবেই দেবে।

ইন্‌করিজিবল।

জিষ্ণু লিখছিলো। এমন সময় কাকিমা ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকলেন ওর ঘরে।

"কী কাকিমা ? ঘুমোওনি ?"

"পরী যে এখনও ফিরলো না।"

"এখনও ফেরেনি ?"

"না। তুই তো বাইরে খেয়ে এসেছিস আজ। নইলে খাওয়ার টেবলেই জানতিস।"

"গেছে কোথায় ?"

"কোনোদিনও কি বলে যায় ? অন্য লোকের কথা ভাবা তার চরিত্রেই নেই। অফিস থেকে গেছে নিশ্চয়ই কোথাও। তবে মনে হচ্ছে রিহার্সালেই গেছে। তাদের অফিসের অফিসার্স ক্লাব থিয়েটার করছে না!"

পুরো পাড়াটা নিঝুম । কুকুরগুলো মাঝে-মাঝেই চিৎকার করে উঠেছে । ট্রাম বাসের আওয়াজও আর নেই । এই কলকাতাকে কলকাতা বলে চেনা যায় না

লেখা বন্ধ করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে জিষ্ণু বললো, "বোসো কাকিমা ! চিন্ত কোরো না । এসে যাবে । কোথায় রিহার্সাল তার ঠিকানা জানা থাকলেও না হয় হতো ।"

"কী করে বলব বল ? আমাকে জানালে তবে না জানবো ।"

"আর একটু দেখো তারপর বেলিকে ফোন করে দেখব । এতো রাতে মিছিমিছি ফোন করা ঠিক নয় ।"

"যা ভালো মনে করিস কর । এই মেয়ের চিন্তা আমি আর করতে পারি না দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে ।"

জিষ্ণু কাকিমাকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বললো, "বলো, আজ সারাদিনের খবর বলো ।"

"বহুদিন পর আজ পতু এসেছিলো ওর মেয়ে ফুলকিকে নিয়ে ।"

"পতু কে ?"

"আরে তোর কাকার কোয়ার্টারের উলটোদিকে থাকতো না নীলুবাবুরা । তাঁর স্ত্রী পতু । আর মেয়ে ফুলকি । ফুল্‌কি । এম. এ. পড়ছে এখন । ভারী চমৎকার মেয়ে হয়েছে ।"

"তাই ?"

"হ্যাঁ। ওদের অবস্থাও ভালো হয়েছে এখন । বড় কষ্ট করে থাকতো সেই সময় ।"

"সকলেই ভালো থাক । আজকে মুড়িঘণ্টটা বড় ভালো খেলাম ।"

"আমিই রেঁধেছিলাম ।"

কাকিমা বললেন ।

"সেতো আমি খেয়েই বুঝেছিলাম । মোক্ষদাদির হাতের রান্না ভালো কিন্তু তোমার মতো ভালো নয় ।"

"শ্রীমন্তদা কবে ফিরবে ?"

"আরো দিন সাতেক পর ।"

"আর মোক্ষদাদি ?"

"সে তো কালই ফিরবে ।"

তারপর বললেন, "রান্না-বান্না আজকাল ভালো করে করা যাবে কী করে মোক্ষদার কী দোষ ? মাপা জিনিসে ভালো রান্না হয় না । আমিও পারতাম না সে দিনকাল কি আর আছে ! সেই মাছ নেই, সেই তেল নেই, সেই মনই নেই যে রাঁধে তার এবং যে খায় তারও ।"

"একদিন ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি কোরো তো কাকিমা। তোমার হাতের াটা-চচ্চড়ি বহুদিন খাইনি। সেদিন হীরুকাকাকেও খেতে বোলো।"

"বাঁধানো দাঁতে আর কাঁটা-চচ্চড়ি কি খাবে? দু'পাটি দাঁতই তো বাঁধানো। ;নেছি ওঁর মা-বাবা কারোই দাঁত ভালো ছিলো না। করলে তোর একার জন্যেই বতে হবে। পরীটা তো কাঁটা খায়ই না। মাছের মধ্যে এক রুই আর পাবদা। ার সব মাছেই নাকি তার কাঁটা লাগে। মেয়েরা বেড়ালের মতো কাঁটা ভালোবাসে। াওয়ার ব্যাপারে এ বাড়িতে তুইই মেয়ে আর পরীই পুরুষ। কই মাছের কাঁটা- াথা খায় না কুড়মুড়িয়ে, পাবদা বা ট্যাংরা মাছের কাঁটা-মাথাও খায় না, সে তোর তল-কইই রাঁধি কী পেঁয়াজ বেগুন কাঁচালংকা দিয়ে ট্যাংরার চচ্চড়িই। অদ্ভুত মেয়ে য়েছে এক। আমার ভালো লাগে না। বিয়েথাও করলো না। চোখ বোঁজার াগে শান্তিতে চোখ বুজতে পারবো না। শান্তির কপাল করে তো আসিনি।"

"অনেক দেরী আছে তোমার চোখ বোজার। তাছাড়া পরী শুধু স্বাবলম্বীই নয়, কজন কেউ-কেটাও। তোমার চিন্তা কি?"

"না রে। মানুষ যখন এখানে আসে তখনই হিসেব হয় শুধু। আগে পরের াওয়ার বেলা কোনো হিসেব থাকে না। সবচেয়ে ছোট যে, সেই সবচেয়ে আগে যতে পারে। বড়, সবচেয়ে পরে মেয়েমানুষ, স্বাবলম্বী হলেও বিয়ে না হলে পূর্ণতা ায় না।"

জিষ্ণু চুপ করে থাকলো। পুষির কথা মনে পড়লো ওর।

"পুষিদের বাড়িতে গেছিলি?"

কাকিমা শুধোলেন।

"নাঃ।"

পুষির মায়ের কথা মনে হতেই মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

জিষ্ণু চুপ করে রইলো।

এমন সময় গলিতে একটি গাড়ি ঢোকার শব্দ হলো। এ গলিতে গাড়ি আছে ;ধু ভড়বাবুদের। তেলের কলের মালিক। তাঁর গাড়ি অনেকক্ষণ গারাজ বন্ধ য়ে গেছে। গানুবাবুদের অবশ্য অনেকই গাড়ি। অনেকরকম। তবে সেসব াড়ি যতটা দেখাবার জন্যে, চড়ার জন্যে ততটা নয়। গাড়ি সাজানো থাকে দিশি দিশি। কখনও কখনও অ্যান্টিক শোয়ের জন্যে অ্যান্টিক হয়ে যাওয়া গাড়ি বের য়ে। নানা বিচিত্র সাজে সেজে বেরান বাবু-বিবিরা। গানুবাবুদের দেখে এ রাজ্যে য মন্বন্তর, দেশ বিভাগ, নকশাল আন্দোলন, দার্জিলিঙ-এর অশান্তি, মিছিল-মিটিং নিধ-এর প্রভাব আছে কোনো তা বোঝার উপায় নেই। ছেলেদের ধাক্কা পাড়ের ুতিতে কাছা দেওয়ার রকমটা বদলায়নি একটুও এবং বদলায়নি মেয়েদের প্রমাণ াইজের গামছা পরে দিনের মধ্যে বার পাঁচেক মার্বেলের চওড়া বারান্দা দিয়ে বাথরুমে

চান করতে যাওয়া ।

এই গলির চাঁপাবৌদির স্বামী ছোটুদার আছে এনফিল্ড মোটর সাইকেল । সকা
গলি গম্‌গমিয়ে বেরিয়ে যায় । সন্ধে আটটা নাগাদ আবার গলি কাঁপিয়ে ঢোকে
লেদ মেসিন আছে কয়েকটা ছোটুদার । হাওড়ার কদমতলাতে । এক সময় ম
খাঁর রাইস মিলে কাজ করতো । হরিমতি রাইস মিলে । মেদিনীপুর জেলার ডেব্‌রাতে
কলেজের ছাত্র ছিলো যখন তখন সেখানে একবার মাছ ধরতে গেছিলো জি
ছোটুদের সঙ্গে । মণিখাঁ ফিন্‌ফিনে গা দেখা যাওয়া আদ্দির পাঞ্জাবী, চুনোট ধু
হালকা নীলাভ রিমলেস চশমা, আর চকচকে পাম্পশু পরতেন । ঠোঁটে সবস
থাকতো স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট । খুব রসিক মানুষ ছিলেন । খাদ্য পানীয় এ
জীবন-রসিক । অনেক যত্ন-আত্তি করেছিলেন জিষ্ণুদের ।

নকশালরা তাঁকে নৃশংসভাবে মারে কদমতলাতেই, সকালে যখন হাঁটে
বেরিয়েছিলেন । চিঠি দিয়েছিলো আগে । পকেটে রিভলবার ছিলো । কিন্তু রিভলবা
হাত দেওয়ার আগেই ভোজালির এক কোপে ডান হাতের কব্জীর কাছ থেকে আধখ
হাত কেটে দেয় । তারপর ....

ওঁর ডেডবডি দেখেছিলো জিষ্ণু ছোটুদার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে গিয়ে
নকশালদের হুমকিতে রেসিডেন্ট সার্জন বা অন্য কেউই মণিবাবুকে বাঁচাবার কো
চেষ্টাই করেননি বলে শুনেছিলো । সে বড় বীভৎস মৃতদেহ !

গাড়িটা এসে দাঁড়ালো মনে হলো জিষ্ণুদের বাড়িরই সামনে !

কাকিমা উঠছিলেন ।

জিষ্ণু বললো, "আমি যাচ্ছি । তুমি বোসো ।"

দরজা খুলতেই দেখলো, গাড়ি থেকে পরীকে দুজন ভদ্রলোক হাত ধ
নামালেন । পরী বেঁকে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাত নাড়িয়ে বললো, "গুড নাইট ।"

গাড়ি থেকে কে যেন বললেন, "স্লীপ টাইট ।"

গাড়িটা আর না দাঁড়িয়ে জোরে ব্যাক করে চলে গেলো গলি থেকে । হেডলাই
তীব্র আলোটা জিষ্ণুর দুচোখ ধাঁধিয়ে দিলো । আলোটা সরতেই জিষ্ণু দেখলো প
ভিতরে না ঢুকে দরজার সামনে রক-এর উপরেই বসে পড়েছে । দেওয়ালে হে
দিয়ে ।

জিষ্ণু নিচু গলায় ডাকলো, "পরী ।"

পরী জড়ানো গলায় বললো, "ঠিক আচি, ঠি আচি ।"

জিষ্ণু ব্যাপারটা আঁচ করেই, পাছে গলির জানালাগুলির পেছনে গভীর রা
কৌতূহলী চোখগুলি সব জেগে ওঠে সেই ভয়ে পরীকে তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা ক
তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করলো ।

পরী হাঁটতে পারছিলো না । প্রচণ্ড মদ তো খেয়েছিলোই, মানসিক ভারসা

়লো না ওর । হুইস্কীর গন্ধ বেরুচ্ছিলো মুখ থেকে ।

কাকিমা দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন ।

মুখে কালি ঢেলে দিয়েছিলো কাকিমার । বললেন, "কী হয়েছে ? জিষ্ণু ? কী য়েছে ওর ?"

জিষ্ণু বললো "কিছু নয় । তুমি একটু লেবু দিয়ে সরবৎ করে দিতে পারো াকিমা ওকে ? সঙ্গে একটু নুনও দিয়ো ।"

"কীসের গন্ধ এমন বিটকেল ?"

কাকিমা বললেন ।

"ওষুধ-টষুধের হবে ।"

জিষ্ণু মিথ্যে বললো ।

"ওষুধ ? কীসের ওষুধ ? ও মদ খেয়ে এসেছে । রাত সোয়া একটার সময় াচেনা লোক ওকে গাড়ি থেকে মাতাল অবস্থায় নামিয়ে দিযে গেলো ! এ মেয়েকে াড়ি থেকে বের করে দে । বের করে দে জিষ্ণু ।"

"আঃ কাকিমা । রাত হয়েছে । কেন চোঁচামেচি করছো । সরবৎটা খাইয়ে ওকে ়ইয়ে দাও ।"

"ওকে মারবো আমি ।"

"তিরিশ বছরের মেয়েকে মারবে তুমি ? ছিঃ ।"

"ও আমার মেয়ে নয় জিষ্ণু । ওর মুখ দেখতে চাই না আর আমি । দুশ্চরিত্রা । ঃঃ।"

"আঃ ! কী বলছো কাকিমা ! সরো, সরো, ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাই । তুমি ারবৎটা করে নিয়ে এসো ।"

ঘরে পৌঁছবার আগেই পরী জিষ্ণুর গায়ের উপরেই ওয়াক্ ওয়াক্ বমি করে িলো । জিষ্ণু হাত কাটা গেঞ্জী পরে ছিলো একটা । তার মধ্যে দিয়ে গলে সারা ক-পেট-গা বমিময় হয়ে গেলো ।

তারপর বেসিনের সামনে নিয়ে যেতেই হুইস্কী, মাংসর কাবাব এবং পরোটার করো মাখামাখি করে আবার ওর গায়েরই উপরে উগ্‌ড়ে দিলো পরী । জিষ্ণু লক্ষ্য রলো যে, পরীর শাড়ি ব্লাউজ বিস্রস্ত । চুলও । ব্লাউজের একটিমাত্র বোতাম লাগানো । ভতরের ব্রেসিয়ার খোলা । তার মধ্যে থেকে পুষ্ট সোনা-রঙা একটি স্তন যৌবনের াব যন্ত্রণার প্রতিভূর মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে । বড়, পাকা কাবুলি আঙুরের াতো কালো বোঁটা ।

শরীরটার মধ্যে কীরকম যেন করে উঠলো জিষ্ণুর । চোখ সরিয়ে নিলো । তারপর নজে বাথরুমে গেলো পরিষ্কার হতে । পরীকে মুখ-ধোওয়া বেসিনটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ।

যাবার সময় বললো, "কাকিমা, ওকে ধরো । ও অসুস্থ । কিছু বোলো না । আরো বমি করতে বলো গলায় আঙুল দিয়ে ! শরীর ভালো লাগবে । আমি জানি, এমন হলে শরীর খারাপ লাগে । একদিন রাউরকেল্লায় এরকম হয়েছিলো আমার একবার অফিসের পার্টিতে ।"

"আরে তুই ছেলে জিষ্ণু । এসব মাঝে মাঝে তোদের অফিসের ডিউটি হিসেবেই না করলেই নয় । তোর বাবা-কাকারাও করেছে । কিন্তু ও যে মেয়ে । ছিঃ ছিঃ এর চেয়ে সোনাগাছিতেই ঘর নিক না । বেশি দূরও তো নয় এ বাড়ি থেকে ।"

"ছিঃ কাকিমা । কী যা-তা বলছো তুমি ! ওকে ধরো । আমি পরিষ্কার হয়ে আসছি । বাথরুমে যেতে যেতে বিরক্তির গলায় বললো, "ও —ও তো চাকরি করে আমার চেয়ে বড় চাকরি । ছেলেদের বেলাই দোষ হয় না । আর মেয়েদের বেলাই যত দোষ ।"

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলো বেসিনটা একেবারে ভরে গেছে পরীর বমিতে । নানা-রঙা জিনিস থক্থকে হয়ে ভাসছে তাতে । আর প্রচণ্ড দুর্গন্ধ । কাকিমা মুখ বিকৃতি করে পরীর মুখে চোখে এক হাতে জল দিচ্ছেন এবং অন্য হাতে কপালের কাছে ধরে আছেন । সন্তান তো !

পরী বললো, "মা ! ও মা !"

পরীকে কোনোদিন বাবা ডাকতে শোনেনি জিষ্ণু । হয়তো বাবাকে মনে নেই বলেই ডাকে না ।

কাকিমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "তুই গিয়ে শুয়ে পড় জিষ্ণু । ভাগ্যিস আজ শ্রীমন্ত নেই আর মোক্ষদাও ডায়মণ্ডহারবারে গেছে । নইলে ওদের সামনে ! কী কেলেঙ্কারীটাই ..."

বলেই, এবার রাগের স্বরে বললেন, "তুই যা জিষ্ণু । কী দেখছিস ? তোকে যেতে বলছি আমি এখান থেকে । আমি সব পরিষ্কার-টরিষ্কার করে তারপরে শোবো ।"

"ঠিক আছে ।"

বলেই, জিষ্ণু নিজের ঘরে চলে গেলো ।

"কী দেখছিস ?" কথাটা দ্ব্যর্থক কিনা ভাবছিলো ।

মায়ের চোখ ! কিন্তু জিষ্ণুর চোখে বিস্ময় ছাড়া আর কিছু তো ছিলো না ।

একবার ভাবলো, নিজের ঘরের বারান্দাতে গিয়ে বসে । তারপরই ভাবলো, এই গ্রীষ্মে গানুবাবুদের গাছ-গাছালির পাতা অনেকই ঝরে গেছে । যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে জিষ্ণুকে ? যারা গাড়ির শব্দ শুনেছে ? সেই সব বাঙালীদের মধ্যে কারো কারো উৎসাহ চেগে উঠতেও বা পারে । কেউ কি পরীকে নামতেও দেখেছে গাড়ি থেকে । রক্-এ বসে পড়তে ? নাঃ । কিছুই বলা যায় না । বারান্দাতে আজ রাতে যাবে না ।

বল-লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো জিষ্ণু ।

অনেক কথা ভিড় করে এলো ওর মাথাতে । পরী যখন ছোট ছিলো তখনকার থা । তখন ওরা কাকার কোয়ার্টারে থাকতো । হাওড়ার মধ্যেও অতখানি বাগানওয়ালা ঃ কোয়ার্টার তখনও দেখা যেতো না বেশি । জিষ্ণুর বাবা চিরব্রত বিয়ের তিন বছর াই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যান । ওঁর মাও মারা যান জণ্ডিসে । ঠিক তার দু'বছর দেই । তখন জিষ্ণুর বয়স মাত্র আড়াই । কাকা স্থিরব্রতকে জিষ্ণুর বাবাই চাকরিতে কয়ে দিয়ে যান । কাকার চাকরি টাকরিতে মন ছিলো না । নাটক করতে খুব লোবাসতেন । 'হংসেশ্বরী' নামের একটি দলে ভিড়ে তিনি বছরের মধ্যে তিনমাস ত্রা করে বেড়াতেন । যে বছর বাবা মারা যান, সে বছরই কাকার বিয়েও দিয়ে ন । পিতৃমাতৃহীন জিষ্ণুকে কাকিমা হেমপ্রভা নিজের সন্তানের মতোই মানুষ করে ালেন । পরী জিষ্ণুর চেয়ে তিন বছরের ছোট ।

চাকরিটা ওর কাকা স্থিরব্রত টিকিয়ে রাখতে পারতেন কী না সন্দেহ ছিলো ারতর । কিন্তু মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনিও তিনদিনের জ্বরে মারা যান । মরে য়ে নিজে বেঁচে যান । কিন্তু মেরে রেখে যান কাকিমাকে । তখন থেকেই এই অভিশপ্ত রিবারের হাল ধরেন শক্ত হাতে সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না হেমপ্রভাই । যদিও খুব শিদিনের কথা নয়, তবুও একজন যুবতীর পক্ষে দুটি ছোট ছেলেমেয়ে জিষ্ণু আর রীকে নিজের স্বামী ও ভাসুরের সঞ্চিত অর্থের উপর ভর করে মানুষ করে তুলতে ম বেগ পেতে হয়নি কাকিমাকে । যখন ওঁরা সঞ্চয় করেছিলেন তখন হয়তো তার ছু দাম ছিলো । কিন্তু যখন শুধুমাত্র সেই সঞ্চয়ের উপরই নির্ভর করতে হয়েছিলো খন ইনফ্লেশানের কল্যাণে তার মূল্য কিছুই ছিলো না আর। সেসব ভারী কষ্টর দিন ছে । তখনই এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি, মাসে তিরিশ টাকাতে । আর ড়েননি । ভাড়া অবশ্য তিরিশ বছরে বেড়ে একশ তিরিশ হয়েছে । বাড়িওলা এক হায় সম্বলহীন বৃদ্ধ । তাকে ঠকানো কঠিন হয়নি হেমপ্রভার পক্ষে ।

হেমপ্রভা নিখুঁত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না । কিন্তু যৌবনে তো

কুকুরীও সুন্দরী হয় । কাকিমার মুখে একটি আলগা শ্রী ছিলো যার কিছু আজ
অবশিষ্ট আছে । তাছাড়া, আর যা ছিলো তা ব্যক্তিত্ব । খুব কম নারীর মধ্যেই অ
ব্যক্তিত্ব দেখেছে জিষ্ণু ।

কাকার এক বন্ধু হীরুকাকাও অনেক করেছিলেন ওদের জন্য । হীরুকাক
থাকলে কাকিমার নিজের পক্ষেও হয়তো ভেসে যাওয়াটা ঐ বয়সে ; ঐ অসহায়
পড়ে, বিচিত্র কিছুই ছিলো না !

আজকে হীরুকাকার বয়স বাষট্টি । রিটায়ার করেছেন । কিন্তু আজও কা
যে তাঁর উপরে অনেকখানি নির্ভর করেন তা জিষ্ণু জানে । হীরুকাকা বিয়ে করেন
রাজা নবকৃষ্ণ লেনে নিজের ছোট্ট পৈতৃক বাড়িতেই থাকেন । পুষির সঙ্গে জি
বিয়ের রেজিস্ট্রেশানের বন্দোবস্তও যা করার তা হীরুকাকাই কাকিমার সঙ্গে
করেছিলেন । পুষির দুর্ঘটনার খবর শোনামাত্রই দৌড়ে এসেছিলেন হাসপাতা
তারপর মর্গে । পোস্ট-মর্টেম করার সময় সমস্তক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন । শ্মশা
উপস্থিত ছিলেন এবং পুষির অদগ্ধ নাভি আর সাদা-সাদা হাড়ের টুকরো-টাকরা পু
ছোট ভাই নিমতলার পাশের গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া পর্যন্ত নীরবেই দাঁড়িয়েছি
জিষ্ণুর পাশে । হীরুকাকার এক ছেলেবেলার বন্ধু, পুলিশের ডি-আই-জি সাহায
করলে অনেকেরই মতো পুষির শরীরও পচে গলে যেতো মর্গ থেকে বেরে
বেরোতে । সেদিন হীরুকাকার প্রতি কৃতজ্ঞতা আরও একটি কারণে গভীর
হয়েছিলো জিষ্ণুর । শ্মশানযাত্রী পুষির আত্মীয়রা কেউই শুধোননি যে, ভদ্রলোক
স্বল্পজন অবশ্য জানতেন যে উনি জিষ্ণুর কাকা । আপন কাকা যে নন, তাও জানতে
আপনার চেয়েও যে অনেক বেশি আপন সেটা কিন্তু জানতেন না ।

শিশুকাল থেকেই দেখে আসছে জিষ্ণু । হীরুকাকার চিরদিনই একই পোশা
পায়ে কলেজ স্ট্রীটের রাদু কোম্পানীর পাম্প-শু । আজকাল খুব কম লোকই পরে
মিলের সস্তা ধুতি এবং ফুলহাতা পপলিনের শার্ট । তাও একই রঙের । ফিকে হ
অনেকটা বাফতার রঙের মতো দেখতে । বুক পকেটে একটি পুরোনো রঙ-জ
যাওয়া লাল-রঙা পার্কার ডুয়োফোল্ড কলম । ডান পকেটে পানের বাটা ; পেতলে
বাঘের মতো চওড়া কব্জিতে পুরোনো মডেলের একটা ওমেগা ঘড়ি । স্টীলের
লাগিয়েছিলেন সম্প্রতি । সাদা ডায়ালের নিচে বড় বড় রোম্যান অক্ষরে এক
বারো অবধি লেখা । চোখে গোলাকৃতি নিকেল ফ্রেমে চশমা । তাও দেখছে জি
জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই । ক্ষয়ে গেছিলো সেটা ব্যবহারে ব্যবহারে । চুল, মাঝ
দিয়ে সিঁথি করা । আজকাল পাম্প-শু যেমন কেউ পরে না, চুলের মাঝখান
সিঁথিও কেউ করে না । আতরও আজকাল কেউ মাখে না । কিন্তু হীরুকাকা আ
মাখতেন । বসন্ত থেকে বর্ষা, খসস্ । শরৎ এবং শীতে অম্বর । বর্ষায় হাতে থা
একটি পশুপতি পাল কোম্পানীর লম্বা ডাঁটির ছাতা । শীতে, শেয়াল-রঙা একটি র‍্যা

ড়তো গায়ে । কোনো ব্যাপারেই কোনোরকম আধিক্য বা উচ্ছ্বাস ছিলো না রুকাকার । চাকরি করতেন একটি সাহেব কোম্পানীতে । বড়বাবুর । অনেক রাত বধি খাটতে হতো, যতদিন কাজ করেছেন । হীরুকাকার কথা আজ গভীর রাতে ববার মনে পড়ছে এই জন্যেই যে, এই রাতের সংকটে হীরুকাকা পাশে থাকলে শ্চিন্ত হতো জিষ্ণু এবং শান্ত থাকতেন কাকিমাও ।

কাকাকে বা বাবাকে মনেই নেই জিষ্ণুর । কিন্তু ওদের ওই ছোট্ট এবং কসময়কার সহায়-সম্বলহীন পরিবারে হীরুকাকাই তার এবং পরীর বাবা-কাকা-জ্যাঠার অভাব একসঙ্গে পুরিয়েছেন । কাকিমাকেও একদিনের জন্যেও বুঝতে দেননি য, তিনি একা ।

পরী এবং জিষ্ণুর মামার বাড়ি ছিলো মধ্যপ্রদেশের উমেরিয়াতে । মা ও কাকিমা ই মেয়েই তাঁদের বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান । তখনকার দিনে এমন বড় একটা খা যেতো না । সব কথা, ঘটনা-পরম্পরা এখন ভাবলে মনে হয় বানানো গল্পই ঝি । কিন্তু জিষ্ণুদের পারিবারিক ইতিহাসের দুর্বলতা এবং বল দুইই গল্প হলেও বাংশেই সত্যি ছিলো ।

হীরুকাকা কাকিমাকে ভালোবাসেন কী বাসেন না তা জানে না জিষ্ণু । তবে টুকু এখন বোঝে যে কাকিমা আর হীরুকাকার মধ্যে এক ধরনের একটা সম্পর্ক শ্চয়ই ছিলো এবং আছে । কিন্তু আধুনিকার্থে 'প্রেম' বলতে যা বোঝায় ঐ একটি ত্র শব্দ দিয়ে, হীরুকাকা আর কাকিমার সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হয়তো যায় না ।

জিষ্ণুর সঙ্গে পুষির প্রেম ছিলো, যে-প্রেম পরিণতি পায় বা পেতো ওদের যতে । হীরুকাকা আর কাকিমার সম্পর্কটা যদি কখনও কোনো পরিণতি পায় তবে তো পাবে শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুতেই ।

সমাজের হাতে, নিজেদের বিবেকের হাতে, নিজেদের সংস্কারের হাতে, নিজেদের যমের হাতে বড় নির্মমভাবেই নিগৃহীত হতেন ওঁরা । হয়তো কিছুটা স্বেচ্ছা এবং ছুটা উপায়হীনতাতেও । সেই নিগ্রহর স্বরূপ উপলব্ধি করার মতো গভীরতা হয়তো ষ্ণু বা পরীদের প্রজন্মর আদৌ নেই । জানতো জিষ্ণু ।

মাঝে মাঝে কাকিমা আর হীরুকাকাকে খুব বোকা বলেও মনে হয় জিষ্ণুর । দর দুজনের সমস্ত সুখের মধ্যে দেয়াল হয়ে ও আর পরীই যে দাঁড়িয়েছিলো সে-থাও বুঝতে পারতো ও । বড় হওয়ার পর থেকেই ভারী অবাক লাগতো এবং খনও লাগে । হীরুকাকা আর কাকিমার সম্পর্কের প্রকৃতিটা বোঝার চেষ্টা করে জিষ্ণু রবার । কিন্তু সম্যক বুঝতে পারে না ।

দেওয়ালের দু-পাশে সারাটা জীবন দুজনে দাঁড়িয়ে থেকেও সুখের ঘরে একটুও ম পড়েনি বুঝি দুজনের কারোই ! শরীর ছাড়া প্রেম যে হয়, থাকতে পারে ; সেকথা বতে কষ্ট হয় । ভাবতে কষ্ট হলেও হয়তো তেমন প্রেম সংসারে অবশ্যই থাকে ।

ভাবছিলো জিষ্ণু ।

কিন্তু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয় । অল্প কদিন আগেই একটি পত্রিকাতে নীরেন্দ্রন চক্রবর্তী ইন্টারভ্যু দিয়েছিলেন এই বিষয়ে । উনি বলেছিলেন ঃ "যাঁরা বলেন শরীর ছাড়াও প্রেম হতে পারে তাঁদের তিনি 'ঘৃণা' করেন ।"

পরীই দেখিয়েছিলো কাগজটি জিষ্ণুকে ।

জিষ্ণু বলেছিলো, "পৃথিবীতে কোনো মানুষের অভিজ্ঞতাই তো সার্বিক হতে পা না । এখানে অভিজ্ঞতামাত্রই খণ্ডিত । সর্বজ্ঞ কেউই নন । তাছাড়া, সকলের বিশ্বা যে একইরকম হতে হবে তারই বা মানে কি ? উনি যা বিশ্বাস করেন অথবা অভিজ্ঞতা ওঁকে যা শিখিয়েছে, উনি তাই লিখেছেন ।"

পরী বলেছিলো, "তা নয় বোঝা গেলো । কিন্তু 'ঘৃণা' শব্দটাকে উড়িয়ে দে যায় ? তিনি নিজে একজন কবি । শব্দ ব্যবহারের আগে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে নিশ্চ ভাবনা-চিন্তা করেছেন ।"

জিষ্ণুর কিছুতেই ঘুম আসছিলো না । তাই নানা এলোমেলো ভাবনা মাথ ভীড় করে আসছিলো । স্লীপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোয় বলে ঘুমের মধ্যে কোনো বা ভাবনা ওকে আর ছোঁয় না । সবকিছু থেকেই ছুটি তখন ; সেই ক'ঘন্ট গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে আড়াইটা বাজলো । জিষ্ণুর ঘর থেকে গানুবাবু মস্ত বাড়ি এবং বাগানটা দেখা যায় । পুরো পাড়ার এইটুকুই সম্পদ । গাছ-গাছ পাখি ; সবুজ । বসন্তে ও গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাসের সমারোহ, কোকি দাপাদাপি, বর্ষায় মহানিমগাছের ফিসফিসে বৃষ্টি ভেজা পাতার আড়ালে মাথা-বাঁচা কাকেদের কলরোল । শীতের প্রকৃতির রুক্ষ মলিন খড়ি-ওঠা রূপ । পুরো গ যেন বেঁচে আছে গানুবাবুদের বাড়ির এই বাগানটুকুরই জন্যে । তারই মুখ চেয়ে চতুর্দিকের ঘুমিয়ে পড়া ধুলো নোংরা দারিদ্র্য সাধারণ্যর মধ্যে মাথা উঁচিয়ে স্নো রঙ-করা সৌধটি চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এই গভীর রাতে ব্যতিক্রমের সং হয়ে ।

বিকেলের রোদ পড়লেই দেখা যায় ময়দার বস্তার মতো ফর্সা গোল-গাল স্থূলক মহিলারা পাছাপেড়ে শাড়ি পরে বাগানে ও মার্বেলের চওড়া বারান্দায় গজেন্দ্রগম চলাফেরা করছেন । এক-একজন তেকোণা, চারকোণা, পাঁচকোণা বাবুদের পেছ একেকজন করে খিদ্‌মদ্‌গার ঘুরে বেড়াচ্ছে । স্টিভেডরিং আর শিপচ্যাণ্ডেলারিং- পয়সায় কোনোদিনও টান পড়েনি । কখনও খিদ্‌মদ্‌গারদের হাতে রঙিন ছাতা, কখ বেহালা, কখনও পানের বাটা কখনও বা ট্রের উপরে বসানো জিন এবং বরফ অ্যাঙ্গোস্টার্স বিটারর্স । গরমের বিকেলে পেস্তা দিয়ে বাটা সিদ্ধির, নয়তো কাগজীনে পাতা-ফেলা কাঁচা-আম-পোড়া শরবৎ, শীতের সন্ধ্যায় স্কচ-হুইস্কি । সান-ডাউনা বেনারস থেকে আনানো অম্বুরী তামাকে-সাজা আলবোলা । অথবা ডান্‌হিলের পাই ডান্‌হিল টোব্যাকোর ধোঁয়া ।

এখনও গানুবাবুদের বাড়িতে সবুজ যেমন অনেকই আছে, পয়সাও অনেক
ছে। বুঝুন আর না বুঝুন; হয়তো কেউ কেউ বোঝেন, কিন্তু গান-বাজনারও ওঁরা
সমঝদার। এখনও প্রায়ই ম্যায়ফিল বসে। কখনও ক্লাসিক্যাল, কখনও পুরাতনী
লা গান। কখনও কর্তামার অনুরোধে কীর্তন। পাড়ার লোকে বিনিপয়সাতে
নে। অবশ্য বাইরে থেকেই। শীতের রোদ, চাঁদের আলো, বর্ষায় ভেজা স্নিগ্ধ
নাই-এর পুরো ভাগ পায় এ গলির প্রত্যেক বাসিন্দা গানুবাবুদের বাড়ি আর
ানেরই কল্যাণে। ময়না, কাকাতুয়া ডাকে; 'বল গোবিন্দ, বল রাধে।' ম্যাকাও
ক কর্কশ স্বরে। একটা কাকাতুয়া মাঝে মাঝে বলে "কটা বাজে রে?"

তার দোসর সাড়া দেয়: "কটা চাই?"

তবে গানুবাবুদের বাড়ির কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন না। মনুষ্যেতর
ী বলে গণ্য করেন ওঁদের বোধহয়। তাতেই সকলে খুশি। তবুতো গানুবাবুরা
ছেন! ঐ বাড়িটার জন্যেই এখনও নিঃশ্বাস ফেলা যায়; প্রশ্বাস নেওয়া যায়।

পুষি একদিন জিষ্ণুর ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে বলেছিলো, "আমরা চাঁদনী
ত সারারাত বসে থাকবো এই বারান্দাতে। হ্যাঁ? ঘুমোবো না কিন্তু।"

শ্রাবণের পর থেকে শীতের শেষ অবধি এই বারান্দার আব্রু পুরো থাকে।
গোছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অস্পষ্ট হয়ে বারান্দায় পৌঁছোয়। যেন,
শ্রুত হয়ে। তখন বারান্দায় বসে থাকলে, পাশের বাড়ি বা গানুবাবুদের বাড়ি
কে দেখাই যায় না কিছুমাত্র। অথচ বাইরের সবকিছুই দেখা যায় এখানে বসে।

পুষি বলেছিলো, বিয়ের পরে এই বারান্দায় বসে থাকবে সারারাত।

ভীষণ রোম্যান্টিক ছিল ও।

এখন জিষ্ণুদের বাড়ির ভেতরের সব শব্দও মরে গেছে। পরীর বাথরুমের
জা খোলার শব্দ হয়েছিলো অনেকক্ষণ আগে। কিন্তু তারপর তার ঘরের দরজা
হওয়ার শব্দটা আর হলো না। কাকিমা সম্ভবত পরীর কাছেই আজ শুলেন।
নকক্ষণ একটানা প্রলাপের মতো নিচুগলার স্বগতোক্তি ভেসে আসতে লাগলো।
ীর, না কাকিমার তা বোঝা গেল না। তারপর আরো নিচু গলার স্বগতোক্তির
তা কিছু।

পরীর?

ভুল শুনলো হয়তো।

তারপর পুরো বাড়ির আলো নিভে গেলো। কাকিমার চাপা গলার ধমক। পরী
রেকবার বাথরুমে গেলো। এবারে আলো না জ্বেলেই।

প্রত্যেক নারীর জীবনে কিছু কিছু জমি বা এলাকা থাকে, অন্য কোনো পুরুষ,
যত কাছেরই হোক না কেন; কখনওই পৌঁছতে পারে না। এমন কি ঔৎসুক্য
াশ করতে পারে না। সেখানে সেই এলাকা সম্বন্ধে। এই জন্যেই হয়তো একজন

পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ-বন্ধুত্ব হওয়া অসুবিধের । মানে বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হো না কেন, বিবাহিত না হলে ; মধ্যে এক অদৃশ্য ফাঁক থেকে যায়ই । আমাদের এদে অন্তত । এখনও । না থাকলে জিষ্ণুকে এখন তার নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে প সম্বন্ধে আশঙ্কা আর অনুমানের পাশবালিশ জড়িয়ে এপাশ ওপাশ করতে হতো না

গানুবাবুদের পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজলো । ভোজপুরী দারোয়ান হাঁকলো 'সাবধান' ।

কাল অফিস আছে । একবার বাথরুমে গেলো জিষ্ণু । তারপর ঘুমোবার চে করলো । কিন্তু ঘুম কিছুতেই আর এলো না পরী তার সহোদরারই মতো । তবু পরী বোতাম-খোলা, ব্লাউজ আর খোলা ব্রেসিয়ার ঠেলে বেরিয়ে-আসা তামারঙা বুকে কথা বারবার মনে হলো জিষ্ণুর । পাকা কাবুলি আঙুরের মতো কালো বোঁটাটি কথাও । এবং মনে পড়ে যেতেই, পুষির বুকের কথাও মনে হলো অবশ্য । একদিন দেখতে দিয়েছিলো পুষি । বলেছিলো, আর নয় এখন । সব তোলা রইলো তোমা জন্যে । আজ বাদে কাল বিয়ে, তর সইছে না ছেলের ।

বিছানা ছেড়ে উঠে টেবল-লাইটটা জ্বাললো । স্লীপিং ট্যাবলেটটা খেলো এলার্মটা সেট করলো আটটাতে । সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই এক কাপ চা খে বাথরুমে যাবে সোজা । কাগজও পড়বে না । সাড়ে আটটার মধ্যে আফিসের গা রোজই এসে দাঁড়িয়ে থাকে । পনেরো মিনিটে পৌঁছে যায়া উচিত অফিসে । বেঁ গেছে স্কুটারে চড়তে হয় না বলে । মিনিবাসেও ।

গাড়িতে যখন অফিসে যাওয়া-আসা করে তখন পাশ দিয়ে যাওয়া অথবা ইদানি উল্টোদিক থেকেও আসা মিনিবাসের মধ্যে নির্বিকার মুখে যে সব যাত্রী বসে থাকে যাঁরা ড্রাইভার কনডাকটরদের বেনিয়মি বা অভদ্রতা করতে দেখেও কিছুমাত্রই বলে না, তাঁদের প্রতি এক গভীর অসূয়া জন্মেছে ওর । মানুষ নিজেরটা ছাড়া বোধ আর কিছুই বোঝে না । যেদিন যে- মিনিতে যিনি যাতায়াত করেন সেই মিনিরই নি তাঁর ভাই বা স্ত্রী বা মেয়ে যেদিন চাপা পড়ে মরবে সেদিনই শুধু সৎ-নাগরিকে দায়িত্ব-কর্তব্য চেগে উঠবে । যাঁরা নির্বিকার মুখে মিনিবাসের ড্রাইভার এব কনডাকটরদের তাঁদের নীরবতা এবং অপ্রত্যক্ষ সায়ে যা খুশি করাতে প্রশ্রয় দে শুধুমাত্র নিজে সময়ে অফিসে পৌঁছবার বা বাড়ি ফেরার জন্যেই তাদেরও কলার ধ নামিয়ে এনে মিনিবাসের ড্রাইভার কনডাকটরদেরই মতো ভালো করে মার দেও উচিত ।

কিছুদিন হলো জিষ্ণুর কেবলই মনে হয়, মার ছাড়া এখন আর এদেশে কিছু হবে না । সব মানুষ গণ্ডারের চামড়া পরে বেড়াচ্ছে ।

খিদিরপুরে যে স্মাগলড মালের দোকান আছে তাদেরই একটি দোকানে বিশে একজনকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছে একটি আন-লাইসেন্সড পিস্তলের জন্যে । পরে

ট্। এলে হাতটা ঠিক করে নিয়ে, নিজের হিসাব-কিতাব নিজেই করে নেবে ।
রে দোরে ঘুরে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী কিন্তু অফলপ্রসু চিঠি লিখে,
নিস্টারদের পি-এ-দের, সেক্রেটারিদের, পাড়ার এম এল এ-দের পায় তেল মাখাবার
ধ্য ও আর নেই । অনেক হয়েছে । পুষির অ্যাকসিডেন্টের পরই মোহ ভঙ্গ হয়ে
ছে । এই গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রশাসনের পরিকাঠামো, পুলিশের কর্মধারা এসবের
ানো কিছুর আর বিন্দুমাত্রও ভরসা নেই জিষ্ণুর । ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ।
নকে দিন হচ্ছে । কোথায় গিয়ে থামবে জানা নেই । জিষ্ণু এখন সত্যিই বিশ্বাস
র যে, বন্দুকের নলই হচ্ছে সমস্ত শক্তির উৎস বিশেষ করে যেখানে অন্য সমস্ত
্য উপায়ই বিফল হয় । দেখতে পাচ্ছে, চোখের সামনেই এ পথ যারাই নিচ্ছে,
রাই জিতে যাচ্ছে । এখানে সকলেই শক্তের ভক্ত নরমের যম ।

গানুবাবুদের বাড়ির আলো-ছায়া ঘেরা রহস্যময় বাগানের গভীর থেকে পেঁচা
কলো দুরগুম দুরগুম ।

ঘুমিয়ে পড়লো জিষ্ণু ।

তাড়াহুড়োতে যখন অফিসে বেরিয়েছিলো তখন কাকিমা পুজোর ঘরে এবং পরী৷
ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো । ঘুম তখনও ভাঙেনি বোধহয় ।

অফিস থেকে ফিরলে শ্রীমন্তদা খাবার ও চা দিঁলো । শ্রীমন্তদা আজই দুপু৻
ফিরেছে দেশ থেকে । কাকিমা ও পরী বাড়ি ছিলো না। শ্রীমন্তদা বললো, "কালীবাড়িতে
গেছে ।"

পাড়াতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বছর পনেরে
আগে, সেলস-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারী । এখন তিনি চাকরী ছেড়ে
দিয়েছেন । সেই মূর্তি নাকি খুবই জাগ্রত । শনি-রবিবারে বহুলোক লাইন দিয়ে মানত
করেন ও পুজোও দেন । পথে যেতে আসতে দেখে জিষ্ণু । ভালো লাগে দেখে
যে, এখনও অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখ কষ্ট, দায়-দায়িত্ব প্রতিমার পায়ের কাছে
কী নিশ্চিন্ত সমর্পণে নামিয়ে রেখে নিজেরা হালকা হতে পারেন । বিশ্বাসের ফল কি
হয় না হয় তা জানার ঔৎসুক্য ওর নেই । বিশ্বাসে যে বিশ্বাস এখনও অগণ্য লোকে
রাখেন এইটে জেনেই ভালো লাগে । ওঁদের তবু আঁকড়ে থাকার আছে কিছু

কাকিমা নাকি পরীকে নিয়ে ঐ কালীবাড়িতেই গেছেন ।

চা খেতে খেতে জিষ্ণু ভাবছিল পরী নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছাতে যায়নি । কাকিমাই
ধরে নিয়ে গেছেন । পরীকে জানে জিষ্ণু ।

শ্রীমন্তদা চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট নিয়ে যাবার সময় বললো, 'কী হয়েছে
বলোতো দাদাবাবু ? মোক্ষদা বলছিলো ভাইরাস্ জ্বর । তাই ?"

"কী ?"

"আমি আজ দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে দেখছি সারা বাড়ি থম-থম করছে । দিদিমণি
অফিসে যায়নি । এগারোটা নাগাদ একটা ফোন এলো, দিদিমণি অগ্নিশর্মা হয়ে অনেক
কথা বললো ।"

"ফোনটা অপিস থেকে এসেছিলো ?"

"তাতো বলতে পারবো না । মোক্ষদাদিও খুব চিন্তিত । মা কাউকেই কিছু
বলেননি । আমাদের পক্ষেও জিগেস করা উচিত নয় । তবে এমনতো কখনই হয়নি
কাল কী হয়েছিল দাদাবাবু ? আমরাও তো বাড়িরই লোক হয়ে গেছি এখন । তোমাদে

ালো-মন্দে জড়িয়ে গেছি ।"

জিষ্ণু চোখটা সরু করে মিথ্যে কথাটা বললো, "বললো কিছুতো জানি না ীমন্তদা। আজ আমি উঠেছিলাম দেরী করে । এক কাপ চা খেয়েই অফিসে ৌড়েছি ।"

"ও বাড়ির চাঁপা বৌদি শুধোচ্ছিলো আমায়, যখন বাজার থেকে ফিরছিলাম ..."

"কখন ?"

"এই তো একটু আগে গো ।"

"কী জিজ্ঞেস করছিলেন ?"

"বলছিলেন, কাল নাকি পরী দিদি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিলো আর তুমিই রজা খুলেছিলে। পরীদিদি নাকি বেহুঁশ হয়ে রক-এর ওপরই বসে পড়েছিলো।"

"আমি ? আমি ?"

লজ্জিত, মিথ্যাবাদী জিষ্ণু থতমত খেয়ে বললো ।

"তুমি কী বললে ? শ্রীমন্তদা ? চাঁপা বৌদিকে ?"

আমি বললাম, "মেয়েতো জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ফিরেছিলো' । কালকে তো প্রাণটাই াতো ! কী যে ভাইরাস জ্বর এসেছে শহরে ।"

"আন্দাজে ঠিকই বলেছো ।"

জিষ্ণু বললো ।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে শ্রীমন্তদাকে বললো, "কাকিমার আজকে পরীকে নিয়ে ইরে যাওয়া উচিত হয়নি । এই জ্বর ভালুকের জ্বরেরই মতো । হঠাৎ আসে, আবার ঠাৎ ছেড়ে যায় । একশ পাঁচ উঠে যায় যখন আসে ।"

"ছেড়ে গেলেও আবারও তো আসতে পারে ?"

"তাতো পারেই ।"

"ছেড়ে গেলেও শরীরতো দুর্বল করে দেয়ই ।"

"তা আর করে না ।"

"এই তো মোক্ষদাদি বলছিলো । তার দাসুদা একদিন তাকে দেখতে এসে এই ান্নাঘরের দাওয়াতেই প্রায় টেঁসে গেছিলো । ঘ্যাচা ডাক্তারকে ডেকে এনে কোনক্রমে াচায় । যাই বলো তাই বলো, ঘ্যাঁচা ডাক্তার রিকশোওয়ালাদের ফুঁড়ে ফুঁড়ে সল্ট লেক-এ বাড়ি করে ফেললো বটে কিন্তু ডাক্তার সে ভালো । কোনদিনই এলোপাতাড়ি কিচ্ছে সে করেনি ।"

"হুঁ । তা ঠিক ।"

চিন্তান্বিত গলাতে জিষ্ণু বললো ।

শ্রীমন্তদার কাছে জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলে এবং বলার পর ধরা পড়ে যাওয়াতে ড় ছোট লাগছিলো খুবই । ভাবছিলো, মিথ্যে বলেন না, বা বলতে হয় না যাঁদের

এমন মানুষ হয়তো কমই আছেন, কিন্তু পরের কারণে মিথ্যেবাদী সকলকে হতে হয় না ওর মতো । পরী অবশ্য তার পর নয় । পরীর কারণে ও একটা কেন, দশটা মিথ্যে বলতে পারে । মিথ্যে যারা হরদম বলে তাদের চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না । মনের পেশি একটুও শক্ত হয় না । সে সব মানুষ বোধহয় খুনও করতে পারে অন্যকে ঠাণ্ডা মাথায় ।

"পায়জামা পাঞ্জাবি দিবো তো । চান করতে যাবে না ?"

"হুঁ ।"

জিষ্ণু বললো ।

"মা বলে গিয়েচেন যে, ওনাদের ফিরতে দেরী হলে তুমি খেয়ে নিও ।"

"তুমি তো আবার ঘুমের ওষুধ খাবে ।"

"হুঁ ।"

"কোনো চিঠি এসেছিলো ? ফোন ?"

জিষ্ণু শুধোলো ।

"চিঠি একটা এসেছে বটে । বলতে ভুলে গেছিলাম । আর ফোন করেছিলো । পুষিদির বাড়ি থেকে । মা ধরেছিলেন । আবার করবেন বলেছেন । আহা ! পুষিমায়ের মুখটা মনে পড়লেই বুকটা হু হু করে ওঠে গো দাদাবাবু ।"

"চিঠিটা আনো শ্রীমন্তদা । আমি চান করতে যাবো !"

"হ্যাঁ নিয়ে আসছি ।"

একটা খাম । কাঁপা-কাঁপা হাতে লেখা । হাতের লেখাটা অচেনা ।

পেপার কাটার দিয়ে কেটে চিঠিটি পড়লো জিষ্ণু ।

কলিকাতা, বুধবার ।

বাবা জিষ্ণু

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমার পুত্রসম তাই "বাবা" সম্বোধন করিলাম । কিছু মনে করিও না

আমাকে হয়তো তুমি চিনিবে না । আমি তারিণীবাবু । তোমাদের অতি-মন্দভাগ্য বাড়িওয়ালা । গত মাসে আমি তোমার কাকিমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম বাড়ির ভাড়া যদি কমপক্ষে একশত টাকা বাড়াইয়া দেন, সেমৎ আর্জি লইয়া । তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা । তাঁহাকে রাজী করাইতে পারিলাম না বারংবার তোমার অফিসের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা চাহিয়াও ওঁর নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না ! সে কারণেই তোমাকে উত্যক্ত করিতেছি ।

বাবা, আমাকে মার্জনা করিও ।

বর্তমানে তোমরা আমাকে মাসে একশত তিরিশ টাকা ভাড়া দাও । আমি পেনশান

াই তিনশত টাকা। গ্রাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সমস্তই পুত্র কন্যাদিগের প্রয়োজনে ম্যুট করিয়া লইয়াছিলাম।

তিরিশ টাকা ভাড়ায় আজ হইতে তিরিশ বৎসর পূর্বে এই বাটী তোমার কাকিমাকে য়াছিলাম, হীরালালবাবুর মধ্যস্থতায়। হীরালাল অর্থে হীরুবাবু। টাকার তো আজ কানো মূল্যই নাই। তাহা কাগজই হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আর াচিবার ইচ্ছা রাখি না। দেশ তো দেউলিয়াই হইয়া গেলো বাবা।

তোমার কাকিমা হৈমদেবী আমাকে কোর্টে কেস করিতে বলিলেন। তাঁহার পক্ষে াকি কিছুই করণীয় নাই। হীরুবাবুর নিকটও গিয়াছিলাম। উঁহার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের াটী। আমাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়াই বাহির করিয়া দিলেন। অথচ উঁহার ভৃত্য দাধরের সহিত পানের দোকানে দেখা হওয়ায় সে কহিল, হীরুবাবুর নিজবাটীর কতলার ভাড়াটিয়ার ভাড়া গত তিরিশ বছরে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিরিশ ৎসর পূর্বে খাওয়া লইয়া একজনের মেসে থাকিবার খরচ পড়িত সাকুল্যে সাতাশ াকা, আর তাহাই আজ সাড়ে-চারিশত টাকাতে আসিয়া পৌছাইয়াছে। কতগুণ বৃদ্ধি াইয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবে বাবা। আমাদের এজমালি বাটীর ার্শ্বস্থ মেস হইতেই আমি এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

তোমবা যে বাটীতে আছো, তাহা চার কাঠা জমির উপর আমার পিতৃদেব তৈয়ারি রাইয়াছিলেন। একতলায় তিনখানি ঘর। এইরূপ মাপের ঘর আজকাল উত্তর লিকাতাব আধুনিক কোনো বাড়িতেই দেখা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত রান্না ঘর, ভাঁড়ার ব, খাওয়ার ঘর, ঠাকুর ঘর, মস্ত ছাদ; ছাদে চিলেকোঠা। পশ্চাতে ছোট্ট একটি াগানও আছে। সেই বাগানে আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যে রক্তকরবী, বা, কাঁঠাল, গোলাপজাম এবং আঁশফলেব গাছ নিজ হস্তে গ্লোব নার্শারী হইতে আনিয়া াগাইয়াছিলাম তাহাবা আজ মহীরূহ হইয়াছে। গাছগুলিকে একবার দেখিবার সুযোগ র্যন্ত পাইলাম না বাবা। নিজবাটী শুধুমাত্র বাটীই নহে তাহা রক্তকণিকারই অংশ। াড়াটিয়াব পক্ষে সেই বোধ, যে ঠিক কেমন তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নহে।

তোমার কাকিমা পনেরো হাজার টাকায় বাটী কিনিয়া লইতে চান কিন্তু ভাড়া, না মামলায় এক পয়সাও বাড়াইতে তিনি রাজী নন। হৈমদেবীর ন্যায় চেনা মানুষের রুদ্ধে মামলা করিবার মতন মানসিকতা আমার নাই। আর্থিক অবস্থাও নাই।

আমি তোমার বাবা এবং কাকাকে চর্মচক্ষে দেখি নাই। তোমাদের অভিভাবক লিয়া তোমার কাকিমা ও হীরুবাবুকেই আমি জানি ও চিনি। হীরুবাবু, আমাদের াড়ার ডাক্তারখানার বহু পুরাতন কম্পাউণ্ডার গোদাবাবুর বন্ধুবিশেষ। গোদাবাবুই তামাদের সহিত হীরুবাবু মারফৎ আলাপ করাইয়াছিলেন। এ সংসারে আজ আমার আপনার জন" বলিতে একটি নেড়ি কুত্তা (ভুলো) ছাড়া আর কেহই নাই। তোমাকে য়েকবার আমি দেখিয়াছি গত পনেরো বৎসরে। কেন জানি না, মনে হইয়াছে

তুমি সজ্ঞানে কাহাকেও ঠকাইতে অপারগ । আমার কাছে তুমি পুত্রবৎ । নিজ পুত্ররা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেহই আমাকে দেখে না । কন্যা দেখিতে চায়, কিন্তু তাহার নিজেব অবস্থাই শোচনীয় । কলিকাতাতেও থাকে না । তাই অনন্যোপায় হইয়া তোমারই নিকট আমার আর্জি জানাইলাম । যদি দয়া করিয়া উপবাসে মরিবার হাত হইতে রক্ষা করো আমাকে এবং ভুলোকেও তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ।

করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ।

বাত, প্রেসার ও হার্টের ঔষধ কিনিতেই মাসে প্রচুর টাকা চলিয়া যায় । নিজের খাইবার ও ভুলোকে খাওয়াইবার নিমিত্ত আর কিছুই থাকে না । বৃদ্ধ হইলে মানুষে বাচাল হইয়া পড়ে । আমাকে ক্ষমা করিও । বাঁচিলে তোমার দয়াতেই বাঁচিব ।

ইতি—

আশীর্বাদক, তারিণীকুমার চক্রবর্তী ।

পুনশ্চ ঃ তোমরা যে বাটীতে আছো সে বাটীর দলিল আমার নিকটই আছে । তুমি যদি ঐ বাটী যথার্থই কিনিতে চাও, ভাড়া বাড়াইতে যদি তোমার প্রকৃতই অসুবিধা থাকে ; তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তাহা লইয়া যাইও । তুমি যাহা দিবে তাহাই ন্যায্য বলিয়া জানিব এবং গ্রহণ করিব । দলিল দস্তাবেজে যেখানে যেখানে সহি করিতে বলিবে সেখানে সহি করিয়া দিব ।

বাবা জিষ্ণু, জীবনে বহির্জগতের মানুষকে, নিজের স্ত্রীকে, নিজের সন্তানদের বিশ্বাস করিয়া বড় মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়াছি । তাহাদের নিমিত্তই আজ আমি পথের ভিখারি । কিন্তু তবুও বিশ্বাস করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি নাই । তোমাব কাকিমাকে যখন প্রথম দেখি এবং গোদা-হীরুবাবুর নিকট হইতে তাঁহার অসহায়তার কথা সব শুনি, তোমার পিতামাতার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথাও, তখন মন বড়ই দ্রব হইয়াছিলো । তাহা না হইলে সে যুগেও ঐ বাটির ভাড়া মাত্র তিরিশ টাকা কখনওই হইত না । যাক । তাহার নিমিত্ত খেদ নাই । সংসারে কিছু মানুষ ঠকিতে আসে, আর কিছু মানুষ ঠকাইতে । পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যে ঠকিল, তাহার কিছুমাত্রই যায় আসে না । যে চিরদিনই ঠকিয়াছে তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকৃত, না মিথ্যা ; তাহা যাচাই করিবার নিমিত্তই বোধহয় ঈশ্বর আমার ন্যায় বিশ্বাসী মানুষকেও এমৎ পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করিযা লইতে চাহেন । আমি তাঁহারই শরণাগত । শেষ বয়সে মিথ্যা বা তঞ্চকতার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহি না । তাহা হইতে অনাহারে আমার মৃত্যুও শ্রেয় ।

তোমার কাকিমা হৈমদেবীকে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইও । তুমি আমার আশীর্বাদ জানিও । তোমার খুল্লতাতজাতা ভগিনীকেও জানাইও ।

আমি গোদা কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে জানিলাম যে তুমি অত্যন্তই ব্যস্ত থাকো

এবং অফিসের কাজে প্রায়ই বিলাত, আমেরিকা যাইতে হয়। যদি সময় সুযোগ করিয়া আমার এই নিবেদন দয়া করিয়া বিবেচনা করিয়া আমাকে জানাও, তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি—
আঃ তারিণীকুমার চক্রবর্তী।

বাথরুমে যাবে জিষ্ণু এবারে।

তারিণীবাবুর চিঠিটা পড়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেলো। গলির মধ্যে হলেও এতো বড় বাড়ির ভাড়া উত্তর কলকাতাতেও আজকে হাজার দুই হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিলো। কাকিমা যখন ওদের মানুষ করে তুলেছিলেন তখন তাঁর হিসেবী হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিলো কিন্তু এখন জিষ্ণু যখন আশাতীত ভালো রোজগার করে এবং পবী করে তার চেয়েও বেশি, তাব উপরে বাবা ও কাকার এফ. ডি. কোম্পানীর কাগজও নেই নেই করে কিছু আছে তখনও, কাকিমার এইরকম মানসিকতা ঠিক বোধগম্য হয় না জিষ্ণুর। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে জিষ্ণু অনেকেরই মধ্যে যে প্রথম জীবনে যেসব মানুষকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বা অর্থের অভাবে নানারকম অপমান অসম্মানের শরিক হতে হয় তাঁরাই পরে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অনুদার হয়ে ওঠেন। এটা কেন হয় বুঝতে পারে না জিষ্ণু। ওর মনে হয়। এর ঠিক উল্টোটাই তো হওয়া উচিত ছিলো।

বাথরুমই যা কম এ বাড়িতে। তখনকার দিনে অ্যাটাচড-বাথ অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হতো তাই প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম নেই। একতলায় একটি আছে। সেখানে শ্রীমন্তদা ও মোক্ষদাদি যান। দোতলার একটি বাথরুম ব্যবহার করে জিষ্ণু আর অন্যটি পবী ও কাকিমা।

বাথরুমে যাবে, ঠিক সেই সময়ই ফোনটা বাজলো।

শ্রীমন্তদা ধরে বললো, "একটু ধরুন দয়া করে। উনি স্নানে যাচ্ছিলেন। গেলেন কী না দেখি।"

রিসিভার টেবিলে নামিয়ে রাখবার আগেই জিষ্ণু গিয়ে ফোনটা ধরলো।

ঘড়িতে দেখলো ঠিক নটা। এবারে সময়ের ব্যাপারে আর ভুল করেনি পিকলু।

পিকলু বললো, "কী রে? খুব ক্লান্ত? চান তবে সেরেই নে। আমি পরে ফোন করব। ফোন করার দরকারই বা কি? কাল তোর অফিসে কখন যাবো বল?"

"কাল আসিস না।"

"কবে? কবে যাব?"

"আমার অসুবিধে আছে।"

"কী? ও সপ্তাহে?"

"না ।"

"তবে ?"

"তোকে টাকাটা দিতে পারবো না আমি পিকলু । এর আগে কোনোদিনও তে 'না' করিনি । কোনোদিনও না । তুই না চাইতেই জোর করে দিয়েছি কতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে করিস । মনে পড়বে । আর চাস না । আমি পার না ।"

"কী বলছিস তুই জিষ্ণু ! আমি যে ডুবে যাবো রে ! কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার করেছি ।"

"তুই মিথ্যা কথা বলছিস আমাকে। পিকলু, তুই আমাকেও মিথ্যে বলছিস।"

"বাই গড বলছি । আগে যে সব টাকা দিয়েছিস তা ফেরত দিতে পারিনি বলে তোর রাগ হয়েছে জিষ্ণু ? দুঃখ পেয়েছিস ?"

"কীসের দুঃখ ?"

সিঁড়ির মুখের ল্যাণ্ডিং-এ পরী এসে দাঁড়ালো এমন সময় । ফোনে কথা বলতে বলতে কখন যে বেল বাজলো, কখন শ্রীমন্তদা গিয়ে দরজা খুললো, খেয়ালই করেনি জিষ্ণু ।

পরী একটি উজ্জ্বল তুঁতে-রঙা শাড়ি পরেছে । সাদা ব্লাউজ । দু বিনুনি করেছে ঝল্‌মল্‌ করছে পুরো ল্যাণ্ডিংটা । পরী, পুষির চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরী । পুষির সৌন্দর্যে স্নিগ্ধতা ছিলো, পরীর সৌন্দর্যে তীব্র এক জ্বালা আছে । গা জ্বলতে লাগলে জিষ্ণুর । পরী ওর খুড়তুতো বোন না হলে, কেউ না হলে খুব ভালো হতো । এ এক অন্য জ্বালা ।

"কীসের দুঃখ ? জিষ্ণু ?"

পিকলু আবার বললো ।

"কিসের দুঃখ যদি বুঝতেই পারতিস তবে তুই আজও মানুষই থাকতিস । প্লীজ পিকলু । রাগ করিস না। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে। কোনো বন্ধু ছিলো না। নেই ।"

"খুসিও ঠিক সেই কথাই বলে । বলে, আমাদের থাকবার মধ্যে আপন জন একজনই আছে । সে জিষ্ণু ।"

জিষ্ণু চুপ করে থাকলো । উত্তর দিলো না পিকলুর কথার ।

পিকলু বললো, "ছেড়ে দিচ্ছি আজকে । তোর রাগ হয়েছে । পরে ফোন করে একদিন যাবো । বাড়িতেই যাবো । তাড়িয়ে দিবি না তো ? আর সেদিন টাকাটা রেডি করে রাখিস । আমার দরকারটা মিথ্যে নয় । বিশ্বাস করিস ।"

"না । তুই আর আসিস না আমার কাছে। তোকে আমি বিশ্বাস করি না ।"

"তবে পরীর কাছেই আসব । টাকাটার খুব প্রয়োজন আমার ।"

"পরীর কাছে কেন আসতে যাবি ? প্রয়োজন থাকলেই যে সেই প্রয়োজন মিটবে তার তো কোনো মানে নেই। আমারও তো অনেক কিছুর প্রয়োজন। মেটাতে পারিস তুই ?"

"আমার সাধ্য কতটুকু যে তা দিয়ে তোর প্রয়োজন মেটাবো ? তবে আমি যাবো। সত্যিই দরকার আছে পরীর সঙ্গে।"

"কী দরকার ? ওর উপরেও কি দাবী আছে তোর ? আমার উপরে যেমন আছে ? আমার কাজিন্ বলেই কি ?"

"না। দরকার আছে। বললামই তো।"

"তোর দরকার ও মেটাতে যাবে কেন ?"

"হয়তো মেটাবে। সে ও বুঝবে। তুই যদি না দিস তো ও দেবে। ও-ও তো রোজগার করে।"

"এলে, ফোন করে আসিস।"

"সে আমি বুঝব। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না যা দেখছি।"

"মানে ?"

"বললামই তো সে পরী বুঝবে। বললেই বুঝবে। পরী বাড়িতে আছে ? ফোনটা দে না !"

"না।"

"ঠিক আছে। যেদিন যাবো, টাকাটা রেডি রাখিস।"

কট করে লাইনটা কেটে দিলো জিষ্ণু।

পরী বললো, "কে জিষ্ণু ?"

"পিকলু।"

"কী বলছিলো আমার সম্বন্ধে ?"

"ও বললো, বাড়ি আসবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে। তোমার উপরেও ওর দাবী আছে। আমার কাছে টাকা চেয়েছিলো। দিইনি।"

"তো ?"

"জানি না। দেবো না বলতেই বললো, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।"

"ওঃ।" পরী বললো।

"ব্ল্যাকমেইল করতে চায় বোধহয়। তোমার সঙ্গে ....?"

জিষ্ণু বুঝতে পারলো, ল্যাণ্ডিং-এর সিঁড়ির সামনের অত আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও পরীর মুখটা কালো হয়ে গেলো।

পরী বললো, "তোমার বন্ধুটি ভালো নয়। তোমাকে অনেকদিনই বলেছি জিষ্ণু।"

"জানি। মানে, এখন জানি।"

পরী নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো। পরী যদি জিষ্ণুর খুড়তুতো বোন, আপন

কাকার মেয়ে, পরীকে দেখলেই ওর শরীরের ভিতরে কত কী ঘটে যায় ।

ও জানে, এ খুব অন্যায়, তবু ....।

পেছন থেকে ডেকে বললো, "কাকিমা কোথায় গেলেন কালীবাড়ি থেকে ?"

"কালীবাড়ি ?"

"হ্যাঁ । শ্রীমন্তদা যে বললো তোমরা কালীবাড়ি গেছিলে ?"

"না তো । কে বলেছে ? মা ?"

"হ্যাঁ ।"

"মায়ের আরেকটা মিথ্যে । আমরা নার্সিং-হোমে গেছিলাম ।"

"কাকে দেখতে ?"

"কাউকে দেখতে নয় ।"

"তাহলে—"

"আমাকে দেখাতে ।"

"তোমাকে ?"

"হ্যাঁ । আমাকে ।"

"তোমাকে ? কেন ? তোমার কী হয়েছে ?"

"আমাকে দেখাতে ।"

আবারও বললো পরী ।

বলে, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো জিষ্ণুর দিকে ।

এরপর আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলো না জিষ্ণু । বুঝলো ।

"কাকিমা ?"

"মা হীরুকাকার সঙ্গে একটু হেঁটে ফিরবে । পৌঁছে দেবে হীরুকাকা ।"

জিষ্ণু আর কথা বাড়ালো না ।

বাথরুমে নগ্ন হয়ে শাওয়ারের ঠাণ্ডা জলের ধারার নিচে দাঁড়াতেই কাল রাতে এক ঝলক দেখা পরীর ঠেলে বেরোনো উজ্জ্বল তামা রঙের স্তন এবং পাকা কাবুলি আঙুরের মতো বোঁটাটি ভেসে উঠলো । চোখ বুজে ফেলল জিষ্ণু । ভারী খারাপ ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে জিষ্ণু। পুষির মৃত্যুর পর থেকেই ও কেমন যেন হয়ে গেছে । ও এখন যাকে-তাকে খুন করতে পারে । রেপ্ করতে পারে নিজের খুড়তুতো বোনকেও । সারাদিন এয়ারকণ্ডিশানড্ ঘরে থেকে অফিস থেকে বেরিয়েই সারা শরীর যেন জ্বলতে থাকে । মিনিবাসের ড্রাইভারটাকে খুন না করতে পারলে ওর শরীর ঠাণ্ডা হবে না ।

কে জানে ! সত্যি সত্যি যদি খুন করতে পারে তাহলে এই অস্বাভাবিক তাপ আরও বেড়ে যাবে হয়তো । নিজেকে বুঝতে পারে না জিষ্ণু । শ্রীমন্তদার ভাষায় ও-ও এখন এক ভাইরাস্‌জ্বরে ভুগছে ।

ভীষণই অসুখ ওর ।

ম মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। কয়েকদিন ধরে হারের 'লু'-এর মতো হাওয়া চলেছে কলকাতায়। তার উপরে লোডশেডিং হয়ে গছে প্রায় আধঘণ্টা হল।

তারিণীবাবুর ভাগে এই আদি বাড়ির যে অংশটা পড়েছে তা একটেরে এবং বেচেয়ে নিকৃষ্ট। সাকুল্যে দেড়খানা ঘর। একফালি বারান্দা অবশ্য আছে। এ াড়ির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম জীবন বয়ে যায়। কোনো অংশর বাইরে স্নোসেম ঙ করা। কোনো অংশের জানালার লিনটেল্-এ এয়ারকণ্ডিশনার চাপা গলায় গোঁ গাঁ করে। কোনো অংশে আবার দিনই যেন আর চলে না। তারিণীবাবুর চেয়েও সইসব শরিকদের অবস্থা খারাপ।

মেজ শরিকের পাঁচুবাবু কড়াইশুঁটির চপ আর বেগুনির দোকান দিয়ে বেশ টু-পাইস করেছেন। উপরন্তু করপোরেশনে একটা চাকরিও করেন। চাকরির মাইনেটা বিনা খাটুনিতেই জোটে আর দোকানের রোজগারের গ্রস-কামাইই বলতে গেলে নিট-মুনাফা। নিঃসন্তান পাঁচুবাবুর টাকার বড় গরম। তাঁর গিন্নী দিনরাত ভিডিও দেখেন আর পটাটো চিপস্ খান। ইনকামট্যাক্স-ফ্যাক্সের কোনো বালাই নেই। তিনি মাঝে খুবই গরম হয়ে বলেছিলেন যে পুরো বাড়ি একরঙা করে দেবেন। সব জানালা দরজারও এক রঙ করবেন। যাতে বাইরে থেকে কোনো শালায় বুঝতে পর্যন্ত না পারে যে বাড়িটা আর তাদের বাসিন্দাদের মধ্যে এত এবং এত রকমের তফাৎ। কিন্তু এই ঔদার্য অন্যরা তাঁকে চরিতার্থ করতে দেননি। ন'শরিকের অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু তিনি পকেটে হাত ঢোকান না নিজের প্রয়োজন ছাড়া। কিন্তু তাতেও সব শরিক রাজি হয়নি। মেজ শরিকের বৌ-এর সঙ্গে সেজ শরিকের বৌ-এর কথা তো নেইই, মুখ দেখাদেখিও পর্যন্ত নেই। ছোট শরিক বলেছিলেন যে, চিড় যে লেগেছে এ পরিবারে তা গোপন নেই। দেওয়াল ফাটিয়ে দিকে দিকে বট-অশ্বত্থের চারাদের পাতায় পাতায় সেই চিড়েরই পতাকা উড়ছে। তাকে মেজবাবুর পয়সা আছে বলেই যে ধামাচাপা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এক শরিকে যখন

এয়ারকণ্ডিশানের হাওয়া খান অন্য শরিকের মেয়ে-বৌ তখন দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়
এটাই যখন "ফ্যাক্টো", তখন "অ্যাক্টো" করার দরকার কী ? ঢের হয়েছে । আর
'থ্যাটার' ভাল লাগে না ।

অনেকই ভেবেটেবে দেখেছেন তারিণীবাবু যে বড়লোক আত্মীয়ের মতো আপদ
বাঙালির আর দুটি নেই । গরীব আত্মীয়ের মতোও নেই । তবে বাঙালি হয়ে জন্মালে
গরীব থাকাই শ্রেয় । যারা বড়লোক, তাদের পা নাচাতে নাচাতে মনের সুখে শালা
বাঞ্চোৎ বলে গালাগালি দেওয়া যায় ।

আজ এই এজমালি বাড়িতে এমনিতেই উত্তেজনা প্রবল । কারণ ন'শরিকের
বড় ছেলে আজ বিলেত যাচ্ছে । না না, কিছু পড়তে-টড়তে নয় । নিছক দেশ
দেখতে, ন্যাংটো মেম দেখতে, ফুর্তি মারতে । সেইটেও তো অ্যাচিভমেণ্ট ! সারা
জীবনে পোস্টিং-এর জায়গাগুলি ছাড়া আর কোথাওই যেতে পারেননি তারিণীবাবু
যাওয়া হয়ে ওঠেনি । জীবনটা যে কী করে এমন শেষ-অধ্যায়ে পৌঁছে গেল তা ভেবে
নিজেই অবাক হয়ে যান । একবার গয়া গিয়েছিলেন শুধু । তাও কর্তব্য করতে
মা-বাবার পিণ্ডি দিতে ।

তক্তপোষে সতরঞ্চীর উপর খালি গায়ে শুয়ে হাত পাখার বাতাস করতে করতে
এই সব ভাবছিলেন তারিণীবাবু । তাও তো বিলেত গেল নিজের ছেলে ছাড়াও
গুষ্টির কেউ ! এতদিনে একজন বি. জি. এস । মানে বিলেত গিয়ে সাহেব । গর্ব
হচ্ছে একরকম । ওঁর চক্রবর্তী গুষ্টির কারো কিছু ভাল হলেই তারিণীবাবু কেবল
একটি কথাই বলেন ঃ বাঃ । ঈশ্বরের কাছে বলেন মনে মনে, সকলেরই ভাল হোক
সকলেই সুখে থাকুক ।

খাটের তলায় শুয়ে থাকা নেড়ি-কুত্তা ভুলো খুব জোরে একটা প্রশ্বাস ফেলে
যেন সায় দেয় তারিণীবাবুর কথায় ! ওর নাকের ডগায় বসে-থাকা একটা কাঁটালে
মাছি ফুৎকারে উড়ে যায় । আবার ফিরে এসে নাকে বসে ।

সকলেই ভাল থাকুক, ভাল খাক ; ভাল পরুক । সকলের ছেলেমেয়েই মানু
হোক । এ ছাড়া চাইবার আর কিছুই নেই তাঁর । একটা ব্যাপারে যে দুঃখ হয় ন
তা নয় । উনি চাকরিতে যখন ছিলেন সে জামশেদপুর-গুয়া-খরশুয়া লাইনেই হোক
কী গোমোডালটনগঞ্জ লাইনেই হোক কোনো নিকট এবং দূরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা আণ্ডা
বাচ্চা নিয়ে তাঁর কাছে শীতের ছুটি বা গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাননি এমন ব
একটা হয়নি । তখন যতটুকু পেরেছেন যত্নআত্তি করেছেন তাঁদের । মাছ-মাং
তখন খুবই সস্তা ছিল । যদিও মাছ পাওয়া যেত না সব জায়গায় । দুধও সস
ছিল । টাটকা তরি-তরকারী । আত্মীয়রা এক-এক দলে দশ-বারোজন করে
আসতেন । বেশি ছাড়া কম নয় । পাহাড়-জঙ্গল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা । সকাে
বিকেলে দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়েছেন । খিদে হয়েছে খুব । কলকাতায় যা ন

। তার তিন গুণ খেয়েছেন তৃপ্তি করে । তৃপ্তি তারিণীবাবুও কম পাননি খাইয়ে । ‌। সব জায়গারই ভাল ছিল । বিকেলের মধ্যেই সব খাবার হজম হয়ে গেছে । ত আবার সবাই মজা করে খেয়েছেন ।

এইসব পুরনো কথা । স্মৃতি । ভাবতেই ভাল লাগে । যাঁরা যেতেন তাঁদের ধ্য অনেকেই আজ আর নেই । অনেকে আবার আছেনও । কিন্তু তারিণীবাবু ন হাত পুড়িয়ে স্টোভে সেদ্ধ ভাত চাপিয়ে একচড়া খান তখন একদিনও কেউই ধাননি তাঁর সেদ্ধ দেবার মতো তরকারীটুকু আছে কি নেই ? সংসারের এই ভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য অকৃতজ্ঞতা এবং কৃতঘ্ন তা তারিণীবাবুকে বড়ই ব্যথিত করে । ন যে এমন হয়, তা বুঝে উঠতে পারেন না । অবশ্য সবাই এক রকম, এ কথা লে মিথ্যা বলা হয় । তাঁর খোঁজ করে ছোটর ছোট মেয়ে মামণি । ভারী ভাল য়েটা । অথচ এই ছোট, ছোট বৌমা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যেই কিছুমাত্র বননি তিনি । মানে, সুযোগ পাননি । কিন্তু স্বভাবে মামণি একেবারেই মা-লক্ষ্মী । াশুনাতে ও গানেও খুবই ভাল সে । যে ঘরে যাবে সে ঘরই আলো করবে রূপে ণ সেবা যত্নে । স্কুলফাইন্যাল অবধি পড়েছে ও । তারপর আর পয়সার অভাবে া হয়নি । তিনটি বিষয়ে স্টার পেয়েছিল । স্কলারশিপও পেয়েছিল কিন্তু কলেজের াসিতা করার সামর্থ্য ছিল না । যাতায়াতের ভাড়া, টিফিন, বই, এসব জোগাবাব উই ছিল না । তারিণীবাবুর জ্বর হলে, মামণিই এসে সেবা-যত্ন করে । বার্লি ন দিয়ে আনে, থিন অ্যারারুট বিস্কুট । অথচ মামণির নিজের আর তার মায়ের দিন চলে কী করে তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন ।

কাঠের তক্তপোষের উপর তেলচিটে একটি পাতলা সতরঞ্চী । তারই উপরে রিণীবাবু পাশ ফিরে শুলেন । ঘামে গা জবজব্ করছিল দুপুর বেলায় । এখন ওয়াটা শুকিয়ে গিয়ে পাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মতো । ডালটনগঞ্জে বা চিপাদোহরে যেমন । কলকাতাটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেল । হাওয়াটা বেমক্কা উড়োচ্ছে কাতার ধুলোবালি । শরিকের বাড়ির পাঁউরুটির মোড়ক । পায়রার পালক । কের গু । ঈর্ষা আর মনস্তাপ । ঠিক এই রকম গরম হাওয়া বইতো মহুয়া- নন স্টেশানে । তিন মাস সেখানে পোস্টেড ছিলেন তিনি । ঝর্‌ঝর্ করে শুকনো পাতা ঝড়ের আর ঝরণার মতো বয়ে যেতো পাথরে মাটিতে । ভেসে আসত পাহাড় থেকে মহুয়া করৌঞ্জ আর আরও কত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ । সুন্দরী দিবাসী মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরে কল্‌কল্ করতে করতে চলে যেত । গিন্নী, রিণীবাবুর অপলক দৃষ্টি দেখে বলতেন, টিকিট তো ওদের কারোই চেক্ কর না । ল দেয় কী ওরা ?

তারিণীবাবু খুব জোরে হেসে উঠতেন । বলতেন ঃ ওগো, ওদের একটি হাসির ম কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর টিকিট পাওয়া যায় ।

তবে সে সময়ে এই দেশ তো আর এই পরিমাণ স্বাধীন হয়নি । কিছু কড়াকা
চক্ষুলজ্জাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা তখনও ছিল । টিকিট চাইতে হত নিশ্চয়ই কারো কা
কাছ থেকে । যারা ডেইলি-প্যাসেঞ্জার, তারা কলাটা, মুলোটা, একজোড়া ডিম, দূ
থেকে আনা লেবু বা নারকোল, কখনও বা হাঁসটা-মুরগীটাও দিয়ে যেত । হাসি ে
দিতই । উপরি ।

কোনোই খেদ নেই তারিণীবাবুর । এমনি অলস নিদ্রাহীন প্রহরে পুরনো সেস
দিনের কথা ভেবেই কখন যে দিন শেষ হয়ে আসে খেয়ালই থাকে না আর আজকাল

তারিণীবাবুর দুই ছেলে পরেশ আর সুরেশ মানুষ হয়েছে । কেউকেটা হয়েছে
সুখে আছে বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে । এর চেয়ে আনন্দর আর কী হতে পারে
ন'শরিকের ওখান থেকে পরেশের ঠিকানা চাইতে এয়েছিল । ঠিকানা, ফোন নাম্ব
সবই দিয়ে দিয়েছেন । পরেশের মেমসাহেব বৌ ছিলো । ফোটো পাঠায় ওরা বছ
বছর । নতুন নতুন বাড়ির ; গাড়ির । বাড়ি-গাড়ি পাল্টানোটা ওদের একটা ফ্যাশান
বৌও পাল্টায় আবার কেউ কেউ বছর বছর । শুনেছেন । পরেশ পাল্টেছে দুবার
এখন তৃতীয় বৌ । এই বৌ পাঞ্জাবী । তার বাপ সেদিন মারা গেল টেররিস্টে
গুলিতে অমৃতসরে । তারিণীবাবু একটি ফরেন-লেটার জোগাড় করে তাকে সান্ত্ব
দিয়ে চিঠি দিয়েছেন । কলকাতার নকশাল আন্দোলনের কথা লিখেছেন ।

ভুলো হঠাৎ ভুক্ ভুক্ করে ডেকে বাইরের ঘরে দৌড়ে গেল ।

কড়া নাড়লো কে যেন ।

এই অসময়ে মানে সাড়ে তিনটের সময়ে কে এলো ?

মামণি অবশ্য আসে মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে । তবে সে এলে, ভেতরে
দরজা দিয়েই এসে টোকা মারে । তাতেই অন্য শরিকেরা সকলে বলেন তারি
বুড়োর বাড়িখানা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যেই নাকি এতো ভালবাসার "শো" । মামণি
"শো" ।

বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়িটি তুলে দেখলেন সাড়ে তিনটে । কী করে সম
যায় ।

কড়াটা আবারও নাড়ল কেউ ।

ভুলো ভুক্ ভুক্ করে পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দু'পায়ে দরজ
খচ্‌খচ্ আওয়াজ করতে লাগল ।

লুঙিটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে তারিণীবাবু দেওয়ালে ঝুলিয়ে-রাখা গেঞ্জি
গলালেন পাঁজর-সার শরীরে । তারপর হাতঘড়িটা পরে খড়ম পায়ে গলিয়ে এগোলে
দরজা খোলার জন্যে । এগোতে গিয়েই আবার পেছিয়ে এসে দেওয়ালে ঝোলা
আয়নাতে চুলটা ঠিক করে নিলেন । টাকের উপর একত্রিশ গাছি চুল আছে এ
কুল্লে । এবং মাত্র একত্রিশ গাছি আছে বলেই ভারী মায়া পড়ে গেছে ওদের উপর

:নরো দিন আগেও ছিল তেত্রিশ গাছি । চিরুনিটা একবার বুলিয়ে নিলেন টাকের
পর সস্নেহে ।

আবার কড়া নাড়ল কে যেন । এবার অধৈর্য হাতে ।

দরজা খুলতেই তারিণীবাবু অবাক হলেন ।

বললেন, "এ কী ! হৈম দেবী যে ! এ অসময়ে ? কী সৌভাগ্য আমার । এ
র্ণ দীন বাসে ?"

হৈমপ্রভা তারিণীবাবুকে যাত্রার ডায়ালগে জল ঢেলে দিয়ে বললেন, "ভেতরে
সতে পারি কি ?"

"আসুন, আসুন । নিশ্চয়ই ।"

বলে, আপ্যায়ন করে তাঁকে নিয়ে দেড়খানি ঘরের আধখানিতে বসালেন । একটি
য়ারের ইজীচেয়ার । তাতে নীল-রঙা চাদর পাতা । সেখানেই তারিণীবাবুর বিশ্রাম ।
ধ্য একটি ছোট্ট টেবল, ল্যাজারার্স কোম্পানীর বানানো । ইটালিয়ান মার্বেল-এর
প্ । এই টেবলে তারিণীবাবুর বাবা-কাকারা তাস খেলতেন বসে । এখন তার
দিকে দুটি কাঁঠাল কাঠের চেয়ার । মেহগনির চেয়ারগুলো সব ন'বাবু নিয়ে
য়েছেন । শ্যাল্দার রথের মেলা থেকে কেনা এই কাঁঠাল কাঠের চেয়ার দুটি ।
ওয়ালে লাল কাপড়ের উপর নীল সুতো দিয়ে কাজ করা তারিণীবাবুর স্ত্রীর দুটি
চীকর্ম । "গড ইজ গুড" । এবং "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে ।" বিয়ের
র পরেই তোলা সুরেন বাঁড়ুজ্যে রোডের "বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড" ফোটোগ্রাফারের
াকানের একটি ফোটো । জোড়ে । বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের পাশেই ছিল হোয়াইটওয়ে
াণ্ড লাড়লোর দোকান । সে কী দোকান ! ইস্টার্ন রেল কোম্পানির বড় সাহেব
ই দোকান থেকে পাইপ আর টোব্যাকো কিনেছিলেন একদিন । বড় সাহেবের
.এ-র কাছ থেকে শুনেছিলেন তারিণীবাবু । দোকানময় শুধু লাল মুখ, সাঁতরাগাছির
লের মতো শরীর । গাঁক্-গাঁক্ করা ইংরিজি । ভয় লাগত রীতিমতো ।

"আপনার সঙ্গে কথা ছিলো ।"

হেমপ্রভা বললেন ।

"বলুন, হৈম দেবী ।"

"এই চিঠি কি আপনিই লিখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ ।"

"কত বড় সাহস আপনার ?"

"আজ্ঞে ?"

"আপনার সাহস তো কম নয় ।'

"আজ্ঞে, তা নয় । এক সেকেণ্ড ! চশমাটা নিয়ে আসি ? আপনাকে ভাল
র দেখতে পাচ্ছি না হৈম দেবী । আমার আবার বাইফোকাল তো । কাছে দূরে

কোনোটাই ভাল করে দে ...”

"আমি স্বয়ম্বর সভা করতে আসিনি তারিণীবাবু । অত ভাল করে আমা
না দেখলেও চলবে ।”

“আঁজ্ঞে !”

"দলিলটা কোথায় ?”

“কিসের দলিল হৈম দেবী ?”

"ন্যাকামি করবেন না । এই চিঠিতে জিষ্ণুকে আপনি যে দলিলের ক
লিখেছিলেন ।”

“ও । সে দলিল আছে ।”

“কোথায় ? এক্ষুণি আমাকে এনে দিন ।”

“আঁজ্ঞে, আমার কাছে মানে, আমার বন্ধু কাবুল মুখুজ্জের কাছে আছে ।

“তাঁর কাছে কেন ?”

“আঁজ্ঞে সেই যে আমার সলিসিটর ।”

হেসে ফেললেন হৈমপ্রভা ।

বললেন, “এত বড় এস্টেট আপনার ! সলিসিটর নইলে কি চলে ?”

“আঁজ্ঞে !”

কথার খোঁচাটা না বুঝেই বললেন, তারিণীবাবু ।

“দলিলটা আনিয়ে রাখবেন । আমি একটা দলিল নিয়ে আসব । সেটি
সই করে দেবেন । তারপর সলিসিটররাই করবেন যা করবার ।”

“বাড়িটা তাহলে আপনি কিনবেন ?”

“হ্যাঁ । কুড়ি হাজারই পাবেন । পুরো কুড়ি । একসঙ্গে অত টাকা কখ
দেখেছেন তারিণীবাবু ?”

“কুড়িতে তো আমি দেবো না ।”

তারিণীবাবু, নিজের গেঞ্জীর তলাটা ধরে টান মেরে বাড়তি সাহস সঞ্চয় ক
বললেন ।

“সে কি ? এতো বড় আশ্চর্য কথা ! সেদিন আপনিই না বললেন তারিণীব
যে, বাড়ি বিক্রি করা প্রয়োজন । প্রয়োজন শুধু আপনার পেন্‌শানকেই সাপ্লিমে
করার জন্যে ?”

“তাই তো ছেলো । মানে আইডিয়া তখন সেরকমই ছেলো । কিন্তু এব
বাড়তি প্রয়োজন জুটেছে । আমার মামণির বিয়ে দেওয়ার টাকা চাই ।”

“কে মামণি ?”

“সে আমার রূপে-গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী অথচ টাকার জন্যে মেয়ে
বিয়ে হচ্ছে না ।”

"অ। তা কত টাকা হলে আপনি বাড়িটা আমায় দেবেন ?"

"ঠিক করিনি। মামণির মায়ের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে হবে।"

"কবে জানতে পারব ?"

"কী কী ওঁর দেওয়ার ইচ্ছে। অমন মেয়েকে তো আর ন্যাংটোপোঁদে চেলি পরিয়ে বে' দেওয়া যায় না। মেয়ের মতো মেয়ে যে সে ! সাতটা দিন সময় দিন। ভেবে দেখি।"

তারিণীবাবু বললেন।

"দেবো।"

হৈমপ্রভা বললেন। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে।

"আপনি আমাকে চিঠি না লিখে জিষ্ণুকে চিঠি লিখেছিলেন কেন ?"

"ওকে মানুষ হিসেবে ভাল বলে মনে হয়েছিল, তাই।"

"আমি মানুষটা বুঝি খাবাপ ?"

"আমি তো তা বলিনি।"

"ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে যা আলোচনার তা শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই করবেন এবং জিষ্ণু যদি আপনার কাছে আসে তাহলে ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না যে আমি নিজে আপনার কাছে এসেছিলাম। এই চিঠিও আমি জিষ্ণুর ড্রয়ারেই রেখে দেব। যেখানে পেয়েছিলাম।"

"আপনি জিষ্ণুকে ভয় পান ?"

"আমি সকলকেই ভয় পাই তবিণীবাবু। আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমার অবস্থা আর আপনাব অবস্থায বিশেষ তফাৎ নেই। এ সংসাবে আপনজন বলতে আমার কেউই নেই, যাদের জন্য জীবনপাত করলাম তাবা আজ আমার কেউই নয়।"

"আমি আছি।"

তাবিণীবাবু হৈমপ্রভাকে আস্তে করে বললেন।

তাবপর বললেন, "এখানে সকলেরই একা-আসা একা-যাওযা। বুঝলেন হৈম দেবী। আগে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না। এখন সার বুঝেছি। সব সময়েই এই কথাটা মনে রাখা উচিত। দুঃখকে প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসে। কচুরীপানারই মতো। আপনি কুকুর পুষবেন ? আমার ভুলোরই বাচ্চা হয়েছে একটা। দেখবেন, নিজেকে আর একা মনে হবে না একটুও।"

"ভুলো কি মাদী কুকুর ?"

"না। ভুলো সহবাস করেছিল। তার ইস্তিরির নাম পেঁচি। রাস্তার উল্টোদিকের গারাজ ঘরের ছেঁড়া-খোঁড়া পাটের রাশির মধ্যে সে আঁতুড় করেছে। তবে কুকুর পুষলে সবসময়ই তা মালিকের অপোজিট সেক্স-এরই পুষতে হয়। তবে তারা আরো

বেশি ভালবাসে ।"

"তাই ? ভেবে দেখব । পুষলেও নেড়ী-কুত্তা পুষব কি না ভেবে দেখতে হবে ।"

"কুকুররা সবই এক । মেয়েদেরই মতো ।"

"কী বললেন ?"

"মানে, গায়ের রঙ, চুল, সাইজ, এমন কী .... । পেডিগ্রীতেই যা তফাৎ । নইলে সবাই একইরকম ।"

"আপনি বড় বাজে কথা বলেন ।"

"জল খাবেন হৈম দেবী ? বড় গরম বোধ হচ্ছে বোধহয় লোডশেডিং-এ । এ ঘরে তো পাখা নেই । ভুলো, হাত-পাখাটা ।"

বলতেই, ভুলো ভেতরের ঘরে গিয়ে হাত-পাখার ডাঁটাটা মুখে করে নিয়ে এলো । তারিণীবাবু চট করে পাখাটা তুলে হৈমপ্রভাকে হাওয়া করতে লাগলেন । উনি বললেন, "থাক থাক । আমি এখুনি যাব ।"

"যাবে তো সকলেই । এই তো পরশু বাঘাকে ইলেকট্রিক ফারনেসে ঢুকিয়ে এলাম । জর্জকে কবর দিলাম গত সোমবারে । এঞ্জিনড্রাইভার ছিলো । সেই কানাডিয়ান এঞ্জিন যখন প্রথম এলো ভারতবর্ষে তখন জর্জই প্রথম তা চালিয়ে ছিল । মনে হয়, এই তো সেদিন । যাবার কথা বলবেন না । মন খারাপ হয়ে যায় । সকলকে চলে যে যেতেই হবে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই ।"

"জল খাবেন একটু ?"

আবার বললেন তারিণীবাবু ।

"আমি জল ফুটিয়ে দুবার ফিলটার করে খাই । জণ্ডিস হবে না তো ! কত্তরকম ব্যাকটিরিয়া ! কোথাকার জল ?"

হৈম চিন্তিত গলায় বললেন ।

"ঐ তো ! রাস্তার ফুটপাথের । দেখাই যাচ্ছে । কোনো লুকোচাপা নেই । চমৎকার স্বাদ । পারগেটিভের কাজ করে । পায়খানা চমৎকার হয় ।"

"ইস ! আপনি বড় বাজে ভাষায় কথা বলেন ।"

"তাই ? মাপ করে দেবেন । জীবনে বিলাসিতা থাকলে তবেই না ভাষার বিলাসিতা থাকে । আপনি কি চা খাবেন ? চায়ের সময়ও তো হলো ।"

"কোত্থেকে আনবেন ?"

"কেন ? ঘণ্টের দোকান থেকে ।"

"ভালো স্টেইনার আছে ? কি চা ? টি-ব্যাগ কি ?"

"না, না কোনো ব্যাগ-ট্যাগ নয় । পুরোনো মোজা দিয়ে ছেঁকে দেয় । সে-চায়ের স্বাদই আলাদা ।"

এবারে হেমপ্রভার মুখটি শক্ত হয়ে এলো । বললেন, "আমি উঠছি এবারে । চায়ের ঝামেলা আর করবেন না আপনি । কিন্তু বলুন আমি তাহলে কবে আসবো আবার ?"

"বলেছি তো, সাতদিন পরে । দলিলটা আনিয়ে রাখি । আর মামণির মায়ের সঙ্গে একটু কথাও বলে নিই । কত খরচা তিনি করতে চান সেটা জানা দরকার । জানেন হৈম দেবী, আমার উপর কারো দাবী নেই যেমন, তেমন আমারও কারও উপরে কোনোরকম দাবী নেই । কেউ যদি কিছু দাবী করে এখন আমার কাছে, আমাকে আপন মনে করে ; ভারী ভালো লাগে । যতক্ষণ দাবীদারেরা থাকে ততক্ষণ উৎপাত বলে মনে হয় । আর যখন থাকে না, তখন নিজেকে বড় অদরকারী, অপ্রয়োজনীয় লাগে । অন্যর কাজে-লাগারই আর-এক নাম যে জীবন, তা রিটায়ার না করলে জানতেই পেতাম না বোধহয় ।"

কিছুক্ষণ হেমপ্রভা একদৃষ্টে অনবরত পাখার বাতাস করে-যাওয়া বৃদ্ধ তারিণীবাবুর মুখে চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি ।"

"আজ্ঞে । যাওয়া নেই আসুন । আর পরে যেদিন আসবেন ভাড়ার ব্যাপারটাও একটু বিবেচনা করে আসবেন । বাড়িটা বিক্রি, আমি না-ও করতে পারি ।"

আজকে একটা মিটিং ছিল অফিসেই। জিষ্ণুর কাছে সাতটাতে পার্টি এসেছিল রিজিওনাল ম্যানেজার ফ্রী হতে আরও দশ মিনিট লাগালেন। তার পর বললে ওল অফ আস আর টায়ার্ড টু আওয়ার বোনস। চলো, স্যাটারডে ক্লাব-এ যাই

ক্লাবে গিয়ে এক কোণায় বসে মিটিং হল। বলতে গেলে খালিপেটে অনেকগুলো হুইস্কী খেতে হল। কাজের সঙ্গে মদ খাওয়াটা আজকাল ফ্যাশান কে কত বেশি মদ খেতে পারে তা নিয়েও একটা বাহাদুরীর ব্যাপার থাকে। এ চাকরির সবই ভাল কিন্তু মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন খাতের অপচয় চো দেখা যায় না। হরির লুট চলে এখানে।

স্যাটারডে ক্লাব থেকে যখন বেরুলো তখন প্রায় সাড়ে নটা। আর এম এ চানচানী রয়ে গেলেন। আর. এম-এর মেজাজ খুব ভাল। এম. ডি. এসেছিলে এবং জিষ্ণুদের ব্রাঞ্চের খুবই প্রশংসা করে গেছেন। বলে গেছেন, "কীপ ইট আ ইয়াং বয়েজ, অ্যাণ্ড ডোণ্ট ওয়ারী, ইউ উইল বি ওয়েল লুক্‌ড-আফটার।"

"ইয়াং বয়েজ" বলে গেলেন বটে। তাঁর নিজের বয়েসই চল্লিশের বেশি হ না। আজকাল এই ট্রেণ্ড। আম্বানী, পারেখ, গোয়েঙ্কা, কল্, কানোড়িয়া এম অগণ্য মানুষ চল্লিশেব কম যাদের বয়স ; তারাই বিরাট বিরাট মালটিন্যাশনা কোম্পানির কর্ণধার। অনেকেই অবশ্য পৈতৃক সাম্রাজ্য পেয়েছেন, কিন্তু আজকে দিনের প্রেক্ষিতে ব্যবসা চালাবার যোগ্যতা না থাকলে তাঁরা ঐ আসন পেতেন পরিবার থেকেও। আর কিছু আছে মেধাবী, পুরোপুরি প্রফেশনাল ম্যানেজারস তারাই আস্তে আস্তে টেক-ওভার করে নেবে এই ম্যানেজারিয়াল পোস্টগুলো। যাদে ব্লক শেয়ার হোল্ডিং তারা গল্ফ খেলবে, হুইস্কী খাবে, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করবে তাদেরই হয়ে, দুধে-ভাতে-রাখা প্রফেশনালস্‌রা তাঁদের সাম্রাজ্য চালাবেন।

ক্লাব থেকে বাড়িতে এলো গাড়িতেই। পরীও অবশ্য অফিস থেকেই ট্রান্সপো পায়, যাতায়াতের। কিন্তু গাড়ি দিলেও নিতে পারেননি ঐ একই কারণে শ্যামবাজারের এই গলিতে আর থাকা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সাউথে যেতে হবে এখানে প্রত্যেকটি মানুষের জন্ম তারিখ, ঠিকুজি, বাবার নাম, ঠাকুর্দার নাম, পারিবারি

পটভূমি অন্যেরা জানে । কিন্তু নতুন-বড়লোক-হওয়াদের, অতীতকে গুলি-মারা মানুষদের ভীড় যেখানে, সেই প্রায়শই অতীত-লুকোনো বুদ্ধিজীবী দুর্বুদ্ধিজীবী নির্বুদ্ধিজীবীদের 'সাউথ'-এ একবার গিয়ে ভিড়ে গেলে নিজেই কিছুদিন পর নিজেকে আর চিনতে পারা যায় না । নিজেকে মনে হয় স্বয়ম্ভূ । আত্মীয়-পরিজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কথা তো বেমালুম ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করাও যায় । খোঁজ চলেছে । পরীও খোঁজ করছে । ও-ও ফ্ল্যাট কিনবে । কোম্পানি থেকে মোটা অ্যাডভান্স দেবে ! জিষ্ণুকেও দেবে । ফ্ল্যাট হাতে এলেই গাড়িটাও নিতে পারবে । তবে পরীর মাইনে জিষ্ণুর চেয়ে অনেকই বেশি । প্রায় হাজার আষ্টেক পায় পরী । ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস-এ পরীর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে ।

কিন্তু পুষি ?

পুষির চলে যাওয়াটা জিষ্ণুর ভবিষ্যৎ-এর সব পরিকল্পনাই গোলমাল করে দিয়ে গেছে । বড়ই নিশ্চেষ্ট লাগে । কাজ করতে হয়, করে । খেতে হয়, খায় । পড়াশুনো-টড়াশুনো সব মাথায় উঠেছে । লেখালেখিও তাই । রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম হয় না। বুকের ভেতরে যে এঞ্জিনটা ফুলস্পীডে টপ্-গিয়ারে চলতে আরম্ভ করেছিল সে যেন কোনো রাক্ষসের হাতের ছোঁওয়ায় হঠাৎই ফ্রিজ করে গেছে । মাঝপথে । আর কোনোদিন ওতে গুঞ্জরন উঠবে বলে মনে হয় না ।

পুষির মৃত্যুর পর পরী একেবারেই বদলে গেছে । পুষির সঙ্গে জিষ্ণুর আলাপ হবার পর তিনটে বছর যেমন মনমরা হয়েছিল পরী, তেমনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে আবার ফুলে-ফেঁপে, বর্ষার নদীর মতো । ওর ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার বড় অবাক করে জিষ্ণুকে । কী যে বলতে চায় ও, বোঝে না । যা বলতে চায় তা বোঝার কাছাকাছি এলেও অস্বস্তি বোধ করে ও । কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে । ওর নিজের খুড়তুতো বোন । শিশুকাল থেকেই একসঙ্গে বড় হয়েছে । প্রথম যৌবনে এরকম অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায় বলে শুনেছে, দেখেছে ; পড়েতোছেই । কিন্তু এই পরিণত যৌবনে ?

জিষ্ণু শুয়ে পড়েছিল খেয়েদেয়ে সেদিনের রাতে । পরী চান করে সুগন্ধী মেখে নাইটি পরে এসেছিল ওর ঘরে । দুটি গ্লাস এবং একটি রাম্-এর বোতল নিয়ে ।

বলেছিলো "তুমি ভালবাস, তাই ।"

নাইটির ভেতর দিয়ে এক অন্য পরীকে দেখেছিল জিষ্ণু । অচেনা, অভাবনীয়, অনাঘ্রাত ; রোমহর্ষক । অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে জিষ্ণু উঠে বসেছিল বিছানাতে । পেছন থেকে আলো পড়ায় পরীর হাল্কা সবুজ সিল্কের নাইটিটাকে স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল । মেয়েদের শরীরে অসীম রহস্য থাকে যা হয়তো কোনোদিনও পুরনো হয় না । প্রচণ্ড লোভ জেগেছিল এক মুহূর্তের জন্যে । তারপরই হুঁশ ফিরে এসেছিল ওর । বুঝেছিল যে, সে অনুভূতির নাম লোভ নয়, কাম । প্রথম রিপু ।

রাম্-এর গ্লাসে নীট রাম্ ঢেলে দিয়ে পরী উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলেছিল, "বাইরে অনেক চাঁদ। কলকাতা করপোরেশনের উচিত দশমী থেকে পূর্ণিমা অবধি শুক্লপক্ষে পথের সব আলো নিভিয়ে রাখা।"

জিষ্ণু বলেছিলো, "হ্যাঁ। তাহলে চোর-ডাকাত-রেপিস্ট্-মার্ডারারদের তো পোয়া-বারো।"

"ভালো দেখাতো কত্তো। কত্তো ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ হত শহরটা।"

বলেই, বাইরের বারান্দার দরজাটা পুরো খুলে দিয়েছিল। সত্যিই গানুবাবুদের বাড়ির গাছপালা চোঁয়ানো সবুজ জ্যোৎস্না এসে ভরে দিয়েছিল মার্বেলের বারান্দাটা। তারপরই চুঁইয়ে এসেছিলো ঘরে।

পুষি একদিন এই চাঁদের আলো ভরা বারান্দাতে বসে জিষ্ণুকে বলেছিল, বিয়ের পর সারারাত এই বারান্দাতে বসে থাকব।

পরী এসে বিছানাতে বসলো জিষ্ণুর পাশে। বাঁ হাতে রাম্-এর গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়েই ডান হাতটা জিষ্ণুর স্লিপিং স্যুটের বুক খোলা জামার মধ্যে গলিয়ে ওর বুকে হাত বোলাতে লাগলো।

ভেঙে পড়ছে ইমারত। ভেঙে পড়ছে ওর শৈশব-পালিত মূল্যবোধ। কলকাতার সব পুরনো বাড়ি ধবসে যাচ্ছে। চারিধারে খসে-যাওয়া পলেস্তারা, খুলে-নেওয়া সেগুন কাঠের কড়ি-বরগা, জানালা-দরজা। ধুলো উড়ছে চারদিকে, বালি। পুরোনো সবকিছু ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ধুলোবালিতে ভরে যাচ্ছে শহরটা। এ শহরের মানুষেরা। নতুন হয়ে যাচ্ছে জিষ্ণু আর পরীরা। নতুন হচ্ছে কলকাতা।

কিন্তু ভালো হচ্ছে কি ?

এক সময়ে জিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আরামে, বাধা দেওয়ার অপারগতার গ্লানিতে এবং শ্রান্তিতেও।

এমন ঘুম এর আগে কখনও ঘুমোযনি জিষ্ণু।

কখন পরী চলে গেছিল স্বপ্নে-আসা পরীরই মতো, তা জানে না জিষ্ণু।

হঠাৎই ওর ঘুম ভেঙে গেল এক তীব্র তীক্ষ্ণ অপরাধবোধে বিদ্ধ হয়ে। ছিঃ ছিঃ। ও কী মানুষ !

পরী বিড় বিড় করে কী একটা কথা বলছিলো বারবার। আমি তোমার বন্ধু। আমি তোমাকে বিয়ে করব। অ্যাণ্ড উই উইল লিভ মেরিলি, হিয়ারআফটার।

কী বলছো ! তুমি আমার বোন।

জিষ্ণু ঘোরের মধ্যে বলছিল গরম প্রশ্বাস ফেলে।

বাজে কথা। তুমি জানো না। উ্যা ডুস্রো।

কাকিমা ?

শ্ শ্ শ্ । ডোন্ট আটার দ্যাট নেম । শী ইজ আ বিচ্ ।

নিজের জন্মদাত্রী মাকে 'কুকুরী' বলে গালাগালি দেয় এ কেমন শিক্ষার রকম ? কী হল ? এত ভালো ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনো করে ?

কী যে ঘটে যাচ্ছে কিছুদিন হল এ-বাড়িতে, কলকাতায় ; কিছুই বুঝতে পারছে না জিষ্ণু । তারিণীবাবুর এই পৈতৃক বাড়ি অভিশপ্ত হয়ে গেছে । শুধুমাত্র এই কারণেই এ-বাড়ি জিষ্ণুর ছেড়ে যাওয়া দরকার । জ্বর জ্বর লাগছে জিষ্ণুর । যদি কাকিমা এসে ঢোকেন ঘরে ? যদি শুধোন, তোরা কী করছিলি ?

মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে আরেকটা ঘুমের ওষুধ টেনে নিলো জিষ্ণু । ট্রাপেক্স টু মিলিগ্রাম খায় ও পুষিকে ইলেকট্রিক ফারনেসে ঢুকিয়ে আসার রাতের পর থেকেই । একটা শোওয়ার আগেই খেয়েছিল । পরী এসে ঘুম ভাঙালো । আরেকটা খেতে হবে । কাল ন'টায় পৌঁছতে হবে অফিসে ।

একটা ভিসাস্-সার্কল্ হয়ে গেছে যেন পুরো জীবনটা । কোনো বৈচিত্র্য নেই । বন্ধু নেই । নির্মল আনন্দ নেই । অফিস বাড়ি-স্লিপিং ট্যাবলেট-ঘুম-অফিস-বাড়ি-পরী-অপরাধবোধ । তীব্র ছুরিকাঘাতের মতো তীক্ষ্ণ শারীরিক আনন্দ । অবসাদ । অপরাধবোধ । ঘুম থেকে জেগে-ওঠা । অফিস ।

বন্ধু যে নেই তার, সে দোষ তার একার নয় । বন্ধুদের দেবার মতো সময় জিষ্ণুর কোনোদিনও বেশি ছিল না । আর শুধুই প্রত্যয়হীন এবং গন্তব্যহীন রাজনীতি, খেলা ; সাহিত্য অথবা অশেষ পরচর্চায় দিন কাটাতে তার ভাল লাগতো না । ঐসব আড্ডা নিছকই বাঙালি-আড্ডা । তা থেকে শেখার কিছুই নেই । নিজেকে উন্নত করার কিছু নেই । বাড়ি বসে লিখেছে, পড়েছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে এবং তাতেই চিরদিন ও আনন্দ পেয়েছে । ও একা । চিরদিনের । একাকীত্বতে ও ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত আছে ।

কাছের বন্ধু বলতে একমাত্র ছিলো পিকলুই । একটা সময়ে পিকলু আর জিষ্ণু অভিন্নহৃদয় ছিলো । পিকলুকে ও ওর হৃদয়ের সব উষ্ণতাই নিংড়ে দিয়েছিল । বড়ই চোট পেয়েছে হৃদয়ের সবচেয়ে নরম জায়গাটাতে জিষ্ণু । গুলি লেগেছে হৃদয়ে । কিন্তু ঐ চোটের পর জায়গাটা পাথর হয়ে গেছে । আর সেখানে কোনো ঘাসও জন্মাবে না । বন্ধুত্ব কথাটাতেই ওর বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিয়েছি পিকলু । সেই তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকে মাতাল সুশোভনের ডায়ালগ ছিলো না ? "আই হ্যাড মাই মানি অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ড ঃ আই লেণ্ট মাই মানি টু মাই ফ্রেণ্ড । আই লস্ট মাই মানি অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ড ।"

এটা অনেকই আণ্ডার-স্টেটমেন্ট ! বন্ধু যখন তঞ্চক হয়ে ওঠে, তখন টাকার শোকটা শোকই নয়, তিলতিল করে গড়ে তোলা একটি জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তখন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় । বিশ্বাস নিজের বুকে একটুও না থাকলে কি কারো

প্রত্যেক নগ্না নারীই ? কোনো ধারণাই ছিল না । পূষিকেও কি এরকমই দেখাতো ? যদি দেখার সুযোগ পেতো ?

বারান্দা থেকে চুঁইয়ে-আসা চাঁদের আলোয় পরীর মসৃণ উষ্ণ শরীরের স্পর্শনে, স্পন্দনে জিষ্ণুর এ কদিনই মনে হয়েছে নিবিড় সহানুভূতি, পরম নির্ভরতা এবং অনভ্যস্ত উত্তেজনার মধ্যে যেন রঁদ্যার দুটি মূর্তি প্রাণ পেয়েছে হঠাৎ । জীবনের প্রথম নারী সংসর্গর বিবশতা কামানের গোলার আঘাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক । পরীর সঙ্গে ওর রঁদ্যার প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া একটুও উচিত হয়নি । প্রায়ই ভাবে জিষ্ণু ।

ক্ষেই এই অবিশ্বাসী পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব ? না । জিষ্ণুর পক্ষে অন্তত সম্ভব য় ।

পুষিটা যদি থাকত ! পরীর মধ্যে বড় জ্বালা, দহন, তীব্র ধার তার স্পর্শে । রালো ছুরির উষ্ণ স্পর্শে সে কেটে ফালা-ফালা করে জিষ্ণুর শরীর, চেতনা ; ব। পরীকে ও যদি না মারতে পারে তবে পরীই ওকে মেরে ফেলবে । শিগগির । রোগগ্রস্ত হয়েছে । বাড়ি ফিরে আসতে ভয় করে ওর । পরীর গলাব স্বর শুনলে য় করে ।

পরী যখন ছোট ছিল, জিষ্ণুও ছোটই ; কাকিমা ও হীরুকাকার সঙ্গে দেওঘরে ড়াতে গেছিলো একবার পুজোর সময়ে । নন্দন পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটা ড়িতে উঠেছিলো । কে জানে কাদের বাড়ি ? আজ মনে নেই আর ।

সকালের মিষ্টি মিষ্টি রোদে ওরা দু ভাই বোন নতুন জামা-জুতো পরে লাল ধুলো-াকরের কাঁচা পথে হাঁটতে যেতো গুটি-গুটি পাহাড়ের দিকে । একদিন পরী একটা ল আর হলুদ আর কালো গরম স্কার্ট পরেছিল । আর লাল ফ্ল্যানেলের ব্লাউজ । য়ে হলুদ মোজা আর কালো জুতো । কাকিমা খুবই শৌখিন ছিলেন । ওঁর সখের কলকে গাছটি ফুলফলন্ত হ'তো পরী আর জিষ্ণুর মাধ্যমে । দুজনে হাতে-হাত ধরে রা হাঁটছিল ।

পরী বলেছিল, "জিষ্ণু, তোমাকে খুব ভালো লাগে আমার ।"

জিষ্ণু বলেছিল, "আমারও খুব ভালো লাগে তোমাকে ।"

"বড় হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব ।"

"দূর পাগলি । তুমি তো আমাব বোন ।"

"তাতে কী হয় ! আমি তো মেয়ে । হবে না বিয়ে ?"

"পাগলি । তুমি একটা পাগলি পরী ।"

"পাগলিই হই আর যাইই হই। আমি তোমাকে বিয়ে করবই। দেখো তুমি।"

কলকাতার বাইরে কাজে না গেলে পরী আজকাল রোজই আসে । স্বপ্নের পরীরই তা । প্রথম রাত কেটে যায় স্বপ্নেরই মতো । আশ্চর্য হয়ে যায় একথা ভেবে ষ্ণু যে, কাকিমা কেন আসেন না এদিকে ? উনি কি জানেন ?

একজন সাইকিয়াট্রিস্ট খুবই দরকার জিষ্ণুর । কালই অফিস থেকে ডাঃ কিশলয় মার অথবা ডাঃ নন্দীকে ফোন করতে হবে । এক গভীর অপরাধবোধে সবসময়ই ষ্ট থাকে জিষ্ণু ! মুষড়ে থাকে মানসিকভাবে, শারীরিক আনন্দর মধ্যেও । পুষির ত্যুতেও ও এতোখানি মুষড়ে পড়েনি ।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুম ঘুম পেতে লাগলো জিষ্ণুর । ঘুমনো সহজ ছিল । জীবনে ও কখনও সম্পূর্ণ নগ্না কোনো নারীকে আগে দেখেনি । না। পরীর তো কারোকে তো নয়ই । তার বোন । কিন্তু এতো সুন্দরী ও জ্বালাময়ী হয় কি

জিষ্ণুদের অফিস শনিবার বন্ধ থাকে । ফাইভ-ডেইজ উইক । কিন্তু মাঝে মাঝেই শনিবারে শনিবারে ম্যানেজারিয়াল লেভেলের অফিসারদের মীটিং থাকে । যেতে হয় । লাঞ্চ অবধি মীটিং চলে । সেই সব দিনে দুপুরে বাড়ি এসেই লাঞ্চ খায় ।

আজ মীটিং-এর পর আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিলো না । কাকিমার ও পরীর খাওয়া হয়ে যায় এতোক্ষণে । পরীর অফিস শনিবারে পুরোই বন্ধ থাকে । মোক্ষদাদি ও শ্রীমন্তদা বসে থাকে ওর জন্যে । তবু বলাই আছে যে, শনিবারে একটা বেজে গেলে ও বাড়িতে খাবে না । ওয়ালডর্ফ-এ গিয়েই খেয়ে নিলো আজকে । তারপর পৌনে তিনটে নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে বেরোলো । আজ ও তারিণীবাবুর বাড়ি যাবেই বৃদ্ধর চিঠিটি ওর মধ্যে এক আলোড়ন এনেছিলো । বৃদ্ধর প্রতি এক ধরনের সমবেদন আর কাকিমার প্রতি এক ধরনের অসূয়ার জন্ম দিয়েছিলো সেই চিঠিটি ।

বাড়িটা আর বাড়ি নেই । পরীর ব্যবহার এবং চালচলনও দিনে দিনে বড়ই অদ্ভুত হয়ে উঠছে । তাছাড়া, ইদানিং না-বলে-কয়ে অসময়ে বাড়ি ফিরলে প্রায়ই দেখে হীরুকাকু আর কাকিমা কাকিমার ঘরে বসে গুজগুজ ফুসফুস করছেন ।

হীরুকাকু অনেকই করেছেন এক সময় । তাঁর অথবা কাকিমার কোনোরকম সমালোচনা করা জিষ্ণুর ইচ্ছা নয় । তাতে অধিকারও নেই । তবে এমন এমন সব ঘটনা ঘটতো না আগে । বদলে যাচ্ছে পুরোনো যা কিছু ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস যা দেখেনি, তাই দেখছে । ধাক্কা, তাই লাগে বৈকি ।

হীরুকাকু আর কাকিমা না থাকলে পিতৃমাতৃহীন জিষ্ণু হয়তো ভেসেই যেতো । কিন্তু বড় হয়ে ওঠার পর ও যেন ক্রমশই বুঝতে পারছে ওর তেমন আপনজন একজনও নেই । পুষির মধ্যে ও ওর হারানো এবং পুরোপুরিই ভুলে-যাওয়া মা এবং প্রেমিকাকে পেয়েছিলো । পুষির মা-বাবার কাছ থেকেও যে স্নেহ পেয়েছিলো ত বলার নয় । যার দাবীতে ওর সব জোর ছিলো ও-বাড়িতে সেই মানুষটিই চলে যাওয়াতে এখন সেখানে যেতে বড়ই লজ্জা করে ! মনে হয়, ধোঁকা দিয়ে ও ওঁদে ভালোবাসা এখনও চাইছে । যা চিরদিনের নয়, তা পেয়ে লাভই বা কি ? তাছাড়া

়া পেতে ওর আত্মসম্মানেও লাগে। পুষির ছোট বোন হাসি। মাঝে মাঝেই ফান করে, যেতে বলে। জিষ্ণুই যায় না। নতুন করে কোনো বাঁধনে পড়তে ায় না আর ও।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিলো। বহুদিন াগে একবার হীরুকাকুর সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটি তো পেয়েছে বেশ কদিনই হলো। ারিণীবাবুর এস. ও. এস.। তারিণীবাবুর কাছে ও অনেক আগেই আসতো। কিন্তু ত্যন্ত রহস্যজনকভাবে চিঠিটি ওর লেখা-পড়ার টেবলের ডানদিকের ড্রয়ার থেকে ারিয়ে গেছিলো।

কোনো ড্রয়ারেই, এমনকি আলমারিতেও চাবি দেওয়া অভ্যেস নেই ওর। চাবি িলে মনে হয় শ্রীমন্তদা আর মোক্ষদাদিকে অপমান করা হচ্ছে। না দিয়ে দিয়ে, াবি দেওয়ার অভ্যাসই চলে গেছে। চিঠিটা আবার হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিলো গত ধবার। হয়তো ভুলোমনের কারণে ও নিজেই অসাবধানে রেখেছিলো বা অন্য াগজপত্রর সঙ্গে মিশে গেছিলো।

ট্যাক্সিটা মোড়েই ছাড়লো। কারণ, যাদের অবস্থা ভালো নয় তাদের বাড়ির ামনে গাড়ি বা ট্যাক্সিতে গিয়ে পৌঁছতে বাধো বাধো ঠেকে, লজ্জা করে। মনে য়, বড়লোকি দেখানো হচ্ছে।

মোড়টা ঘুরতেই চোখে পড়লো একটি বড় স্টেশনারী দোকান। ভাবলো, ঐ াকানে ঠিকানাটা বলে একবার ডিরেকসানটা জিজ্ঞেস করে নেবে। পথের ল্টোদিক থেকে একটি মেয়ে হেঁটে আসছিলো। অতি সাধারণ একটি তাঁতের শাড়ি রা। মুখে-চোখে স্বাচ্ছল্যর অভাব ফুটে রয়েছে, কিন্তু তার চলা, চোখ-চাওয়া, াড়ি পড়ার সভ্য ভঙ্গীটির মধ্যে থেকে এমন একটি শালীন সম্ভ্রান্ততা উপছে পড়ছে য, যার চোখ আছে তার ভুল হবার কথা নয় যে সে মেয়ে অসাধারণ।

অসাধারণত্ব থাকতে পারে বংশ-পরিচয়ে, কৌলীন্যে এবং স্বাচ্ছল্যে। এবং রিদ্র্যেও। অসাধারণত্বর কারণটা ঘনিষ্ঠ হলেই তবে জানা যায় কিন্তু অসাধারণত্ব মনই এক জিনিস যা লুকিয়ে রাখা যায় না। পাঁচশো মানুষের মধ্যে থাকলেও তা কাশিত হয়ে পড়েই।

মেয়েটি একবার জিষ্ণুর দিকে চাইলো। ছাই-রঙা একটি বিজনেস-স্যুট পরেছিল ষ্ণু। সঙ্গে লাল-কালো টাই। লাঞ্চ খাওয়ার সময় টাইয়ের নটটা খুলে গলার াতামটাও খুলে দিয়েছিলো, এখন মনে হলো, না খুললে পারতো। মনে হতেই, িজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ফেললো মনে মনে।

মেয়েটিও ঐ দোকানেই ঢুকেছে। সে ঢোকার তিরিশ সেকেণ্ড পর গিয়ে ঢুকলো ষ্ণু।

"কী দেব ?"

দোকানী বললেন ।

"কিছু না । তারিণীবাবু, মানে তারিণী চক্রবর্তী কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?" এই ঠিকানা ।

দোকানী হাসলেন ।

বললেন, "ভালো সময়েই শুধোলেন । এই যে এঁদের বাড়িতেই থাকেন তারিণীবাবু । ওঁর জ্যাঠামশাই হন সম্পর্কে ।"

মেয়েটি মিষ্টি প্রতিবাদ করে উঠলো । বললো, "এ কী অন্যায় কথা । জ্যাঠামণি আমাদের বাড়িতে থাকতে যাবেন কোন দুঃখে ? উনি নিজের বাড়িতেই থাকেন আমরা থাকি সে বাড়িরই এক অংশে ।"

তারপরই জিষ্ণুকে বললো, "আপনার খুব তাড়া নেই তো ? একটি জিনিস নিয়ে আমি যাচ্ছি । আমার সঙ্গে চলুন । একেবারে জ্যাঠামণির হাতেই সমর্পণ করে দেবো আপনাকে ।"

বৃদ্ধ দোকানী খুব রসিক । হেসে বললেন, "দয়া করে তাই কোরো মামণি ভদ্রলোকের যা চেহারা—ছবি মাঝপথেই না ছেনতাই করে নেয় অন্যে ।"

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করলো । তারপরই মুখ তুলে হাসলো । জিষ্ণু দেখলো, হাসলে, গালে টোল পড়ে তার ।

মেয়েটি বৃদ্ধ দোকানীকে বললো, "রবিকাকা, অচেনা ভালো মানুষের পেছনে লাগার স্বভাব কবে যাবে তোমার বলোতো ?"

"স্বভাব কি যায় মামণি ? স্বভাব যায় না ম'লে । তাছাড়া তুমি এতো তাড়াতাড়ি মানুষকে ভালো বলে ঠাহর করে ফেল নাকি ? বাঃ । তবে কথাটাতো শুধু অচেনা ওকেই বলিনি মা ! চেনা তোমাকেও বলা । তাছাড়া অচেনা চেনা হতে কতক্ষণ লাগে বলো তো ? চিনতে যদি কাউকে চায়ই কেউ ?"

"জানি না ।"

মেয়েটি বললো ।

লজ্জা পেয়ে, অপ্রতিভ মুখ নামিয়ে ।

তারপর বললো, "কই ? দিয়েছো ?"

"এই নাও ।" বলেই ঠোঙাটা এগিয়ে দিলেন ।

ঠোঙায় কী ছিলো তা বোঝা গেল না ।

দোকানী রবিবাবু বললেন, "তাহলে লিখেই রাখছি । দাদাকে ..."

বলেই, জিষ্ণুর দিকে তাকিয়েই থেমে গেলেন ।

মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে গিয়েই আবার স্বাভাবিক চাঁপা-রঙা হয়ে গেলো ।

কৃতজ্ঞতা-মাখা গলায় বললো, "যাচ্ছি তবে রবিকাকা ।"

“এসো মামণি। যাওয়া নেই।”

পথে বেরিয়ে মেয়েটি বললো, “আপনি আমার জ্যাঠামণিকে চেনেন ?”

“হুঁ।”

“কীভাবে ? ধার আদায় করতে এসেছেন বুঝি। কালকে এক কাবুলিওয়ালা এসেছিলো।”

“তাই ?”

হেসে বললো জিষ্ণু।

“আমার কথার উত্তর দিলেন না যে।”

“কোন্ কথার ?”

“ধার আদায় করতে এসেছেন কি না ?”

“ও। ঐ, একরকমের তাই বলতে পারেন।”

কালো হয়ে গেলো মুখ, মেয়েটির।

কষ্ট হলো জিষ্ণুর, রসিকতাটি করেছে বলে।

মেয়েটি বললো, “আমার জ্যাঠামণি ভারী ভালো মানুষ, ভারী সরল। আপনি কতটুকু জানেন ওঁর সম্বন্ধে ?”

অনেকখানিই। তবে সব নিশ্চয়ই নয়। সব জানলে আপনার কথাও জানতাম।

মেয়েটি কথা না বলে হাঁটতে লাগলো। জিষ্ণু দেখলো, তার চটির একটি পাটির, যেখানে বুড়ো আঙুল ঢোকে ; সেখানটা ছিঁড়ে গেছে। একটি রাবার-ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা রয়েছে জায়গাটি।

“আপনার জ্যাঠামণির ধার আমার কাছে নয়। আমি অধমর্ণ। ধার শোধ করতে এসেছি।”

মেয়েটি চমকে উঠে পূর্ণ দৃষ্টিতে জিষ্ণুর মুখে চাইলো, মুখ ঘুরিয়ে। গলির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বিকেলবেলার নরম আলো এসে তার মুখে পড়েছিলো। ভারী ভালো লেগে গেলো জিষ্ণুর। সেই মুখখানিকে। পুষিকেও ভালো লেগেছিলো, কিন্তু আস্তে আস্তে। একে ভালো লেগে গেল প্রথম দেখাতেই। ঠিক এমন অনুভূতি ওর আগে হয়নি কখনও। নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক, হঠকারী অপরিণামদর্শী মনকে খুব করে বকে দিলো মনে মনে জিষ্ণু।

“ঠাট্টা করছেন আপনি ?”

অবিশ্বাসী গলায় মেয়েটি বললো।

“না। চলুন তারিণীবাবুর কাছে। তখনই জানবেন।”

“এই মোড়ে বাঁদিকে গেলেই আমাদের বাড়ি ? আমি জ্যাঠামণির অংশটুকু দেখিয়ে চলে যাব। আপনারা কাজের কথা বলুন ! আজ আমার মায়ের জন্মদিন। আমার মামা আসবেন। দাদা আসবেন অফিস থেকে। সামান্য একটু ব্যস্ত থাকতে

হবে রান্নাঘরে ।"

"আমাকে আপনি নেমন্তন্ন করবেন না ?"

"আপনি বড় ছেলেমানুষ । হয়তো ভালোমানুষও । বয়স কত আপনার ?"

"আপনার চেয়ে মনে হয় ন-দশ বছরের বড়ই হবো ।"

"মনে হয় না তো কথা শুনে । আরেকটা হতে পারে । আপনি সরল । আমাব জ্যাঠামণিরই মতো । নইলে জ্যাঠামণির কাছেও অধমর্ণ হন ! হাসিরই ব্যাপার ।"

মেয়েটি চলে গেলো তারিণীবাবুর অংশতে ঢোকার জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে

জিষ্ণু গিয়ে বেল দিতেই ভেতর থেকে একটি কুকুর সিংহবিক্রমে তেড়ে এলো তারপর বন্ধ দরজায় দু পা দিয়ে খচর্-মচর্ শব্দ করতে লাগলো । তারিণীবাবু এসে দরজা খুললেন । একটি খাকি ফুলপ্যান্ট, ইস্ত্রিবিহীন এবং অন্য কারো ব্যবহার কবে দিয়ে- দেওয়া সাদা রঙের একটি বিঢপ সাইজের টেনিস খেলার গেঞ্জি এবং ডান পায়ে, কড়ে আঙুলের কাছে ছেঁড়া একটি লালচে কেডস পরে দরজা খুললেন । ব পাটা খালি ছিল।

কালো শীর্ণ কুকুরটা লাফাতে লাফাতে ডাকতে লাগলো ।

"কে ? আমি তো ঠিক চিনতে পারলাম না । একটু দাঁড়ান । চশমাটা । এই ভুলো ! চশমা !"

মুহূর্তের মধ্যে ভুলো নামক কুকুরটি ডাঁটি কামড়ে চশমাটা নিয়ে এলো ভেতব থেকে ।

চশমাটা পরে, ভালো করে দেখে তারিণীবাবু বিপদগ্রস্ত মুখে বললেন, "অ্যাঃ খেয়েছে ! চশমা পরেও যে চিনতে পারলুম না । আপনি কে স্যার?"

জিষ্ণু বললো, "আমি জিষ্ণু । আপনার ভাড়াটে ।"

"ওঃ । জিষ্ণু । এসো এসো বাবা । কী চমৎকার চেহারা করেছো । আমি যখন রিটায়ার করি তখন আমাদের ডেপুটি ডিভিশনাল ম্যানেজার ছিলেন চ্যাটার্জি সাহেব । ঠিক তাঁর মতো চেহারা । উনি একদিন রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার হবেন আমাকে বলে গেছিলেন গুহ সাহেব । এস. আর. গুহ । দিল্লীর ডিরেক্টর অফ ওয়াগন এক্সচেঞ্জ আর রেলওয়ে কনফারেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলেন গুহ সাহেব । তুমিও খুব উন্নতি করবে । তোমার চেহারাই বলছে । দেখে নিও আমার কথা ফলে কী না !"

"বসবো ?"

"আরে দ্যাখো ! বসবে বসবে বইকি । নিশ্চয়ই বসবে । কিন্তু এ ঘরে তো পাখা নেই বাবা । তুমি তো এমনিতেই ঘেমে গেছো । তা চলো ভিতরের ঘরেই গিয়ে বসি । তক্তপোষে বসতে পারবে তো ?"

"কেন পারবো না ?"

"তোমার স্যুটটা আমার ঘামেভেজা শতরঞ্চিতে নষ্ট হয়ে যাবে। ঘেমে তেলচিটে হয়ে রয়েছে। তবু চলো, চলো, ভেতরেই চলো বাবা।"

জিষ্ণু গিয়ে বসলো। তারিণীবাবু পাশে বসলেন। ভুলো মেঝেতে শুয়ে পড়লো ওদের দিকে মুখটা করে নিজের সামনের দু থাবার মধ্যে রেখে।

জিষ্ণু বললো, "জুতোটা পরে ফেলুন বাঁ পায়ে।"

"ও হ্যাঁ। পরবো'খন। কিছু তো করার নেই। বিকেলে একটু বেরিয়ে আসি। ফেরার সময় হাফ-পাউণ্ড একটা রুটি কিনে নিয়ে আসি। আমার আর ভুলোর রাতের খাওয়া। তবে আজ আমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন আছে।"

"তাই ? কোথায় ?"

"এই এ বাড়িতেই।"

"ও।"

"তুমি জীবনে খুব উন্নতি করবে তা কী করে বললাম বলতো ?"

"কী করে ?"

"তোমার ঠোঁট দুটি দেখে। দৃঢ় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস ফুটে আছে তোমার ঠোঁটে, চোয়ালে। আমাকে একজন খুব বড় জ্যোতিষী চিনিয়ে দিয়েছিলেন। অনিল চাটুজ্যে মশায়। তিনি বেঁচে থাকলে তোমার ঠিকুজিটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতাম তাঁর কাছে।"

এইটুকু বলেই বৃদ্ধ ক্লান্ত হয়ে বাঁ পাটি কষ্ট করে ডান পায়ের উপরে তুলে মোজা পরতে লাগলেন। মোজা পরতে পরতেই বললেন, "দাঁড়াও। জুতোটা পরে তোমার জন্যে একটু চা নিয়ে আসি। আমিও খাইনি। ঐ একেবারে বিকেলে বেরিয়ে ঘণ্টের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিই এই কাপ।"

জিষ্ণু 'না' করলো না। কেন যে করলো না তা ও বুঝলো না। জিষ্ণু ভাবছিলো, যে মানুষ অমন করে চিঠি লেখেন তিনি এতক্ষণ পরেও নিজের প্রয়োজনের কথা একবারও উচ্চারণ করলেন না।

তারিণীবাবু ভাঁড়ে করে চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট এনে দিলেন জিষ্ণুকে।

জিষ্ণু যখন চা খাচ্ছে তখন উনি বললেন, "তুমি কেন এসেছো বাবা তা তো বললে না!"

জিষ্ণু অবাক হয়ে গেলো। বৃদ্ধর স্মৃতিশক্তির গোলমাল হয়েছে বিলক্ষণ।

"বাঃ। আপনি চিঠি লেখেন নি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তোমার মা তো এসেছিলেন ; থুড়ি তোমার কাকিমা, তোমাকে লেখা চিঠিখানি নিয়ে। বলে গেলেন, সাতদিন পর আবার আসবেন। আমিও দলিলটা ইতিমধ্যে নিয়ে আসব। তবে বাড়ির দাম আমি বলতে পারিনি। আমার নাতনির বিয়ের খরচটা এই বাড়ি বিক্রির টাকা থেকেই আমায় জোগাড় করতে হবে।

এটা নতুন ডেভালাপমেণ্ট । বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে বলছি না ।"

বলেই বললেন, "আই যাঃ । তোমার কাকিমা যে তাঁর আসার কথা তোমাকে বলতে মানা করেছিলেন । আমি যে বলে ফেললাম !"

জিষ্ণুর বুকের মধ্যে কাকিমার কারণে বড় রাগ ও দুঃখও হচ্ছিলো । এই বৃদ্ধকে সামান্য কটি টাকার জন্যে এতদিন উপবাসে রেখেছেন তিনি । তার উপর জিষ্ণুকে লেখা চিঠি নিয়ে ওঁকে ঠকিয়ে বাড়িটি পর্যন্ত কিনে নিতে চান কাকিমা ! সম্ভবত পরীকেও না জানিয়ে । ওঁর কিসের এতো লোভ ? নিরাপত্তার অভাববোধ কেন এতো ? কাকিমাকে তো ছেলেবেলা থেকেই সে মায়ের মতোই দেখে এসেছে । তব কেন ?

জিষ্ণু বললো, "মনে করুন আপনি আমাকে বলেননি। আমিও ওঁকে জানাবে না।"

"তাই ? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী হওয়া থেকে বাঁচাবে তো ? মুখ রেখো বাবা তোমাকে বলা আমার উচিত হয়নি । বুড়ো হয়েছি । সব কথা মনে থাকে না ।"

তারপর বললেন, "তোমার কাকিমার কথা তো আমি শুনেছিই । তুমি কি নতুন কিছু বলবে ?"

"হ্যাঁ । কিন্তু আমি যা বলব এবং করব তা কিন্তু সত্যি সত্যি, কাকিমার কাছে গোপন রাখতে হবে । না রাখতে পারলে, আপনার নয়, আমারই অসম্ভব ক্ষতি হয়ে যাবে ।"

"না, বাবা না । তুমি ছেলেমানুষ । চমৎকার মানুষ । তোমার ক্ষতি হবে এমন কিছু আমি করতে পারবো না । আমার ক্ষতি হলে হোক ।"

জিষ্ণু কোটের বুক পকেট থেকে পার্স বের করে এক হাজার টাকা দিলে তারিণীবাবুকে । দশটি একশো টাকার নোট ।

"এ কী ! এ কী বাবা ! এতো টাকা ? কেন ?"

বলেই বললেন, "ঐ দ্যাখো, ঐ ব্যাটা ভুলোর চোখও লোভে চকচক করছে টাকা বড় স্বস্তির বাবা, কিন্তু বেশি টাকা আচমকা এলে স্বস্তির বদলে আক্রমণ হয়ে ওঠে । আবুল বাশার, তরুণ সাহিত্যিক বলেছিলেন । কাগজে পড়েছিলাম । বা ভালো বলেছিলেন হে কথাটা । লাখ কথার এক কথা ।"

"এই টাকা জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস অবধি পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া । দুশো টাকা করে মাসে । আপনি একশো টাকা করে চেয়েছিলেন । মানে, বাড়তি ভাড়া আপাতত জানুয়ারি থেকে দুশো করে বাড়ালাম । জুন থেকে তিনশো করে বাড়াবো ।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তো মোটে একশোর কথাই বলেছিলাম তোমার কাকিমাকে।"

"সে তো কাকিমার সঙ্গে আপনার কথা। এও তো ন্যায্য নয়! তবে পরে আরো অনেক বাড়াবো। যাতে ন্যায্য হয়।"

"কেন বাড়াবে বাবা? এখন কলকাতার সব ভাড়া-বাড়িই তো ভাড়াটেদের হয়ে গেছে। ভাড়াটেরাই তো আসল মালিক। আমি তো তবু পুরুষমানুষ। ভাড়াটে হলেই যে গরীব হবে তেমন কোন কথা নেই। ভাড়াটেদের যেমন অসুবিধে থাকে, বাড়িওয়ালাদেরও থাকে বাবা। কত বিধবার সংসার চলে না, মেয়ের বিয়ে হয় না আর ভাড়াটেরা ভাড়া-বাড়িতে থেকেই ফ্ল্যাট কিনে সে ফ্ল্যাট চার হাজার পাঁচ হাজারে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। পাঁচ-ছটি কেস তো আমি নিজেই জানি। যেখানে অবস্থা নেই, সত্যিই অন্যত্র থাকার জায়গা নেই; সেখানে অন্য কথা! কিন্তু তা তো নয়! তারা রেণ্ট-কণ্ট্রোলে ভাড়া জমা দিয়ে দেয়। নিঃসহায় মানুষকে বলে, মামলা করতে। এক বছর দু বছরের ভাড়ার টাকায় পুরো বাড়ি কিনে নিতে চায়।"

"কাকাবাবু।"

জিষ্ণু বললো।

"হ্যাঁ বাবা? তুমি আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকলে? আমি তো তাগাদা-দেওয়া বাড়িওয়ালাই শুধু। আমাকে অনেক সম্মান দিলে বাবা।"

"বলছিলাম, আইনের কথা আমি বলছি না। ন্যায়-অন্যায়, বিবেকের কথা বলছিলাম।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। রসিদ বইটা আবার কোথায় ফেললাম।"

"রসিদ লাগবে না কাকাবাবু।"

"সে কী? এর মানে আইনে আবার অন্য কিছু বলবে না তো?"

"আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আইনের নয়।"

"তবে? সম্পর্কটা বে-আইনী বলছো?"

জিষ্ণু হেসে ফেললো। বললো, "ধরুন তাই-ই।"

একটু চুপ করে থেকে জিষ্ণু বললো, "আরেকটা কথা।"

"কী" তারিণীবাবু বললেন।

"কাকিমা বাড়ি কিনতে এলে আপনি বলে দেবেন যে, বাড়ি বিক্রি করবেন না লেই আপনি মনস্থ করেছেন।"

"তাহলে আমার মামণির বিয়ে আমি দেব কী করে?"

"অনেক বেশি দাম দেবে এমন ক্রেতা আমিই ঠিক করে দেবো। টাকাটা কি ব শিগগিরই দরকার? বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে?"

"আরে, না না বাবা। চেষ্টা-চরিত্তির চলছে। গরীবের মেয়েকে আর কে এই পাড়ো বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে আসবে বলো? টাকা যার নেই তার তো কিছুই নই।"

"কেমন ছেলে খুঁজছেন আপনারা ?"

"আরে আমাদের আবার চাওয়া-চাওয়ি । আজকাল লোকে হয় বড়লোকের মেয়ে চায় ; নয় চাকুরে মেয়ে চায় । সোজা কথা । আরে আমি তো আর তার জন্যে তোমার মতো রূপেগুণে রাজপুত্র খুঁজছি না । মোটামুটি ছেলে । তবে হ্যাঁ । অনেস্ট । যে যাই বলুক, ইন দ্যা লঙ রান অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি । তোমার কাকিমাকে বলে এসেছিলাম সেদিন । ডিসঅনেস্টি করেই ছেলেদের কেউকেটা করেছিলাম আমি । আর দ্যাখো, আজকে সেই তারাই বুড়ো বাপের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে । বড়টা শেষ যেবার এসেছিলো, আমাকে বলে গেলো ঃ "বুড়ো, একটা ম্যাটাডর ভ্যান কিনে দিচ্ছি, চালিয়ে খাও ; খেটে খাও । বিদেশে কোনো বাপই ছেলের দয়ায় বাঁচে না ।"

কথাটা শুনে জিষ্ণুর দুঃখও হলো আবার হাসিও পেলো । কোনো ছেলে নিজের বাবাকে এমন করে বলতে পারে যে, এ কথা ভেবেই ।

"আরে বাবা, বিদেশে কোনো ছেলেও কি বুড়ো বয়স অবধি বাপের হোটেলে খায় ? না কোনো ছেলের কেরিয়ার বাবারা চুরি-ডাকাতি করে, কী পেটে না খেয়ে গড়ে দেয় বলো ? অনেক ভেবে-টেবেই ডিসাইড করেছি আমার মামণির জন্যে আমি ডিস-অনেস্ট ছেলে চাই না ।"

"দেখবো আমি । আপনার মনোমতো ছেলেই দেখব । এই যে রইলো আমার কার্ড । অফিসের ঠিকানাতেই একটু যোগাযোগ করবেন ।"

"আমার আজকাল হাত কেঁপে যায় । আমি শিবুকেই বলব । মানে মামণির দাদা । তুমি যদি সাক্ষাৎ দেখতে চাও তো মামণিকে এখুনি ডেকে আনছি একবার ।"

"না, না কাকাবাবু । আমি তো আর পাত্র নই । মিছিমিছি বেচারীকে এমবারাস করে লাভ নেই ।"

"যা ভালো বোঝো বাবা ।"

"আমি তবে উঠি আজকে । প্রতি মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেবো। আর মাসে যে টাকা, কাকিমা শ্রীমন্তদাকে দিয়ে পাঠান তা তো উনি পাঠাবেনই।"

তারিণীবাবু গলির মোড় অবধি পৌঁছে দিলেন জিষ্ণুকে । সঙ্গে ভুলো । জিষ্ণু ভুলোর জন্যে এক প্যাকেট বিস্কিট কিনে দিলো । ভুলো লেজ নাড়িয়ে বিদায় দিলে ওকে ।

গলির মোড়ে যখন এসে একটা ট্যাক্সি খোঁজার জন্যে দাঁড়ালো তখন একাধিক কারণে ওর মনটা বড় খুশি খুশি লাগতে লাগলো । বড় অনাবিল খুশি । অনেক অনেকদিন এতো খুশি হয়নি ও পুষির মৃত্যুর পর ।

বাড়ি পৌঁছে চান করে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো। পরী ট্যুরে গেছে ব্যাঙ্গালোরে আজ। কাল রাতে ওকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়ে বলেছিলো "ভালো ছেলে হয়ে থাকবে। এবারে ফিরে এসে রেজিস্ট্রেশান করব আমরা তারপর চলে যাব ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস্-এর ফ্ল্যাটে।"

"কাকিমা ?"

"স্টপ ইট। ও নাম তুমি মুখে আনবে না।"

আজকে খাওয়ার একটু আগেই ট্রাপেক্স টু মিলিগ্রামের দুটি ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিলো। রোজই রাত একটা দুটো অবধি জেগে থাকার কারণে আর অপরাধ-বোধে ঘুম হয় না কদিন। চোখের কোণে কালি পড়েছে। অথচ দেরী করে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে সকাল নটা-দশটা অবধি ঘোর থাকে। রিফ্লেক্স ঢিলে হয়ে থাকে। কলকাতার সব মানুষই কি ঘুমের ওষুধ খায় ? অনেককেই কেমন ঘোরাচ্ছন্ন, নেশাগ্রস্ত দেখে লাঞ্চ অবধি। কে জানে ! এরা সবাই বোধহয় ঘোরের মধ্যে হাঁটে, ঘোরের মধ্যে মিছিল করে ; স্লোগান দেয়, বেঁচে থাকে।

দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো জিষ্ণু। মামণির মুখটা ভেসে উঠলো একবার চোখের সামনে। তারপর পুষির মুখ। পুষি হাসছিলো, মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে।

পুষি ....

গভীর ঘুম এখন জিষ্ণুর। গভীর ঘুম।

নাসিরুদ্দিন বললে, "আপনাকে বলেছিলাম স্যার থ্রী-টু বোর না নিয়ে থ্রী-এইট নিন।"

"থ্রী-এইট বোরের পিস্তলগুলো প্রহিবিটেড বোর। গুলি পাবো কোত্থেকে।" জিষ্ণু বলেছিলো।

নাসিরুদ্দিন হাসলো।

বললো, "নকশালরা কোত্থেকে পাচ্ছিলো স্যার ? পাঞ্জাবে কী করে পাচ্ছে ? দার্জিলিং-এ ? পাওয়ার ইচ্ছে থাকলেই পাওয়া যায়। "গুলি, কুড়ি রাউণ্ড দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে। যথেষ্ট। ভাড়া নেবেন ? না কিনবেন ? যদি আমার নাম বলে দ্যান তাহলে আপনার ফেমিলির কেউ আর আস্ত থাকবে না স্যার।"

"ভাড়া কত ?"

জিষ্ণু বললো।

"প্রাইভেট ট্যাক্সির চেয়ে একটু বেশি। দিনে পাঁচশ।"

"গুলি ?"

"গুলি পঁচিশ টাকা করে রাউণ্ড।"

"গুলিও কি ভাড়া ?"

"হ্যাঁ । ফেরত দিলে টাকা ফেরত দেবো । খরচা হলে ঐ গচ্চা ।"

"দাও ।"

খালপাড়ের মিনিবাসের টার্মিনালে তখন ভিড় কমে এসেছে । কোমরের সঙ্গে বাঁধা আছে বেল্টে জিনিসটা । মোড়ের কাছে চা আর ওমলেট আর মাটন রোল-এর দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে আছে জিষ্ণু জিনিসটা পাওয়ার পর থেকেই । যাকে খুঁজছে, তাকে কিন্তু পাচ্ছে না । গল্প করেছে ও নানা ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর ও ক্লিনারদের সঙ্গে । এ একটা অন্য জগৎ । অন্য পরিবেশ ।

"ভোৎকা কোন গাড়ি চালাচ্ছে রে এখন ? মিনিই চালাচ্ছে তো ?"

একজন কণ্ডাক্টর শুধোলো অন্যকে ।

"আর কি চালাবে ?"

"ওর মালিকের তো পাঁচখানা গাড়ি । তবে সবই মিনি । ম্যাক্সি একটাও নেই তারই মধ্যে চালাচ্ছে কোনো একটা । তবে এসে পড়বে এক্ষুনি । ওর সাঁটুলি এসে একবার খোঁজ করে গেছে ইতিমধ্যেই । গরজ জোর ।"

"তুই জানিস যে ও জামিন পেয়েছে ?"

"কব্বে ! কোন্ ড্রাইভারের কী হবে র‍্যা ? সব কেস ফিট করা আছে সব জায়গাতে ।"

"ফুলরেণু গুহকে যে চাপা দিয়েছে সে ঠিক শ্বশুরবাড়ি যাবে ।"

"ঐ । শ'য়ে একজনের কপাল খারাপ থাকে । যারা চাপা পড়ে তারা সকলেই তো আর ফুলরেণু গুহ নয় যে কংগ্রেস, সি পি এম দুজনেরই দরদ উথলে উঠবে । হেঁদি-পেঁচিদের জন্যে কোন্ শালা কী করে র‍্যা ?"

"সেই মেয়েটা, যেটা স্কুটারের পেছনে বসেছিলো, তার বোধহয় সোর্স আছে ভালো ।"

"কী করে বুঝলি ?"

"একটা টিকটিকি মাইরি রোজই একসময় আসছিলো । বোধহয় ডি. ডির লোক হবে । হারামিকে দিন কয় দেখছি না ।"

"চিনতে পারলে বলিস তো ! বাঞ্চোতের টেংরি খুলে নেবো । লাশ ফেলে দেবো খালে ।"

"কেসটার কী হবে ?"

"আরে কী আর হবে ? তারিখ পড়বে । যা হয় ।"

"তারপর ?"

"তারপর আবার তারিখ পড়বে ।"

"তারপর ?"

"তাপ্পর আবারও তারিখ পড়বে ।"

"তাপ্পর আবার ।"

"মেয়ের জন্যে, বৌয়ের জন্যে ভালোবাসা কার কদ্দিন থাকে রে শালা বাঙালি জাতের ? সোডার বোতলের জাত শালারা ! বারো ঘণ্টা যদি মরার পর তোকে মনে রাখে কেউ, তবে জানলি বাঞ্চোত কিছু করলি লাইফে ।"

"উরিঃ শালা । চার হাজার পঁয়ত্রিশ কী করম ঝিং-চ্যাক্ লাইট লাগিয়েছে দ্যাখ্ । ঐ যে আসছে গুরু ।"

জিষ্ণুর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো । গায়ে জ্বর । মিনিটা এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার বললো, "বেসি দুধ, বেসি চিনি দিয়ে চা দেতো নেপো ভালো করে এক গ্লাস । আর শোন । একটা মোগলাইও । জলদি দিবিরে শ্লা ।"

বলেই, ড্রাইভিং সিট থেকে নামলো । গাড়িটা লাগানোর সময়েই একজন লাঠি-হাতে বৃদ্ধ চাপা পড়ছিলেন প্রায় মিনির তলাতে ।

অকথ্য খিস্তি করলো তাকে ড্রাইভার । বললো, এই যে ঘাটের মড়া ! এখুনি তো ইলেক্টিরি ফারনেসে যেতে হতো ।"

মিনির ড্রাইভারটাকে দেখতে যে-কোনো অন্য মানুষেরই মতো । রোগা-পট্কা । বাজারের ফলওয়ালা কী মাছওয়ালা কী চানাচুরের দোকানী বা তাদের সামনে পায়জামা-শার্ট পরে থলে হাতে দাঁড়ানো যে-কোনো স্বল্পবিত্তি খদ্দেরেরই মতো । তফাৎ-এর মধ্যে তার ডান হাতে সর্দারজির মতো একটি স্টেইনলেস স্টিলের বালা । লোকটার চোখ দুটো দেখে মনে হয় লোকটা প্রচণ্ড ধূর্ত । পৃথিবীকে ডোন্টকেয়ার ভাব তার মুখে-চোখে ।

ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে পিঠের ঘাম শুকুলো সে জামাটা একটু তুলে ধরে হাওয়া লাগিয়ে ।

বললো, "কী বে নেপো ? কেউ আমার খোঁজ করেছিলো ?"

পাশের ড্রাইভারটি বললো, "তোমার সাঁটুলি দু-দুবার ঘুরে গেছে গুরু ।"

"এ কী মাইরী । ছোকরাদের সামনে একটু রেসপেক্ট দিয়ে কথা কইতে পারিস না । তোরা না, মাইরী ! তা, কখন আসবে বলেছে আবার !"

"বলেছে আসবে না । নাগ করেছে নাগুনী । উল্টোদিকে বসে থাকবে । তুমি চা খেয়ে লিয়েই সাঁকো পেরিয়ে চলে যাও । হাতেগরম পেরেম পাবে ।"

"লেহ্শালা । তা আগে বলবি তো মাইরী ! তালে অত জম্পেস করে চা-ফা খেতাম না ।"

"চা-টা খেয়ে মোগলাইটা নিয়ে যাও । দুজনে পেরেমের সঙ্গে ভাগ করে নিও ।"

"তোমার কেসের কী হলো গুরু ? ঐ স্কুটারের মেয়েটার !"

"সে তো সঙ্গেই চলে গেছে। ক্লীন। ভোৎকা লাইফে কাউকে কখনও ভোগলা দেয়নি।"

"তা নয় হলো, কিন্তু পুলিশ কেস তো করেছে। সে কেসের কী হবে ?"

"সে থানার মক্কেল, আর মোটর ভেহিকেলস আর ইনসিওরেন্স কোম্পানী বুঝবে। আমার গায়ে হাত দেয় কোন্ শালা ? গায়ে হাত দেওয়ার জন্যে বুঝি মালিক মাস মাইনে করে এতো লোক রেখেছে ?"

"তোমার মালিককে তো দেখিই না আজকাল। মেলা রেলা হয়েছে, না ? শুনছি, দশখান্য প্রাইভেট খাটাচ্ছে ?"

"আমিও শুনেছি। আজ তো তার আসবার কথা। শ্বশুরবাড়িতে বিয়ে তাই তিনটে বাস উইথড্র করতে হবে। এখানে এসেই বলে যাবে। এলো বলে। এও শুনছি যে আগামীবার এম. এল. এর জন্যে দাঁড়াবে ইলিকশানে।"

"তা'লে তো মাল প্রচুর জমেছে র‍্যা !"

"মাল তো জমেছেই। তাছাড়া ইলিক্শানে দাঁড়ালে গাড়ি ধরতে পারবে না ইলিক্শান ডিউটির জন্যে ! ঐ সময়ে গাড়ি কম থাকায় ভাড়াও বেড়ে যায় অনেক। এক ঢিলে দুই পাখি।"

জিষ্ণুর সব অঙ্ক গুলিয়ে গেলো। মালিক ? না কর্মচারী। কাকে দেবে দাওয়াই ? তারপরই ঠিক করলো, না, এখানে ব্যতিক্রম। মালিক নয়, কর্মচারী। যে পুষির মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে তাকেই দেবে দাওয়াই। লেট দেয়ার বী অ্যান এগজাম্পল

ভোৎকা চা আর মোগলাই খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন করে হিন্দি গান গাইতে গাইতে হঠাৎ পিছন ফিরে বললো, "আরে নেপো। কাল গাড়ির চাকা ভালো করে ধোয়াবি। হেস্টিংস-এর ফাঁকা রাস্তায় এক শালা ট্যালা মাল নিচে চলে এলো। চাকায় রক্ত লেগেছে। প্যাসেঞ্জাররা বুঝতেই পারেনি।"

একজন বলেছিলো, "কী দাদা ?"

বলে দিলুম কুকুর। পথও অন্ধকার ছেলো। গড ইজ গুড বুয়েছিস শালা আমরা এই বাঙালিরা সেন্টিমেন্টেই মল্লুম !

ভোৎকা এবারে এগোচ্ছে তার সাঁটুলির দিকে। জিষ্ণুও উঠে পড়ে এগোচ্ছে এখন খালের সাঁকো পেরচ্ছে ভোৎকা। বড় বড় গাছ এখানে, জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, নির্জন, শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। ধারে কাছে কেউ নেই। জায়গাটা খুবই নির্জন। কলকাতা বলে মনে হয় না। জিষ্ণু গিয়ে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে বললো, "দাদা আগুন হবে !"

ভোৎকা ঘুরে দাঁড়ালো জিষ্ণুর এক হাতের মধ্যে। দেশলাইটা বাড়িয়ে দিতে গেলো আর জিষ্ণু কককরা পিস্তলটা কোমর থেকে খুলে নিয়েই গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম

করে পর পর তিনবার গুলি করলো ।

"ওরে বাবা !"

বলেই, ভোৎকা মাটিতে পড়ে গেলো ।

জিষ্ণুর রাগটা তখন মরেনি, বরং ঝড়ের পাখির ডানা সাপটানোর মতো প্রবলতর হয়ে ফিরে এসেছে । পুষির মুখ । ইলেকট্রিক ফারনেসের লালিমা । আঁচ । সব ফিরে এসেছে জিষ্ণুর মস্তিষ্কে ।

আরও দুটো গুলি করলো জিষ্ণু ।

পালিয়ে যাবে বলে ও আসেনি । ধরা পড়ার ভয়ে ও ভীত ছিল না । ওকে কাঠগড়ায় যখন দাঁড় করানো হবে তখন মাননীয় বিচারপতিরা ভোৎকাকে না তাকে, কাকে বড় খুনী বলে রায় দেন তা দেখার ইচ্ছা আছে ওর । জজ সাহেবদেরও বিবেকের পরীক্ষা হবে । আইনের কেতাব জিতবে ? না জজ সাহেবদের মানসিকতা ? জানতে চায় জিষ্ণু ।

"দাদাবাবু ! দাদাবাবু ! কী হয়েছে তোমার জল খান । জল ।"

শ্রীমন্তদা জিষ্ণুকে খাটের উপর উঠিয়ে বসলো । বললো, "বোবায় ধরেছে তোমাকে । বুকে হাত দিয়ে শুতে মানা করি এতোবার ।"

জিষ্ণুর মনে হলো, শুধু ওকেই নয় । বোবায় ধরবে কলকাতার সব মানুষদেরই । বুকে হাত দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে যারা সকলে ।

"জল খাও । বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল দাও ।"

জিষ্ণু বাথরুমে গিয়ে মাথায় থেবড়ে থেবড়ে জল দিতে দিতে ভাবছিলো, এই স্বপ্নটা যদি সত্য হতো ওর জীবনে, হয়তো মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন অন্তত কিছুটা সার্থক হতো । কুকুরের মতো লাথি খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলে না ।

"কাকিমা কোথায় ?"

"ঘরে ।"

"হীরুকাকা এসেছিলেন । খেয়ে গেছেন ?"

"খেয়েছেন । তবে যেতে পারেননি । শরীরটা খারাপ । রয়ে গেছেন মায়ের ঘরে । কম্পাউণ্ডারবাবু এসেছিলেন ।"

"কে ? গোদা কম্পাউণ্ডার ?"

"হ্যাঁ ।"

"পরী ?"

"সে তো ব্যাঙ্গালোরে গেছে ?"

"ও । তাইতো ! মনে ছিলো না ।"

"এখন কটা বাজে ?"

"আড়াইটে ।"

"নাও, এবারে শুয়ে পড়তো দেখি ।"

স্বপ্নটাও ভেঙে গেলো । এখন দুঃস্বপ্ন ; জেগে থেকে ।

হাত বাড়িয়ে আরেকটা স্লীপিং পিল খেলো জিষ্ণু ।

কাকিমার ঘরে হীরুকাকা রাত কাটাচ্ছেন ? নাঃ । তারিণীবাবুর কাছে আবার কালই যাবে জিষ্ণু । বাড়িটা সত্যিই অভিশপ্ত হয়ে গেছে । কী যেন নাম মেয়েটির ? আশীর্বাদী ফুলের মতো মেয়েটির ? মামণি ?

জেনিভা থেকে টেলেক্স এসেছে যে জিষ্ণুদের কোম্পানীর প্রডাক্টের সবচেয়ে বড় ইমপোর্টারের রিপ্রেজেনটিটিভ ভারতে আসছেন। প্রথমে বম্বেতে হেড অফিসে আসবেন। সেখান থেকে এম. ডি-র সঙ্গে যাবেন কম্পানীর সব কটি ব্রাঞ্চেই। ঐ ইমপোর্টারই ওদের এক্সপোর্ট বিজনেসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট। তাই অফিসে একেবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

বম্বে পৌঁছেই মিস্টার শরবেঙ্কো, সুইস্-ফ্রেঞ্চ; গোয়াতে যাবেন এম. ডি-র সঙ্গে উইক এণ্ড কাটাতে। সেখান থেকে যাবেন দিল্লী। সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা হয়ে ম্যাড্রাস। কলকাতায় থাকবেন না। তিনি তাজ গ্রুপের হোটেল ছাড়া থাকবেন না। আর কলকাতার তাজ বেঙ্গল তো এখনও খোলেনি। তাই ম্যাড্রাস থেকে আবার ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে সেদিনই বম্বে হয়ে ফিরে যাবেন জিনিভা। তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে।

চানচানি জিষ্ণুর ঘরে এসেছিলো এক কাপ কফি খেতে। কফি খেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বললো, "যাই বলো, জিষ্ণু আপ্তে কিন্তু বম্বে থেকেই একটি প্যাঁচ মারবার চেষ্টায় আছে।"

"কীসের প্যাঁচ?"

"ঠিক ব্যাপারটা কী তা জানতে পারলে তো হয়েই যেতো! বাট আই অ্যাম এপ্রিহেণ্ডিং সামথিং। ও গুগলি বোলার। ওয়াংখেড় স্টেডিয়ামে খেলতো ক্রিকেট। লোকাল টীম-এর হয়ে। ওর বল খেলবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না। ওর সঙ্গে যারা খেলতো তারাই বলেছে।"

জিষ্ণু হেসে বললো, "সেই কবে শেষ ক্রিকেট খেলেছি। চাকরি করতে এসেও প্রতি মুহূর্ত এমন উইকেট গার্ড করে থাকা আমার পোষাবে না।"

"না-পোষালে চাকরিও থাকবে না। শুধু চাকরির বেলাতেই বা কেন? মৃত্যুদিন পর্যন্ত উইকেট গার্ড করে প্যাড ও হেলমেট পরেই বেঁচে থাকতে হবে। আজকের জীবনে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একমুহূর্ত ওফফ্-গার্ড হওয়া মানেই আউট্ হয়ে যাওয়া। হয় খেলো, নয় খেলতে এসো না। কিন্তু খেলতে যদি আসো তাহলে এমন না করলে মাথা নিচু করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেই হবে। ইনবীটুইন কোনো

ব্যাপার নেই ।"

বলেই, হঠাৎ উঠে পড়ে পাইপ থেকে ছাই অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলেই বললো "চলি । এক্সপেক্টিং আ কল্ ফ্রম কাশবেকার ফ্রম ব্যাঙ্গালোর ।"

"ম্যানিলা যাচ্ছো নাকি ? কন্‌ফারেন্সে ?"

জিষ্ণু শুধোলো ।

"আমি তো ভাবছি এবারে তোমাকেই পাঠাতে বলবো ।"

দুটি হাত দুদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ট্রাভেলিং । রিয়্যালি টায়ার্ড ।"

"ম্যানিলাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই ।"

জিষ্ণু বললো ।

"তবে কি ব্যাংককে ?"

জিষ্ণু হেসে ফেললো । বললো, "না । আমি এবার কন্টিনেন্টে যেতে চাই স্টেটস আর ইংল্যাণ্ড তো অনেকবারই গেলাম ! নর্ডিক কান্ট্রিজ হলেও মন্দ হয় না ।"

"ডান্ । আই উইল্ পুট আ ওয়ার্ড টু কাশবেকার ।"

চান্‌চানি বললো ।

জিষ্ণু হেসে বললো, "থ্যাঙ্ক উ্য ।"

চান্‌চানি চলে গেলে, ইন্টারকম্-এ ওর সেক্রেটারী পিপিকে ডাকলো একটা নোট ডিক্‌টেট্ করার জন্যে । পিপি এসে ঢোকামাত্র বেয়ারা এসে একটি ভিজিটিং স্লিপ দিলো । বিরক্ত মুখে স্লিপটা তুলে দেখলো জিষ্ণু । বাংলাতে লেখা আছে : "পিকলু ফাঁকা হলে ডাকিস । আমার কোনো তাড়া নেই ।"

বিরক্তিটা আরও বাড়লো জিষ্ণুর । বেয়ারাকে বললো, "ভিজিটার্স রুমমে বৈঠাও সাহাবকো ।"

বেয়ারা চলে গেলে পিপিকে বললো, "ডিক্‌টেশানটা নেওয়া হয়ে গেলে এই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেবেন । পাঠাবার আগে বলে দেবেন যে, আমরা সবাই জিনিভার পার্টির আসার ব্যাপারে কীরকম ব্যস্ত আছি । পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবো না । প্লীজ ট্রাই টু ইমপ্রেস হিম এবাউট দিস । কেন যে আসবার আগে একবার ফোন করেও আসে না, বুঝি না । সবাইকেই এরা নিজেদের মতো ভ্যাগাবণ্ড বলে মনে করে ।"

পিপি জানে যে, পিকলু জিষ্ণুর বন্ধু । জানে বলেই অভিব্যক্তিহীন মুখে জিষ্ণুর মুখে চেয়ে বললো, "ইয়েস স্যার ।"

"হোয়াট ড্যু উ্য মীন বাই ইয়েস স্যার ?"

"আই উইল টেল হিম প্রিসাইস্‌লি হোয়াট উ্য ওয়ান্টেড মী টু টেল হিম ।

"গিভ হিম দ্যা মেসেজ ওনলি ; দ্যা হিন্ট । আই ডোন্ট ওয়ান্ট উ্য টু রীপিট ভার্বাটিম হোয়াট আই টোল্ড উ্য ।"

"ইয়েস স্যার । আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ।"

পিঁপি ডিক্‌টেশান নিয়ে চলে যাবার পরই পিকলু এসে ঢুকলো ।

পিকলুর মুখের দিকে চাইলো জিষ্ণু । ফারস্ট-ইয়ারে পড়া পিকলুর মুখটা মনে াড়ে গেলো । নীল টুইলের ফুল হাতা গুটোনো শার্ট আর ধুতি পরা কালো ছিপছিপে পিকলু যেন দাঁড়িয়ে আছে বইখাতা হাতে কলেজের গেটে জিষ্ণুরই অপেক্ষায় । জিষ্ণু ্লে তারপর ঢুকবে একসঙ্গে ।

কত্ত ভালোবাসা, কত্ত গল্প, কত্ত কল্পনা, কত্ত সাহিত্যালোচনা, নাটক সিনেমার ালোচনা ছিলো সেইসব দিনে । বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' দেখে কী তুমুল ত্তেজিত হয়েছিলো দুজনে । ফিল্ম ঃ "লা দোলসে ভিতা !" "টু ডাই উইথ আ ্যাঙ্গ অ্যাণ্ড নট উইথ আ হুইম্পার ।"

তখন দুজনে দুজনকে একদিনও না দেখে থাকতে পারতো না । না দেখা হলে ফোনে কথা অবশ্যই হতো । একাধিক বন্ধুরা বলতো, তোরা কি হোমো-সেক্সুয়াল ?

হাসতো জিষ্ণু । শব্দটি শুনলেই গা-ঘিনঘিন করতো ।

আজ জীবনের এবং জীবিকার বিভিন্নমুখী চোরাস্রোত দুজনকে কতখানিই না ালাদা করে দিয়েছে । পরিবেশ, রুচি, পরিচিতের পরিধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রা ানেকই পাল্টে গেছে দুজনেরই । একদিন যে তারা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলো সে কথা পিপিরই মতো কেউই আর বিশ্বাস করবে না । বিশ্বাস করবে না হয়তো ওরা ্জেরাও । মানুষ, নদীস্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোরই মতো অসহায় । এক অনুষঙ্গ ্ড়ে তাকে অতি দ্রুত অন্য অনুষঙ্গে ছুটে যেতে হয় । পিকলু অবশ্য অ্যাডভান্‌টেজই ্য়ে গেছে জিষ্ণুর কাছ থেকে সব রকমের । কিন্তু নিয়েও জিষ্ণুকে তার 'ইনার্‌ র্কল' বের করে দিয়েছে পিকলু নিজে এবং তার বৃত্তর অন্য মানুষেরাও । "আ ান ইজ নোন বাই দ্যা কম্পানী হী কীপস্‌ ।" ওরা দুজনে দুরকম হয়ে গেছে । জীবনে বোধহয় একে অন্যর সার্কল্‌-এ আর ঢুকতে পারবে না ।

জিষ্ণুর একমাত্র দোষ ও বড় চাকরি করে । ওকে বড়ই ব্যস্ত থাকতে হয় । ্ট করার মতো সময় ওর একেবারেই নেই । সত্যিই নেই । জীবনের যে-সময়টা ক্যরিয়ার তৈরি করবার, পরিশ্রম করবার ; সেই সময়টুকুতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে বং করছে । বারো ঘণ্টা কাজ করেছে । পিকলুর চোখে এই সবই জিষ্ণুর দোষ ।

পিকলুর মতো সুখী, সাধারণ, গায়ে-হাওয়া-লাগিয়ে-বেড়ানো বন্ধুরা সকলেই ্কে একে ত্যাগ করে গেছে জিষ্ণুকে । আস্তে আস্তে । প্রথমদিকে মনে হতো ক ভেঙে যাবে । তারপর সয়ে গেছে আস্তে আস্তে । সময়াভাবে, কিছুটা অভিমানে বং দুঃখেও আর ফিরে ডাকেনি তাদের । বিপরীতমুখী স্রোতে ভেসে গেছে ওরা ্রে ধীরে ।

উষ্ণতা তবুও ছিল। কিছু ছিলো। উষ্ণতা সবসময়ই যে নৈকট্য-নির্ভর হবে এমন কোনো কথা নেই। এ-কথা অল্প কয়েকবছর আগে অবধি ওরা দেখা হলেই বুঝেছে। উষ্ণতা সহজে মরে না। তাপ থেকে যায় অনেকদিনই, একবার সঞ্চারিত হলে। কিন্তু আজ সেইটুকু উষ্ণতাও আর নেই। পিকলুর শেষ তঞ্চকতার পর জিষ্ণু এই পুরোনো সম্পর্কটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে নিজে বিবেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ সম্পর্ককে গলা টিপে মারতে কতখানি যে কষ্ট পেয়েছিলো তা জিষ্ণুই জানে। কিন্তু যা থাকার নয়, তাকে না রাখাই ভালো। যে সম্পর্কর মধ্যে সত্য নেই, আন্তরিকতা নেই; তা তো নেই-ই। আর যা নেই, তা আছে বলে মনে করে আনন্দিত হবারও কিছু নেই। যথেষ্ট বয়স হয়েছে জিষ্ণুর। একটা মিথ্যা এবং দুষ্ট সম্পর্ককে খুন করতে ও এখন আর অপারগ নয়। ফালতু সেন্টিমেন্ট রাখে না ও আর কারো জন্যই। সে পিকলুই হোক আর যেই হোক। শুধু পরীকে নিয়ে কী করবে সেটাই ঠিক করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু যদিও জিষ্ণু ভেবেছিলো পিকলুকে তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে পেরেছে, কিন্তু পিকলু ঘরে ঢুকতেই তার মুখের দিকে চেয়েই ওর বুকের মধ্যেটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। ও জানতো না যে পুরোনো সম্পর্কর শিকড় বটের শিকড়ের মতোই বুকের বড় গভীরে গিয়ে বাসা বাঁধে চুপিসাড়ে।

আন্তরিকভাবে বললো, "কী রে! ভালো আছিস?"

"ভালোই তো আছি। নাথিং টু কমপ্লেইন বাউট্।"

"খুসি কেমন আছে? আর তোর কন্যা?"

"তুই কেমন আছিস বল?"

কথা ঘুরিয়ে পিকলু বললো।

"আমি? ভালোই।"

"দাড়ি কামাসনি কেন?"

জিষ্ণু শুধোলো।

"এমনিই। ভাবছি রাখব।"

"চা খাবি?"

"নাঃ। তুই খুব ব্যস্ত শুনলাম। এমনিতে তো ব্যস্ত থাকিসই। জানি। আমি উঠি এবারে।"

"তাহলে এসেছিলি কেন?"

"জাস্ট এমনিই তোকে অনেকদিন দেখিনি। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম দেখে যাই তোকে।"

বলেই, জিষ্ণুকে আর কিছুই বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে দাঁড়ালো পিকলু বললো, "চলি রে।"

বলে, সত্যি সত্যিই চলে গেলো ।

পিকলু চলে যেতেই, মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেলো জিষ্ণুর । ব্যস্ত ছিলো ঠিকই তবে এমন কিছু ব্যস্ত ছিলো না যে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গেও দুটো কথা বলা যায় না । চাকরিতে অনেকই সুবিধে বিশেষ করে মার্কেন্টাইল ফার্মের চাকরিতে । ডাক্তার বা উকিল বা সলিসিটর হলেও না হয় কথা ছিলো । মক্কেলদের গোপন কথা থাকে । নিজস্ব পেশায় খাটুনি অনেক বেশি । চাকরি, সে যে-কোনো চাকরিই হোক না কেন, তাতে বন্ধুকেও দিতে না-পারার মতো সময়ের অভাব কোনোদিনই হয় না । 'কনফারেন্স' 'মীটিং' ইত্যাদি গাল-ভরা শব্দ অপারেটর বা সেক্রেটারীকে দিয়ে অন্যকে বলিয়ে নিজের ইম্পর্ট্যান্স বাড়িয়েও সহজে আড্ডা মারা যায় । প্রাইভেট সেকটরের অফিসারেরা যতখানি ব্যস্ত থাকেন বলে ভাব দেখান, ততখানি আদৌ থাকেন না যে, তা জিষ্ণু নিজেও জানে ।

কী যেন নাম ছিলো পাহাড়টার ? ডিগারিয়া ? মনে পড়েছে । একবার দেওঘরে গেছিলো বিকাশ আর পিকলুর সঙ্গে । এই দেওঘরেই গেছিলো অনেক ছেলেবেলায় প্রথমবার পরী আর কাকিমাব সঙ্গে ।

এপ্রিল বা মে মাসে গেছিলো ওরা । তিন বন্ধু । বিকাশদের বাড়ি ছিলো নন্দন পাহাড়ের রাস্তাতে । মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ি । নানারকম ছোট বড় ফুলের গাছ ছিলো । পাশের বাড়িতে দুটি অল্পবয়সী মেয়ে বেড়াতে এসেছিলো তাদের দাদু দিদিমার কাছে । তাও মনে আছে । সন্ধ্যাবেলা সে-বাড়িতে গান-টান হতো । পিকলুর গানের গলা ছিলো ভারী সুন্দর । আর জিষ্ণু যেরকম লাজুক ছিলো ঠিক তার উল্টো । যে-কোনো মানসিক স্তরের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গেই ও পাঁচ মিনিটে ঘনিষ্ঠ হতে পারতো ।

ডিগারিয়া পাহাড়ে গেছিলো, দেওঘর শহরের দোকান থেকে দুটো সাইকেল ভাড়া করে । সাইকেল ভাড়া করেছিলো বড়লোকের ছেলে বিকাশও । কিন্তু জিষ্ণুরা গিয়ে পৌঁছবার পর পেছনে তাকিয়ে অনেক দূরে ওরা দেখলো যে একটি টাঙার উপরে সেই ভাড়া-করা সাইকেলটিকে উঠিয়ে জমিদারী পোজ-এ হাতের উপর থুতনি রেখে ঝমঝুমি-বাজানো দুল্‌কিচালে নাচতে নাচতে আসা টাঙাতে চড়ে বিকাশ আসছে ।

খুব ঘূর্ণি হাওয়া ছিলো সেদিন । পথের লাল ধুলো আর শুকনো পাতা উড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় দশ মিটার মতো উঁচু এক স্তম্ভর সৃষ্টি করেছিলো ঘূর্ণি হাওয়াটা । পিকলু আর জিষ্ণু দুই কলকাতার ছেলে অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলো ।

একবার বর্ষাকালে দেওঘরে যাবার অনেকদিন পরে তোপচাঁচীতে গেছিলো ওরা । তখন জিষ্ণু পড়াশুনো শেষ করে চাকরিতে সবে ঢুকেছে, পিকলুও একটি স্কুলে পড়ায় অন্য একজনের বদলীতে । ধানবাদ শহরের কাছেই তোপচাঁচী । ঝরিয়া ওয়াটারবোর্ডের বাংলোতে ছিলো । বিরাট বিরাট ঘরওয়ালা বাংলো, তোপচাঁচী হ্রদের কাছেই । পিকলু গান গাইতো গলা ছেড়ে । জিষ্ণু লেখালেখির চেষ্টা করতো । সকালে

বিকেলে তোপচাঁচী হ্রদের পাশের রাস্তা ধরে পুরো হ্রদটি প্রদক্ষিণ করতো দুই বন্ধুতে
পায়ে হেঁটে, যৌবনের অশেষ জীবনী শক্তিতে ভেসে । পিকলুই জিষ্ণুকে হ্রদের
পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলো সেই বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্র পরিচালকের ছবি 'লা দোলচে
ভিতা'র কথা । বার্গম্যান, কুরোসাওয়া, ফেলিনি, আন্তোনিওনি, ত্রুফো ইত্যাদি কত
পরিচালকের ছবি নিয়ে আলোচনা হতো । সত্যজিৎ রায়ের ছবিও ।

পিকলুর এক মামাতো ভাই ছিলো, যে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এম.
এ. পাশ করেছিলো । তখন বুদ্ধদেব বসু নেই । নরেশ গুহ ছিলেন । সেই কত
কত জানে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য সম্বন্ধে তার কী গভীর জ্ঞান সেই স
বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতো পিকলু । আর জিষ্ণু শুনে ভাবতো জীবনটাই বৃথা
গেলো তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র না হতে পেরে ।

পিকলু চলে যাওয়ার পর একা ঘরে বসে অনেকই পুরোনো কথা ভাবছিলো
জিষ্ণু । কোনো টেলিফোন কল দিতেও মানা করে দিয়েছিলো । এক সময় হঠাৎ
পিপি ইন্টারকমে বললো, "মে আই কাম ইন স্যার ?"

"ইয়েস ।"

পিপি ঘরে এসে বললো, "আমি কি চলে যাবো স্যার ? আমাকে কি দরকার
হবে আপনার ?"

"কেন ? ক'টা বেজেছে ?"

"সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে স্যার ।"

"সাড়ে-পাঁচটা ? মাই গুড্‌নেস । কখন ? কী করে ?"

পিপি সীজন্‌ড সেক্রেটারী । বস্-এর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নি
করে দাঁড়িয়ে রইলো ।

দেওয়ালের কোয়ার্টজ্ ঘড়িটার দিকে চেয়ে জিষ্ণু দেখলো পৌনে ছ'টা বাজে
প্রায় । ও তাড়াতাড়ি বললো, "আপনি চলে যান । আজকে আর কোনো দরকার
নেই । ফাইল পড়তে পড়তে খেয়ালই ছিলো না ।"

পিপি বললো, "স্যার ।"

"কি ?"

"যে ভিজিটর আপনার কাছে এসেছিলেন, মানে আপনার বন্ধু, তিনি একটা চিঠি
দিয়ে গেছেন আমাকে ।"

"হাউ ফানী ! এতোক্ষণ দেননি কেন আমাকে ?"

"উনি বলে গেছিলেন যে আমি চলে যাবার সময়ই যেন দিই । আগে দিতে
মানা করেছিলেন ।"

"হুম ড্যু উ্য সার্ভ হিয়ার মিসেস সেন ? হিম ? অর মী ?"

"আই অ্যাম ভেরী সরী স্যার । এমন করে অনুরোধ করলেন যে 'না' করতে
পারলাম না ।"

"দিন চিঠিটা ।"

মিসেস সেন ওঁর হ্যাণ্ড ব্যাগটি থেকে একটি খাম বের করলেন । বেশ বড় ম । এবং রীতিমত ভারী । খামের উপরে পিকলুর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় জিষ্ণুর ম ।

ওর হাতের লেখা নিয়ে ঠাট্টা করলেই পিকলু জিষ্ণুকে বলতো : "এফিসিয়েন্ট ন হ্যাভ ব্যাড হ্যাণ্ড-রাইটিং । রবীন্দ্রনাথ ওজ্ ওয়ান অফ দ্যা ফিউ কসেপশানস ।"

পিপি বললো, "আমি তাহলে আসছি স্যার ?"

"হ্যাঁ । আসুন ।"

পিকলুকে জিষ্ণু মুছেই ফেলেছে তার জীবন থেকে । সম্পর্ক একবার মরে গেলে কে ঝাড়ফুঁক করে জাগানো যায় না । গেলেও, সে সম্পর্ককে মনে হয় রক্তাল্পতায় ন্যাবায়-ধরা রোগী ।

পেছন-ফেরা মিসেস সেনের দিকে চেয়ে রইলো জিষ্ণু । বেশ মেয়েটি প্রিটী । াণ্ড শী নোজ হাউ ট্যু ক্যারী হারসেল্ফ । কিন্তু পিকলুর চিঠিটা এতোক্ষণ না দেওয়াতে রেগেছিলো ও । চিঠিটা এতো বড়ো যে পড়া যাবে না অফিসে বসে । কী লিখেছে াকলু কে জানে ? পিকলুর চেহারাটা অবশ্য বেশ খোলতাই দেখালো আজকে । া ব্যাপার কে জানে ?

পিপি মেয়েটিকে দেখে বাইরের কেউই বুঝতে পারে না বিবাহিতা কি না ! াজকালকার কম মেয়েকে দেখেই বোঝা যায় । জিষ্ণু অবশ্যই জানে । অফিসেরই ভিন্ন জনের কাছে শুনেছে জিষ্ণু যে, পিপির স্বামীর জীবিকা হচ্ছে পৌনঃপুনিক কারত্ব । প্রচণ্ড মদ্যপ এবং রেসুড়ে লোক । নাম সুমন্ত্র । একটি বাচ্চাও আছে দের । মেয়ে । পিপির উপরেই সব কিছু । মদ, রেস, সিগারেট । বিবেক বলে ছুমাত্র অবশিষ্ট নেই সুমন্ত্রর । ধুয়ে মুছে ফেলেছে অনেকই দিন আগে । বেশ াছে । বিবেকের মতো ইনকন্‌ভিনিয়েন্ট ব্যাপার আর নেইও দুটি ।

লোকমুখে শুনেছে কাজের মধ্যে সুমন্ত্র তিনটি কাজ করে । সকালে উঠে কেতুর-াখে বাসিমুখে সিগারেট ধরিয়ে মাদার ডেয়ারীর ডিপো থেকে দুধ এনে দেওয়া এবং ায়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা । এবং স্কুল থেকে নিয়েও আসা । মেয়েটা কে কম পায় বলেই বাবা-ন্যাওটা । সুমন্ত্রও মেয়েকে এক মুহূর্ত চোখ-ছাড়া করতে য না । পিপি যথেষ্ট সুন্দরী, সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে । বুদ্ধি থাকলেই মানুষ াকে কাজে লাগায় ।

জিষ্ণু এও শুনেছে যে, পিপি ডিভোর্স চেয়ে কেস ফাইল করেছে সুমন্ত্রর রুদ্ধে । এবং হয়তো পেয়েও যাবে । সুমন্ত্র নাকি বিশ্বাস করেনি একথা । নোটিশ ়ড়ে ফেলেছে । সবাইকে বলেছে, বাজে কথা । পিপিতো আর পাগল হয়নি !

সুমন্ত্রকে কোনোদিন আগে চোখেও দেখেনি জিষ্ণু । দেখার কৌতূহলও ছিলে
না । একদিন একটি প্রাইভেট ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছিলো সেনগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে
শর্ট-কাট করতে ড্রাইভার যখন একটি সরু গলিতে ঢুকিয়েয়ে গাড়ি, তখনই সেনগু
সাহেব বললেন, "ঐ দেখুন চাটুজ্যে সাহেব । আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি
স্বামী ।"

যে-মানুষটাকে দেখেছিলো জিষ্ণু তার সঙ্গে পিপির কোনোরকম মিলই ছিলে
না । মোড়ে জ্যাম, ট্যাক্সিটার স্পীড ঠিক সেই মুহূর্তেই আস্তে হয়ে গিয়ে প্রায় থেমে
গেছিলো । একটি মলিন বাড়ির একতলার খোলা দরজার সামনে ছোট্ট তিন-ধা
কেটে যাওয়া লাল-সিমেন্টের সিঁড়ির উপরের ধাপে একজন মানুষ বসে ছিলো । তা
পরনে লালরঙা একটি স্লীপিং-স্যুটের পাজামা । গায়ে, নোংরা হলুদ-হয়ে-যাও
বোতামহীন একটি সাদা পাঞ্জাবি । নিচে গেঞ্জি নেই । বুকের কাঁচাপাকা চুল দেখ
যাচ্ছে । মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি । গায়ের রঙ কালো । মুখটি কুৎসিত না হলেও
শ্রীহীন । জুলপির দু-পাশের চুলে পাক ধরেছে । দুটি পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে জগতে
তাবত নির্লিপ্তি নিয়ে সে বসে বসে হলদে-রঙা ছোট্ট বই থেকে ঘোড়াদের কুল
ঠিকুজির সুলুক-সন্ধান করছিলো । আগামীকাল শনিবার । ডান হাতের তর্জনী আ
মধ্যমার মধ্যে একটি সিগারেট দ্রুত পুড়ে যাচ্ছিলো বিকেলের উথাল-পাথাল হাওয়ায়
যেন তার ভবিষ্যতেরই মতো !

কিন্তু মানুষটার মুখে চেয়েই জিষ্ণুর মনে হয়েছিলো যে, মানুষটা সম্ভবত ভালে
সে মদ্যপ হতে পারে, বেকার হতে পারে, রেসুড়ে হতে পারে কিন্তু মানুষটা দুষ্ট নয়
খল, ইতর বা কুচক্রী নয় । তঞ্চক নয় । তার মুখে এবং কপালে এই কথাটি ব
বড় করেই লেখা ছিলো । পৃথিবীর কারো বিরুদ্ধেই, এমন কি সম্ভবত পিপির বিরুদ্ধে
সুমন্ত্র নামক মানুষটির বোধহয় বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই । দুবেলা দু মুঠো খে
পেলেই, চার প্যাকেট সিগারেট এবং প্রতি শনিবারে পঞ্চাশটি টাকা ঘোড়ার মাঠে
জন্যে ; সে প্রচণ্ড সুখী ।

এতো সব ডিটেইলস্ অবশ্য সেনগুপ্ত সাহেবের কাছেই শুনেছিলো । ত
মানুষটিকে দেখে জিষ্ণুর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিলো যে, এর স্ত্রীই ভুরু প্লাক-ক
স্লিভলেস ব্লাউজ-পরা, আপাদমস্তক নিখুঁতভাবে ডি-ওয়াক্সিং করা সুবেশা, সুগ
পিপি । তার সেক্রেটারী । কী অমিল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ! ভাবা যায় না । মানুষটি
আশ্চর্য নির্লিপ্তি এবং অসাধারণ অসাধারণত্ব নাড়া দিয়েছিলো ভীষণভাবে জিষ্ণুকে

গাড়ির স্পীড বাড়তেই সেনগুপ্ত সাহেবকে বলেছিলো জিষ্ণু, "বুঝলেন, এ
ধরনের মানুষেরাই খুব বড় মাপের দার্শনিক হয়ে উঠতে পারে । সমাজে থেকে
সমাজের প্রতি এদের যে ঔদাসীন্য এটা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করার নয়

"মাই ফুট !"

বলেছিলেন সেনগুপ্ত সাহেব ।

"হী ইজ আ স্কাউন্ড্রেল্ । ওর স্ত্রী যে সপ্তাহে তিনদিন অন্য লোকের সঙ্গে শুয়ে আসছে তা ও জানে ।"

কথাটাতে খুব ধাক্কা লেগেছিলো জিষ্ণুর ।

একটু থেমে সেনগুপ্ত সাহেব বললেন, "আই নো ফর সার্টেন যে পিপি একটি রেস্টপেক্টবল্ 'হোর' হয়ে উঠেছে । শী টেকস ওয়ান থাউজ্যাণ্ড ফর বীইং ডাগ ওয়ান্স্ । নট আ ম্যাটার অফ জোক্ । মাসে দশ হাজার এক্সট্রা ইনকাম করে । অবশ্য অমন অ্যাকমপ্লিশড সফিস্টিকেটেড মেয়ের পক্ষে ঐ তো মিনিমাম 'রেট' । সুমন্ত্রর মতো স্বামী পেয়েছিলো বলেই তো সম্ভব হলো এমন । এজন্য পিপির অবশ্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সুমন্ত্ররই কাছে । এত একসপেনসিভ শাড়ি, জুয়েলারী, মাসের একটি উইক-এণ্ড-এ কোথাও-না-কোথাও যাওয়া । বছরেব ছুটিতে গোয়া, কাঠমাণ্ডু, কাশ্মীর এসব কী আর এমনিতে হতো ? তাও তো সঙ্গে ক্লায়েন্ট নিয়ে যায় । এক পয়সাও খরচ নেই । সঙ্গে সুমন্ত্র আর মেয়েটাও যায় ।. সুমন্ত্রব মনে সুমন্ত্র থাকে । রাতে মেয়েকে নিয়ে শোয় অন্য ঘরে । আর পিপি ক্লায়েণ্টের সঙ্গে । সত্যি । কত রকম জীবনই থাকে মানুষের । মুখোশ । ভাবা যায় না । মানুষটার কোনো আত্মসম্মান আছে বলে ভাবেন আপনি ? মানে এই সুমন্ত্রর ?"

"এতো খবর আপনি জানলেন কী করে ?"

"জানতে হয় ।"

"মানে ?"

"কাউকে বলবেন না, রিজিওন্যাল ম্যানেজারকে এম. ডি. রাতে ফোন করেছিলেন কাল । আর. এম আমাকে ডেকে বললেন ।"

"কী ?"

"যে ক'দিন ওরা কলকাতায় থাকবেন সে ক'দিন পিপি ইভনিং-এ যেন ফ্রী থাকে । ওকে ওখান থেকে ম্যাড্রাস এবং ব্যাঙ্গালোরেও যেতে হতে পারে ।"

"বলেন কী ? আমার পি. এস ?"

"হ্যাঁ । সে ক'দিন আপনার কাজ করে দেবে আর. এম-এর পি. এসই । আজকে ওর কাছ থেকে ছুটির অ্যাপ্লিকেশান পাননি ? মানে, কপি ? পার্সোনেল ম্যানেজারকে অ্যাড্রেস করা ?"

সেনগুপ্ত সাহেব সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর মতো বলেছিলেন ।

জিষ্ণু বলেছিলো, "হ্যাঁ পেয়েছি ।"

"আগে থেকেই ব্যাপারটাকে ক্যামোফ্লেজ করে রাখা হচ্ছে । বুঝলেন না ? অন্য কালার দেওয়া হচ্ছে । আমার এসবের মধ্যে থাকতে আর ভালো লাগে না মশাই। বুয়েচেন ।"

"আপনি এর মধ্যে কোথায় থাকছেন ?"

"জানছিতোরে বাবা ! জানলেও পাপ লাগে । মিডল ক্লাস মরালিটির মানুষ আমরা । রক্ষণশীল ভদ্র শিক্ষিত বদ্যি পরিবারে জন্ম আমার । লজ্জা লাগে মশায় । এসব জেনেও লজ্জা লাগে ।"

"তাই ?"

"না তো কী । একটি সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ে, আফটার অল বাঙালী মেয়ে । স্বামী আছে । মেয়ে আছে । চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে আর তা আমাদের দেখতে হবে ? এটা ভেবে খারাপ লাগেই ।"

"চোখের সামনে একটি পুরো জাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেই বা কী করতে পারছেন ? তাছাড়া আপনি যা বলছেন তাতে নষ্ট তো সে হয়ে গেছেই । যারা নষ্ট হবার প্রবণতা নিয়ে জন্মায় তাদের নষ্ট হতে কোনো কষ্টই নেই, বরং বোধহয় একধরনের আনন্দই আছে ।"

"তাই ? কী জানি মশায় । আপনারা কবি মানুষ আপনাদের দেখার চোখই আলাদা ।"

সেনগুপ্ত সাহেব বললেন ।

হয়তো আপনিই ঠিক বলছেন । হয়তো পিপি ইজ এনজয়িং হারসেল্ফ । চমৎকার সব এয়ার কণ্ডিশানড গেস্ট-হাউস, দিল্লী-বম্বে-ম্যাড্রাস-ব্যাঙ্গালোরের ফাইভ স্টার হোটেলের এফেক্টিভলি এয়ার-কণ্ডিশানড ঘরের নরম মসৃণ বিছানা । রথা-মহারথী সব শয্যা-সঙ্গী । ও তো সুখেই আছে । ওর সুখের জন্যে আমরা দুঃখ পেয়ে মরতে যাই কেন ?"

বলেই, বিবেক-দংশন মুক্ত হয়ে একটি সিগারেট ধরালেন ।

পাশে দাঁড়ানো একটা স্টেটবাস । এমন ডিজেলের ধোঁয়া ছাড়লো আর তার সঙ্গে দমকা হাওয়ায় উড়ে-আসা আণ্ডার-কন্‌স্ট্রাকশন একটি মালটিস্টোরিড বাড়ির ধুলো থেকে বাঁচতে দু' চোখ বন্ধ করে ফেললো জিষ্ণু ।

সেনগুপ্ত সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, "এ শালার শহরে আর থাকা যাবে না । চারদিকের এই অবস্থা, নোংরা, ধুঁয়ো, কালির মধ্যে মানুষের মতো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচাই ভারী মুশকিল মশায় । জ্যোতিবাবুদের লাজ-লজ্জা কি সবই গেছে ? একেবারেই দু'কান কাটা হয়ে গেছে ওরা মশাই !"

বলেই, সেনগুপ্ত সাহেব আবার সঙ্গে সঙ্গে নাকে রুমাল চাপা দিলেন ।

উনি পথে বেরুলেই রুমাল চাপা দিয়ে রাখেন নাকে । ধোঁয়া, ধুলো, জীবাণু, বালি এই সবে ওঁর খুব ভয় । তারা যেন শুধুমাত্র ওঁকেই আক্রমণ করছে সবসময় এই রকম বিশ্বাস আছে তাঁর । জিষ্ণু ভাবছিলো, সেনগুপ্ত সাহেবের চোখে কি বাইরের ধুলোবালিটুকুই পড়ে শুধু ? এই শহরের মানুষদের বুকের মধ্যের, মস্তিষ্কের মধ্যের

ুলোবালি কি ওঁকে পীড়িত করে না ? জিষ্ণুকে কিন্তু করে। প্রতিমুহূর্তেই করে।

ইণ্টারকম্ পিঁ পিঁ করলো।

আজ কী হয়েছে জিষ্ণুর কে জানে ! শুধু ভাবনাতে পেয়েছে। কোনো কাজও হলো না চান্চানি ওর ঘর থেকে চলে যাবার অথবা পিকলুর চলে যাবার পর থেকে। ইণ্টারকম্ আবার পিঁ পিঁ করে উঠলো।

সেনগুপ্ত সাহেব ইণ্টারকম-এ বললেন, "ক্লাবে যাবেন নাকি ? আই নীড আ স্টিফ্ ড্রিঙ্ক।"

"না আপনিই যান। আমার একটু কাজ আছে।"

"পার্সোনাল অ্যাণ্ড প্রাইভেট ?"

"ওয়েল, সর্ট সফ্।"

"ফাইন্। উইশ ইউ্য ওল দ্যা বেস্ট।"

বিরক্ত হয়ে ইণ্টারকম-এর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো জিষ্ণু। লাল আলোটা দুবার ব্লিঙ্ক করে নিভে গেলো। সব সময়ে বোকাবোকা রসিকতা ভালো লাগে.না।

কলিগ্দের মধ্যে সেনগুপ্ত সাহেবের মতোই বেশি। ওঁরা রোজ ড্রিঙ্ক করেন না। বৃষ্টি যেদিন পড়ে সেদিন করেন এবং আর যেদিন পড়ে না ; সেদিন। এবং কোনো সমস্যা, কোনো সমাধান, কোনো আনন্দ অথবা দুঃখ সবেতেই ওঁদের একটি 'স্টিফ্-ড্রিঙ্ক'-এর দরকার হয়ই। বেশিরভাগেরই একই কথা, একই রসিকতা, একই অ্যাম্বিশান, একই পরচর্চা। পরচর্চার বৃত্তটিরও কোনোই হেরফের নেই। টোটালি মানভেন্।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো জিষ্ণু। ওকে একটি এয়ারকণ্ডিশানড মারুতি দিয়েছে অফিস থেকে। সস্তাতে। পুষির দুর্ঘটনার পর থেকেই আর. এম. বারবার বলেছেন, যতদিন ফ্ল্যাট না পাও, গাড়ি আমাদের রিপেয়ারারের গ্যারাজেই থাকবে। কিন্তু তোমাকে স্কুটারে আর চড়তে দেবো না আমি। তোমাকে কণ্টেসাও দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার গলিতে তো তা ঢুকবে না। বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে ড্রাইভার তোমাকে। আবার ছেড়ে দিয়ে আসবে। গাড়ি চালানোটা শিখে নাও। আজকাল ড্রাইভারদের যা বোলচাল আর ওভারটাইম তাতে ছুটির দিনে নিজে না চালালে মোবিলিটিই থাকবে না।

ফেরবার সময় গাড়ি বেশিরভাগ দিনই নেয় না জিষ্ণু। প্রথমত অফিসের ড্রাইভার। ওভারটাইম দিতে হয় পাঁচটার পরই। নিজের দিতে হয় না যদিও। তবু গায়ে লাগে। একটু হাঁটাহাঁটিও হয়। তাছাড়া, জিষ্ণু পুরোপুরি গাড়ি-নির্ভর হতে চায় না। সব ক্যাপিলিস্টদের ঐ এক কায়দা। যার যোগ্যতা দুশো টাকার তাকে দু'হাজার দেয়, যার দু'হাজারের তাকে দশ হাজার। ফ্ল্যাট, গাড়ি, আরাম ছুটি

সব। তারপর তাকে দিয়ে পাও চাটিয়ে নেয়, হামাগুড়ি দেওয়ায়, অন্যায় কাজ করাতে বাধ্য করে সব রকম। মানুষগুলোর বিবেকগুলোকেও পোষা কুকুরের মতো করে ফেলে। জিষ্ণু দেখছে, দ্যাখে চারদিকে এমনই অনেক মানুষকে। তাই পুরোপুরি পরনির্ভর হতে চায় না ও। এটা না হলে চলে না, ওটা না হলে চলে নাতে বিশ্বাস যাতে না করতে হয়, তারই চেষ্টা করে ও। এখনও করে। অবশ্য বিয়ে করলে, মানুষ হিসেবে হয়তো বদলে যাবে। অনেককেই বদলে যেতে দেখেছে। সপ্তাহে গড়ে তিনদিন হেঁটে বা অন্যভাবে বাড়ি ফেরে ও। পথের জনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে হাঁটতে ওর খুব ভালো লাগে। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে, চকিত-চাউনি, চলে-যাওয়া বা এগিয়ে-আসা নারী ও পুরুষের মুখের এক এক ঝলক। এক ধরনের একাত্মবোধ নিমেষে সঞ্চারিত হয়ে যায় তখন ওর মধ্যে

আজ পথে যখন বেরুলো তখনও আলো ছিলো। ওদের অফিসের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই গেটের দু পাশের দুটি বড় কদমগাছে ফুল এসেছে অজস্র। ঝিম্-ধরা গন্ধ পায় একটা। গাছগুলির কাছে এলেই। ফোটা কদম নিচে পড়ে রয়েছে। এই কংক্রিটের শহরে এর দাম নেই। কদম ফুল চেনেই বা এখানে কজন ?

আকাশে তাকিয়ে আজ হঠাৎই বাড়িওয়ালা তারিণীবাবুর কণ্যাসমা মামণির মুখটি মনে পড়ে গেলো। আজকের বিকেলবেলার আলোর মতোই স্নিগ্ধ সেই মুখ। অথচ এই ভরা-ভাদরের গরমেরই মতো এক ধরনের আর্দ্র জ্বালাও যেন মিশে আছে এবারের চলে যাওয়া গরমের মতো পাগল করা এলোমেলো হাওয়ার মতোই কিছু কলকাতার বাইরের চেহারাটাই শুধু বদলায়নি, বদলায়নি স্কাই-লাইন, ভিন-রাজ্যের বাসিন্দাদের ভীড়ে এই শহরের বাঙালীত্ব বদলে গেছে, বদলে গেছে আবহাওয়াটাও পুরোপুরি। কলকাতায় আজন্ম বসবাসকারী কোনো বৃদ্ধও এই গ্রীষ্মের মতো এমন দিনরাত এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া দেখেননি। মে মাসে দেখেননি শ্রাবণের বৃষ্টি সব ওলোট-পালোট, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

পুরো নামটি কি মামণির ? কে জানে ? তার ছবি ও অন্যান্য বিবরণ, আশা করছে জিষ্ণু, আজকালের মধ্যেই এসে যাবে। এসে যাওয়ার পর কী করবে তা ও জানে না। তখনই ভেবে দেখবে।

টাইয়ের নটটা আলগা করে দিলো। বড় গরম। কোটের বাঁ পকেটে পিকলুর চিঠিটা। ভারী চিঠি। বড় খামে। পিকলুর কী এমন বলার থাকতে পারে যা ও মুখে বলতে পারলো না জিষ্ণুকে ? আশ্চর্য !

পার্ক স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওয়ালডর্ফ-এর সামনে দিয়ে যেতে যেতে সেখানেই ঢুকলো। এখন ভীড় নেই। দোতলায় উঠে একটি শার্কস-ফিন্ স্যুপ আমেরিকান চপ-স্যুই এবং চাইনীজ্ টী'র অর্ডার দিয়ে চিঠিটা বের করলো পকেট থেকে। বাড়ি গিয়ে আজ আর খাবে না। পরী এখনও ফেরেনি ব্যাঙ্গালোর থেকে

বাড়ীটা আর বাড়ি নেই। শিশুকাল থেকে মাতৃ-পিতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও পরী আর কাকিমার জন্যে মা-বাবার অভাব কখনও বোধ করেনি। পুষির মৃত্যু এবং কাকিমা ও পরীর এই হঠাৎ বিপরীতমুখী পরিবর্তন ওকে বড় একলা করে দিয়েছে। পিকলুর খলতাও। পিকলুই বলতে গেলে ওর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। এই মুহূর্তে জিষ্ণু যতখানি একলা ততখানি একলা ও কোনোদিনই ছিলো না।

মামণির নামটি জানলে আজ একটি চিঠি লিখতো তাকে। নাম দিতো না নিচে। আজকের এই উজ্জ্বল কদম-ফুল ফোটা বিকেলের মতোই হতো সেই চিঠি।

পিকলুর চিঠিটা খুললো জিষ্ণু।

জিষ্ণু, প্রিয়বরেষু,

ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে একলা কোথাও বসে, পুরোনো দিনের মতো অনেক অনেক গল্প করব। তোকে অনেক কিছু বলারও ছিলো। যা বলার, তা তুইই সেদিন আমাকে বলেছিলি। একতরফা। আমার কথা শোনার ধৈর্য তোর ছিলো না। বলার মতো মানসিক অবস্থাও অবশ্য আমার ছিলো না।

একথা সত্যি যে আমি রেস-এর মাঠে যেতাম নিয়মিত। কিন্তু তোর কাছে যতবার ধার চেয়েছিলাম রেস-এর মাঠের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিলো না। বিয়ের পর পরই খুসির গয়না বন্ধক দিয়ে আমি রেস খেলতাম। এই আশাহীন পৃথিবীতে হয়তো রেসুড়েরাই একমাত্র বিশ্বাস করে যে, আশা আছে। তোর সেক্রেটারী পিপির স্বামী সুমন্ত্রও তাই করে। বড় ভালো ছেলে সুমন্ত্র। তোর মতো বা তার স্ত্রীর মতো "সাকসেসফুল" নয় জীবনে। প্রত্যেক রেসুড়েই বিশ্বাস করে যে একদিন, একদিন কোনো বিদ্যুৎগতি চিকন ঘোড়া স্বপ্নের পক্ষিরাজের মতো তাদের জীবনে সব কিছু স্বপ্ন সফল করে তুলবেই তুলবে।

জিষ্ণু, তোর কাছে টাকা ধার করেছিলাম বহুবার। কতবার যে, তা তুই নিজেই ভুলে গেছিস। বার বার মিথ্যে কথা বলেই নিয়েছিলাম। খুকি হওয়ার সময়ে তুই নিজেই টাকা দিয়েছিলি। আমি চাইনি। তোর কাছে আমি চিরঋণী। কিন্তু টাকা মিথ্যে কাজে লাগেনি। তোর টাকা দিয়েই খুসির যে ক'টি গয়না বন্ধক দিয়েছিলাম তা ছাড়িয়ে এনে ওকে ফেরত দিয়েছিলাম। দিতে যে পেরেছিলাম তা আজকে মনে করে ভারী ভালো লাগে। খুসিকে খুশি করার মতো খুব বেশি কিছু করতে তো পারিনি। ওকে শুধু কষ্টই দিয়েছি।

তুই আমাকে যতখানি ভালোবাসতিস সেই স্কুলের দিন থেকে অতখানি ভালোবাসা এ জীবনে খুব কম মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছি। তোর কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন আমার ছিলো না। কারণ আমি জানতাম যে তোর কাছে চাইলে

এবং তুই দিতে পারলে কখনও 'না' করবি না।

তাছাড়া, জিষ্ণু, তুই বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি ভাবতাম তুই ছাড়া আমার বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াবে এমন আর কেই বা আছে ? তোর উপর আমার যতখানি জোর ছিলো বলে জানতাম ততখানি জোর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কারো উপরেই ছিলো না। তাই তোর কাছে কোনো কিছু চাইতে কখনওই কোনো সঙ্কোচ বোধ করিনি। তোর বন্ধু যদিও আমি ছিলাম একমাত্র কিন্তু তুই জানিস যে আমার বন্ধু ছিলো অগণ্য। কিন্তু তারা ছিলো আমার ফুটবলের বন্ধু, তাসের বন্ধু, আড্ডার বন্ধু, রেস-এর মাঠের বন্ধু। তাদের কাছে কিছু চেয়ে যদি না পেতাম তাহলে নিজেকে বড়ই ছোট লাগতো। তাই কখনও চাইতে যাইওনি। তোর উপরে আমার দাবী সম্বন্ধে আমার কোনোদিনই কোনো দ্বিধা ছিলো না। সংশয় ছিলো না।

তোর কাছেও নিজের সম্মান যে বিকোতে পারে সেকথা সত্যিই ভাবিনি কোনোদিনও।

আমার বিয়ের পর থেকেই খুসিও কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতো। বলতো, "থাকবার মধ্যে তো আছে এক জিষ্ণুদা। তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি ভরসা করি না। বিপদে-আপদে সে যা করেছে, করে তোমার জন্যে, তা আমার কী তোমার বাপের বাড়িরও কেউই করেনি। করবেও না।"

যতবার তোর কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি, ততবারই ভেবেছি যে সময়ে না হলেও পরে তোকে টাকাটা শোধ করে দেবো। শোধ করতে যে পারতাম না এমনও নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি ভেবেছিলাম, সত্যিই ভেবেছিলাম যে, তোকে টাকা ফেরত দিতে গেলে তুই খুব রাগ করবি। বলবি, "রাখ্, রাখ্ বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।"

একবারের জন্যেও বুঝতে পারিনি, ভাবিতোনিই যে ; আমার নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণেও টাকা প্রতিবারই তোকে ফেরত দেওয়ার কথা আমার বলা উচিত ছিলো। তোর আছে বলেই যে সহজে নিতে পারি এই বোকা-বিশ্বাসে ভর করে তোর সমস্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাও যে হারিয়েছি এখন তা বুঝতে পারি।

ভুল সকলেরই হয় জিষ্ণু। আমার যেমন হয়, তেমন তোরও নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সকলের একভাবে করতে হয় না। তুই যে জিষ্ণুই, অন্য কেউ নোস ; এই ভাবনাটাই আমাকে প্রথম ভুল করালো।

শেষবার তোর কাছে যে টাকাটা চেয়েছিলাম তা কিন্তু খুকির মুখে ভাতের জন্যে চাইনি। সত্যিই তুই বড় ব্যস্ত থাকিস। ওর মুখে ভাত হয়ে গেছিলো গত বছরই। ও কবে যে জন্মেছিলো তাও তোর মনে ছিলো না। সেই সুযোগটা আমি নিয়েছিলাম। আসলে তুই শেষ কবে আমাদের বাড়ি এসেছিলি তাও আমার মনে পড়ে না। আট দশ বছর তো হবেই। তুই তোর অফিসে কী বাড়িতেই তো আমাকে ডাকতিস।

চিরদিন যেমন ডেকেছিস, গেছি। কখনও অভিমান করিনি। তোকে বলিনি যে, আমি তোর মোসাহেব বা চামচে নই। আমি তোর বন্ধু। বন্ধুত্ব হয় এবং থাকে সমতলেই দাঁড়িয়ে, হাতে হাত রেখে ; সসম্মানে। বলিনি যা বলতে চাইলেও পারিনি একথা ভেবে যে, তুই হয়তো দুঃখ পাবি সেকথা বললে। তোর কাছে অনেকভাবেই আমি উপকৃত ছিলাম। ভালোবাসার কথা ছেড়েই দিলাম। ভালোবাসা তো ইনট্যান্‌জিবল্‌ ব্যাপার। তার আয়তন কল্পনায় বা অনুমানেই থাকে শুধু।

অনেকদিন আমার বা খুসির কোনো খবর করিসনি বা আমাদের বাড়িও আসিসনি বলেই হয়তো তোর এই ভুল হয়েছিলো। আমার বিয়ে হয়েছে সাত বছর। খুকির বয়স হলো এক বছর দশ মাস। আমার মেয়ের নাম যে চুমকি তাও হয়তো তুই জানিস না। যদিও বাড়িতে খুকি বলেই ডাকি। তুই সে জন্যেই বোধহয় সব সময় 'কন্যা' বলে উল্লেখ করতিস। আমার বৌভাতের পর একদিন মাত্র তুই এসেছিলি আমাদের বাড়িতে। মনে আছে ? খুসির গান টেপ করে নিয়ে গেছিলি ? তারপর আর নয়।

যা বলতে এই চিঠি শুরু করেছিলাম, সেটাই বলতে পারছি না। চিঠিটা বড়ই এলোমেলো হয়ে গেলো।

এপ্রিলের পাঁচ তারিখে খুসি চলে গেছে। ব্রেস্ট-ক্যানসার হয়েছিলো। আমি একদিন আদর করার সময় একটি লাম্প-এর মতো অনুভব করি।

খুসি বললো, ওটা তো বিয়ের আগে থেকেই ছিলো। ব্যথাট্যথাতো কিছুই নেই। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন ?

তবু প্রায় জোর করেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। মনীষ রে ! আমাদের সঙ্গে পড়তো। মনে আছে ? ও দেখেই বললো, ডাঃ সেনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পরদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলো। পরদিন যখন নিয়ে গেলাম, বোঁচা সেন বললেন, অপারেশান করতে হবে অবজার্ভেশানে রেখে। নার্সিং হোমে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নিলেন।

খুসিকে ভর্তি করেই উদভ্রান্তের মতো টাকার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সেদিন বহুদিন পর সাঙ্গুভ্যালির আড্ডায় গেছিলাম। পথেই তোর সঙ্গে দেখা হল, তুই যখন পুষির মৃত্যুর কথা বললি, আমি রি-অ্যাক্ট করিনি। কারণ সঙ্গে-সঙ্গেই আমার নার্সিং-হোমে ভর্তি-করানো খুসির কথা মনে হয়েছিলো। কেন যে আমি তোকে খুকির অন্নপ্রাশনের গল্পটা বানিয়ে বললাম তাও জানি না। টাকাটা যখন তুই দিলি না তখন তো আর অন্য গল্প বানানো যেতো না ! তাছাড়া, পুষির মৃত্যু তোকে কেমন আঘাত দিয়েছিলো তা লক্ষ্য করেই খুসির অসুস্থতার খবর তোকে দিতে চাইনি। বিশ্বাস কর আর নাই কর।

মনীষ বলেছিলো, বম্বেতে নিয়ে যেতে অথবা দিল্লীতে। তার জন্যে অনেক

টাকার দরকার ছিলো। আমার না হয় অবস্থা ছিলো না কিন্তু খুসির দাদাদের অবস্থা খারাপ নয় তা তুই জানিস। কিন্তু দাদাদের মধ্যে খুসির বিয়ের সময় কে কত খরচ করবেন তা দিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল, খুসি দাদদের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য নিতে রাজী ছিলো না। গয়না বিক্রী করতেও রাজী ছিলো না। মেয়ের জন্যেই রেখেছিলো সব। খুকির বিয়ের সময় লাগবে বলে। খুসি আবারও বলেছিলো, জিষ্ণুদাকে বোলো। সে ছাড়া আমাদের আপনজন আর কেইই বা আছে।

অনেকটা উল্টোপাল্টা লিখলাম তোকে। খবরটা তোকে আগে দিতে পারিনি। আমার অন্য যেসব বন্ধু, অন্য জগতের, তাদের তুই চিনিস না। তারাও তোকে চেনে না। চিনলে তাদের কাছ থেকে আমি পুষির খবর পেতাম, তুইও পেতিস খুসির খবর। এ খবরে আজ তোর আর কোনো ইন্টারেস্ট আছে কি না তাও জানি না।

শ্রাদ্ধর সময়ও ইচ্ছে করেই তোকে চিঠি পাঠাইনি। কারণ, তোর উপরে খুসির বিশ্বাস বড় আহত হয়েছিলো শেষ মুহূর্তে। মৃত্যুর আগে। যদি তুই একটু সাহায্য করতিস তবে হয়তো ওকে বম্বে-দিল্লী নিয়ে যাওয়া যেতো। নিয়ে গেলেই বাঁচতো এমন নয়। তবে সান্ত্বনা পেতাম কিছুটা।

যাকগে, তুই জানতিস না, যখন, তোকে একটুও দোষ দিতে পারি না। দিইওনি। তুই যে আমাকে আহত করেছিলি সে জন্যেও মনে কিছু করিনি। মনে হয়, এ জীবনে যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কোনোদিনও তোর কাছে টাকা চাইবো না। এবং কথা দিচ্ছি। আস্তে আস্তে আজ অবধি তুই যত টাকা আমাকে দিয়েছিলি তার সবই শোধ করে দেবো। অবশ্য সুদ দিতে পারবো না। এটা আমার ঔদ্ধত্য বলে ভুল করিস না। খুসি যেহেতু শেষ মুহূর্তে মস্ত আঘাত পেয়েছিলো তার আত্মার শান্তির জন্যেই আমাকে তোর সব টাকা ফেরত দিতেই হবে।

তবে আমি জানি যে, টাকা ফেরত দিলেই সব হবে না। টাকাটা কিছুই নয়। তোর কাছ থেকে এ জীবনে যা পেয়েছি তা শোধ করার সাধ্য আমার নেই। কখনও হবেও না।

তুই আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার হয়তো কখনও আর করবি না। আমিও হয়তো নাও করতে পারি। তবু এক সময়ের বন্ধুত্বর প্রমাণ হিসেবে ভেঙে পড়া শ্রদ্ধার পাঁচিল টাকার বাণ্ডিল দিয়ে মেরামত করার অসফল কিন্তু সীরিয়াস চেষ্টা করব যে, শুধু এইটুকুই বলতে পারি তোকে।

ভালো থাকিস।

ইতি—তোর একসময়ের একমাত্র বন্ধু। পিকলু

চিঠিটা যখন খুলছিলো এবং প্রথম কিছুটা পড়েছিলো তখন মনে হয়েছিলো কেঁদে-টেঁদে ফেলবে হয়তো জিষ্ণু, চিঠিটা শেষ অবধি পড়ে। কিন্তু চিঠিটা পড়া শেষ হলে চিঠির প্রভাব যে তার উপর এমন প্রলয়ঙ্করী হলো না, তা লক্ষ্য করে নিজেও

ম অবাক হলো না ।

পিকলুটা "জালি" হয়ে গেছে । "দু নম্বর" । ওর চিঠির মধ্যেও একশটা আপাত-
বিরোধী কথা । মিথ্যে কথা । হবেই । মিথ্যার এই দোষ । একটা বললে দশটা
আরও বলে তা ঢাকতে হয় ।

জিষ্ণুর কাছে পিকলু সত্যিই মরে গেছে । আজকে পিকলু যাই বলুক ও লিখুক,
। যে একজন মিথ্যেবাদী, ঠক, তঞ্চক এবং ও যে এতগুলো বছর ধরে জিষ্ণুর হৃদয়ের
ঞ্চতার বিনিময়ে তার সঙ্গে এই রকম প্রবঞ্চনা করে গেছে সেই সত্য জিষ্ণুর বুককে
ভঙে দিয়েছে। যে তঞ্চক, যে প্রবঞ্চক বন্ধুত্বের মুখোশ পরে কাছে আসে, এবং
ধু আসেই না, অতি দীর্ঘদিন তাকে জড়িয়ে থাকা স্বর্ণলতার মতো সেই লাউডগা
াপের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখার মতো মানসিকতা জিষ্ণু অন্তত আর রাখে না ।

না । তবে ও এক গভীর দুঃখ বোধ করলো খুসির জন্যে । মেয়েরা এদেশে
ামী-নির্ভর জীবনই যাপন করে । এখনও যার যেমন স্বামী, তার তেমন জীবন ।

জিষ্ণুকে যারা ভালোভাবে চেনে তারাও আসলে ওকে পুরোপুরি চেনে না ।
র নরম বহিরাবণের মধ্যে একটি অত্যন্ত কঠিন কোরক আছে । সেই কোরকের
ধ্যে যখন তার মনকে সে লুকোয় তখন সেখানে পৌঁছনো কোনো ভূত বা ভগবানের
ক্ষেও সম্ভব নয় ।

"খুসি চলে গেছে" এই কথাটাও আশ্চর্য ! জিষ্ণুকে তেমন আলোড়িত করলো
। করবেই বা কেন ? বন্ধুর স্ত্রী । এই পর্যন্তই । কোনোরকম মেলামেশা বা
ান্তরিকতা তো ছিলো না । হতোও না তা জিষ্ণুর সঙ্গে । বৌভাতের দিনেই তা
ঝেছিলো । পিকলুর "বুড়ো" বয়সের এই ভুলকে ক্ষমা করতে পারেনি জিষ্ণু ।
পকলুর বিয়ের পর দিন থেকেই জিষ্ণুর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো পিকলু অতি
ত । দেখা হলেই পিকলুর মায়ের নিন্দা আর তার স্ত্রীর গুণগান । একটা জলজ্যান্ত
শিক্ষিত পুরুষ মানুষ যে কী করে এমন মেয়েমানুষ হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতে
র্যন্ত পারতো না জিষ্ণু । আজকে ওর অফিসের বেয়ারা রামদীন বা পিপি বা চানচানির
ঙ্গে ও কতখানি ঘনিষ্ঠ, পিকলু বা খুসির সঙ্গে গত সাত বছরে তার এককণাও ছিলো
া । উল্টে ক্রমাগত মিথ্যাচারের আর পৌনঃপুনিক নগ্ন স্বার্থপরতায় পিকলু নিজেকে
জিষ্ণুর কাছ থেকে অনেকই দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো ।

বিল মিটিয়ে ফুটপাতে নেমে ট্রাউজারের দু পকেটে দুটি হাত ঢোকার আগে
পিকলুর চিঠিটিকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে পথের ডাস্টবিনে ফেলে দিলে জিষ্ণু ।
াওয়ার তোড়ে দু-এক কুচি উড়ে গিয়ে পড়লো পথে । সারিবদ্ধ গাড়ি তাদের চাপা
দিয়ে চলে গেলো । একটি গাড়ির টায়ারের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে একটি কুচি চলে গেলো
পার্ক সার্কাসের দিকে ।

শুধু কলকাতা শহরটা বদলায়নি । বদলেছে জিষ্ণুও । অনেকখানিই । একটু

অবাকই লাগছিলো ওর । এই জিষ্ণুকে, শক্ত ; নিষ্ঠুর জিষ্ণুকে আবিষ্কার করে
কী মনে করে আবার ফিরলো ওয়ালডর্ফ-এর দিকে ।

বললো "মে আই ইউস ট্যওর ফোন ?"

"ইয়েস স্যার ।"

পিকলুর ফোন নম্বরটা কোনোদিনও ভুলবে না জিষ্ণু । এতো সহস্রবার ডায়া
সেই নম্বরটা ঘুরিয়েছে । সেই স্কুলের দিনগুলি থেকে । এক্সচেঞ্জ বদলেছে ব
নাম্বার একই আছে ।

পিকলুর সেনাইল' বাবা ধরলেন । উনি খড় ভালোবাসতেন জিষ্ণুকে । মাও
এখন অবশ্য পিকলু তাকে কোন্ রঙে রাঙিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত করে রেখে
জানা নেই । রাখলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই । কিছুদিন হলো এই বেপরো
"ক্যুডন'ট কোয়ারলেস্" অ্যাটিচুডটা এসেছে জিষ্ণুর মধ্যে । ভালো থাকা, "ভালে
বলে নাম কেনা, কে কী ভাবলো, কে কী বললো, তা নিয়ে মাথাব্যথা ওর অ
একটুও নেই । ভালো হয়েও তো এই পুরস্কারই জুটলো !

কাকাবাবুই ধরলেন ফোনটা । বললেন, "হ্যাঁ । দিচ্ছি পিকলুকে ।"

"তুমি কেমন আছো বাবা ? শুনেছো তো সবই ।"

কাকিমা ধরলেন তারপর পিকলুর মা ।

বললেন, "আমার হয়েছে মুশকিল । সঙ্গীহারা হলাম বাবা । ভেবেছিলুম এক
আর হলো আর এক ।"

পিকলু এসে ফোন ধরলো ।

"কী রে ? খবরটা জানাতেও পারলি না সময় মতো ?"

জিষ্ণু বললো ।

"কী হতো ?"

"তা ঠিক । আমি তো তোর ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে পড়ি না ।"

পিকলু চুপ করে থাকলো ।

"শোন্, খুকি কী পড়ছে ? এখনও দিসনি নিশ্চয়ই কোথাও । আমার দ্বারা কো
রকম উপকার হলে জানাস । আরও একটা কথা তোকে বলা দরকার । তুই লিখেছি
আমাদের বন্ধুত্ব "সমতলের" ছিলো না । তা নিশ্চয়ই ছিলো না । কোনোদিনই নয়
কিন্তু উষ্ণতা ছিলো অনেক । অসমতলে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্ব তে
যেমন ছিলো, আজকে বলি যে, আমারও কম ছিলো না । তোর হীনম্মন্যতায়, তে
তঞ্চকতায় তাকে যদি তুই অস্বীকার করতে চাস তো করিস । আমিও স্বীকার কর
না ।'

পিকলু বললো, "আমার ঐ মানসিক অবস্থায় তুই এতো সব বলছিস কে
আমাকে ?"

পুষির মৃত্যুর কথা শোনার পরই তো তুই ধার চেয়েছিলি আর আমার স্কুটারটা সস্তায় কিনতে চেয়েছিলি । আর কিছু বলেছিলি ? ভুলে গেছিস ?"

"তখন খুসি যে নার্সিং হোমে...আমার অবস্থা..."

"সে কথাটাও তো বলিসনি । তবে আর কেন ? তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই পিকলু । আর কোনোদিনও টাকা নিতে বা দিতেও তোর আমার কাছে আসার দরকার নেই । তোকে দেখে আমার জীবনে বন্ধুত্বর সংজ্ঞা আমি বদলাতে বাধ্য হয়েছি । সব বন্ধুত্বই, একটা বয়সের পর, ফ্রেণ্ডশিপ অফ কনভিনিয়েন্স । বন্ধুত্ব থাকে ঘামে-ভেজা জার্সি পরে দৌড়ে যাওয়া খেলার মাঠেই । তারপরও হয়তো কিছুদিন । কিন্তু তারপর আর নয় অ্যাকোয়েন্টন্সই সব । নিছক অ্যাকোয়েন্টেন্স । বন্ধুত্ব করতে হলে হাতে নষ্ট করার মতো অঢেল সময়ও চাই । মনোমতো মানুষ না পেলে জোর করে বন্ধুত্ব করার কোনো মানে হয় না । আমি একা থাকতে ভালোবাসি । অসম্পূর্ণ নই আমি তোর মতো যে, 'টাইম-কিল' করতে হন্যে হয়ে রেসের মাঠ, আজে-বাজে মানুষের সঙ্গে বসে সময়কে মারতে হবে আমার ।"

ওপাশ থেকে পিকলু কট করে লাইনটা কেটে দিলো মনে হলো ।

লাইন কেটে দিয়েছে । জিষ্ণুর কথাগুলো বড় দীর্ঘ এবং বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছিলো নিশ্চয়ই । প্রবন্ধর মতো ?

কী করবে ? কথা জমে থাকলে অমন হয়ই । ভূমিকম্পের উৎসারের মতো গরম লাভা হয়ে বেরিয়ে আসে । কথা তখন আর ফেরানো যায় না ।

জিষ্ণু ফোনের চার্জ দিয়ে পথে বেরিয়ে ভাবলো, ভালোই হলো পিকলু ফোনের লাইন কেটে দিয়ে জিষ্ণুর সুস্থ বিবেকে যতটুকু প্রাণ বেচে ছিলো তাকেও মেরে দিলো । চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এলো । জিষ্ণু এমন ছিলো না । নিষ্ঠুর, খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে ও দিনে দিনে ।

চতুর্দিকে মালটিস্টোরিড বাড়ি উঠছে । আকাশ দেখা যাবে না ক'দিন পরে । গাড়ি চালানো যাবে না পথে । হাঁটা যাবে না । ক্যামাক স্ট্রীটে আর একটাও কৃষ্ণচূড়া গাছ নেই । অথচ কলকাতায় বসন্ত এসেছে তা বোঝা যেতো এই রাস্তার কৃষ্ণচূড়ার বাহারেই । বদলে গেছে কলকাতা । বালিগঞ্জের পুরো এলাকা, ল্যান্সডাউন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পুরো পার্ক স্ট্রীট এলাকা, আলিপুর, নিউ-আলিপুর কোনো এলাকাই আর চেনা যায় না । কলকাতা বদলে গেছে একেবারে । বাড়ি তো নয় এক একটা পাহাড় । বিহারের মতো 'লু' বয় এই শহরে । বাঙালি পাড়াতেও বাঙলা কথা শোনা যায় না ফুটপাথ দিয়ে হাঁটলে । এটা আর বাঙালিদের শহর নেই । এই বদলের দিনে জিষ্ণু একাই বা একরকম থাকবে কেন ? পিকলু যদি এমনভাবে বদলে যেতে পারে, বুকে-জড়ানো বন্ধু যদি তঞ্চক হয়ে উঠতে পারে ; তবে সেইবা তঞ্চকের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে যাবে কেন ?

না । কোনো সহানুভূতি, সমবেদনা কিছুই নেই ওর বুকে পিকলুর জন্যে, খুসির জন্যে এবং ওদের অদেখা কন্যার জন্যেও । না । নেই ।

কদিন হলো মামণির কথা বড় মনে হচ্ছে জিষ্ণুর ।

ওর এয়ারকণ্ডিশনড অফিসের জানালার বাইরে অনেকগুলো পনসাটিয়ার গাছ আছে । হাল্কা ধূসর ফিল্ম-লাগানো জানালার মধ্যে দিয়ে পন্সাটিয়ার ফুল আর পাতাগুলোকে অন্যরকম দেখায় । বাইরে ভ্যাপসা গরম । লোকে ঘেমে নেয়ে গরমে হাঁটছে আর ঘাম মুছছে দেখতে পায় । আর এদিকে ভিতরে আরাম । জানালা দিয়ে তাকালে মনে হয় স্বপ্ন দেখছে । কাজ অবশ্যই বেশি করা যায় এমন পরিবেশে তবে যারা এমন পরিবেশ পায় না কাজ করার জন্যে তাদের ওপর অনেক সময়ই অবিচার করা হয়ে যায় । শত ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামতে ঘামতে বেশি কাজ করা যায় না । মেজাজও খারাপ হয়ে থাকে । খিটখিটে হয়ে যায় স্বভাব

আজ খুবই ভোরে এসেছিলো অফিসে । টেলেক্স মেসেজগুলো দেখতে দেখতেই চোখে পড়লো কাশবেকারের মেসেজ আর. এম. এর. কাছে । "এম. ডি অয়ান্টস্ জিষ্ণু টু মীট কাস্টোমারস ইন দ্যা কন্টিনেন্ট । ট্যুওর এক্সপেকটেড টু লাস্ট ফর আ মান্থ । হী মে টেক হিজ ওয়াইফ ইফ হী ডেজায়ার্স । দ্যাট ট্যু অন দ্য কোম্পানি ।"

এইবারে ইনকামট্যাক্স অ্যাক্টে এক্সপোর্টারাদের জন্যে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতে কোম্পানীর উপরমহল খুবই খুশি । সেই খুশির ছটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ।

"ওয়াইফ" এর কথায় জিষ্ণু একা ঘরে মুখ বিকৃত করলো । পুষির কথা মনে পড়ে দুঃখ হলো খুব । আর পরীর কথা মনে পড়ায় রাগ ।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়াতে খুবই অবাক হলো ও । কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটা বেজেছে । পিপি রোজ জিষ্ণু পৌঁছবার আগেই ঠিক নটাতে এসে মেইল দেখে রেখে যায় জিষ্ণুর টেবলে । সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি নেই তাও দেখে । তারপর ঠিক সাড়ে নটাতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে হেসে বলে, গুডমর্নিং স্যার ।

পাঁচ বছর কাজ করছে পিপি ওর কাছে । একদিনও এর অন্যথা হয়নি । পিপির জন্যে এ বছর একটা মোটা ইনক্রিমেন্ট সাজেস্ট করেছে জিষ্ণু বিশেষ করে সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে সব শুনে । এখন ও প্রায় সাড়ে তিন মতো পায় । পারকুইজিটসও আছে । তবে কাগজ তো টাকাই হয়ে গেলো । সত্যিই ।

টেলিফোনটা বাজলো । ডায়রেক্ট ফোনটা ।

"ইয়েস ।"

"স্যার ?"

কান্নাভেজা গলা কোনো নারীর ।

না। সময়ও লাগলো না। বাড়ির সামনে একটা ছোট জটলা মতো হয়েছে। পুলিশে
ভ্যান, ও. সি.-র জীপ। তা ছাড়াও তিনটি প্রাইভেট গাড়ি। গরীব মরে গিয়েই ত
প্রতিবেশীর সম্মান কুড়িয়ে যায় শেষবারের মতো তার মৃতদেহ দেখতে আসা আত্মী
বন্ধুদের গাড়ির সংখ্যার ঔজ্জ্বল্যে। মৃতের জীবদ্দশায়, যে বাড়িতে কোনো গা
কখনওই থামেনি, মৃত্যুতে সে বাড়ির দরজাতেই গাড়ির লাইন পড়ে যায়। ব্যাপার
একটু বিসদৃশ লাগে জিষ্ণুর চোখে।

"জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল" এ
একটা গান গাইতেন কাকিমা প্রায়ই। গানটার কথা খাটে না এ ক্ষেত্রে তবু গানট
কথা মনে পড়ে গেলো ওর, গাড়ি থেকে নামতে নামতে।

পিপি একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। হালকা নীলরঙা নাইটির উপরে একটা গ
নীল রঙা হাউসকোট পরা ও জিষ্ণুর হাত ধরে ওকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলো
দেখে মনে হলো ঘরটা কোনো শিশুর খেলার এবং শোওয়ার ঘর।

"এই ঘরে ?"

"এই ঘরেই।"

"কেন এমন হলো ?"

"স্যার ডিভোর্সের রায় পেয়েছি কাল। জজ সাহেব ডিভোর্স দিয়েছেন, এ
মেয়ের মালিকানাও আমাকে দিয়েছেন। আমার উকিল খুবই ভালো ছিলেন

"মেয়ে কোথায় ?"

"মেয়ে ?"

বলেই, পিপি একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

চেয়ারে বসা ওসি বললেন, "মেয়েকে আগে খাইয়ে তারপর নিজে খেয়েছে
মেয়েকে বুকে জড়ানো অবস্থাতেই ডেড বডি দেখি আমরা।"

"কী ? কী খেয়েছিলেন ?"

জিষ্ণুর গলাটা শুকিয়ে এলো।

"হেভী ওভারডোজ অফ স্লীপিং পিলস। মানে, আমরা তাই সন্দেহ কর
রোজই নাকি উনি খেতেন। ড্রিঙ্ক করার পরও। তবে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে

"ব্যাপারটা একটু শর্টকার্ট করা যায় না ?"

"কমপ্লিকেটেড কেস। ডিভোর্সের মামলা চলছিলো। মেয়েকে কে পাবে
নিয়েও।"

পিপি ওর শোবার ঘরে এসে আমাকে বললো, "আমিই ডিভোর্স চেয়েছি
মেয়েকেও আমিই চেয়েছিলাম। সুমন্ত্র তো প্রথমে বিশ্বাসই করেনি। আমি
বললেও করেনি। বলেছিলো, "তুমি ছাড়া বাঁচলেও বাঁচতে পারি কিন্তু তিতি
বাঁচবো না। তুমি আমার এমন সর্বনাশ কেন করবে ? আমি তো তোমার ে

তি কবিনি, কোনো কিছুতেই বাধা দিইনি ।”

বলেই, আবাব ভেঙে পডলো কান্নায় ।

“ফোনটা কোথায় ?”

“ঐ তো ।”

জিষ্ণু হীবাকাকাকে ফোন কবলো পুলিশে হীরুকাকাব যে বন্ধু আছেন তাঁকে নতে । প্রিয় মেয়ে তিতিকে বুকে জডিযে ধবে ঘুমিযে ছিলো সুমন্ত্র । দুটি শবীবই ঠা হযে গেছিলো । মেযেকে বাবাব বুক থেকে ছাডানো যাচ্ছিলো না নাকি । ওসি নছেন স্লীপিং ট্যাবলেটস । পিপিও তাই বলছে । বোজ বাতেই খেতো ড্রিঙ্কস-এব বও ।

নম্বরটা পেতে সব বললো জিষ্ণু হীরুকাকাকে ।

তাবপব বললো, “কাকিমাকে একটু পাঠিয়ে দেবে হীরুকাকা এখানে ? আমি পৌঁছে দেব । মনে হচ্ছে পিপিব আত্মীয়-স্বজন কেউই নেই । প্রতিবেশিনী ছেন অবশ্য দু-একজন ।”

হীরুকাকা একটু চুপ কবে থেকে বললেন, “আমিই হেমকে পৌঁছে দিয়ে আসছি । এতটুকু মেয়েব আব কেউ কেউ নেই কেন ? আপনজনদেব সুখেব দিনে কাছে বাখলে দুখেব দিনেও কেউই থাকে না ।”

তাবপব বললো, “ছেডে দিচ্ছি । আসছো তাহলে । তোমাব বন্ধুকে ফোনটা বই তাবপব বেবিও । আমি মর্গে যাচ্ছি ।”

ফোনটা বেখে পিপিকে বললো, “কাজ কববেন কদিনে ? চোদ্দ দিনে ?”

“কাজ কবাব তো কেউ নেই স্যাব । কাজ কে কববে ?”

“ছুটি কদিনেব নেবেন ? অফিসে ?”

“ছুটি ? ছুটি দিযে কী কবব ? কালই অফিসে যাবো আমি । বাডিই বইলো । এ ফাঁকা বাডিতে একা থেকে কী কবব ?”

‘কালই ?”

“ইয়েস স্যাব ”

“আমি তাহলে মর্গেব দিকে এগোই ”

অন্যমনস্ক গলায় বললো জিষ্ণু ।

পিপি মাথা হেলালো ।

মর্গ-এব দিকে অফিসেব ভিডেব মধ্যে শামুকেব গতিতে এগোচ্ছিলো গাডি । ও ভাবছিলো, সত্যিই একজন মানুষও বোধহয় পবিপূর্ণ সুখী নয় এখানে । সুখী দেয় না এই শহব । বড নিষ্ঠুব, ইট কাঠ পাথবেব কংক্রিটেব পাহাড়ে ভবে এই কলকাতা ।

জিষ্ণু পৌঁছনোব আগেই হীরুকাকাব বন্ধু মর্গ এ ফোন কবে দিয়েছিলেন ।

কেসেও মার্ডারের কোনো গন্ধ ছিল না। তবু পোস্টমর্টেম তো করতে হলোই। ম
থেকে বেরিয়ে সুমন্ত্রর ছোট ভাই জয়ন্ত, হীরুকাকা এবং জিষ্ণুও ডেডবডি দুটো নি
সোজাই শ্মশানে এসেছিল। অফিসের কেউ কেউ, জিষ্ণুর যে আর্দালী, পিপিরই বল
গেলে, সে, একজন টেলিফোন অপারেটার, এবং আর. এম. নিজে এসেছিলেন
আশ্চর্য হলো সেনগুপ্তদাকে না দেখে। পিপির মেয়েটি তিতি, ভারী সুন্দরী এক
পিংক ফ্রক পরেছিলো। ফুলের মতো দেখাচ্ছিল তোকে।

পিপিও শ্মশানে এসেছিলো। গাড়িতেই বসেছিলো, কাকিমার সঙ্গে। যখন ট
এলো তখন ওকে ডাকা হলো। যদি শেষ দেখা দেখতে চায়। পিপি বললো ম
না ওখানে। স্বামী অথবা মেয়ে কাউকেই সে দেখতে চায় না। সুমন্ত্রর ভাই জয়
মুখে আগুন দিল।

ইলেকট্রিক ফার্নেসের দরজা খোলা হলো। লাল হয়ে গেলো জায়গাট
উত্তাপ এবং লালিমার ছোপ লাগলো গায়ে মুখে। তাপ। সুমন্ত্র এবং তার মে
একটি বড় এবং একটি ছোট বাঁশের চালিতে নতুন চাদরের উপর শুয়ে ডোমেদে
এক ধাক্কায় যখন আগুনের মধ্যে চলে গেলো তার পরমুহূর্তে জিষ্ণু অপরিচি
সুমন্ত্রর মুখে যেন এক চিলতে হাসি দেখতে পেলো। মনে হলো, সুমন্ত্র যে
বলছে : "রেস-এ চিরদিন হারলে কী হয়, রেস-এ কেমন জিতে গেলাম, পি
দেখেছো ?"

শ্মশান থেকে পিপিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কাকিমা জিষ্ণুকে
বললেন, "ওর তো কেউই নেই দেখছি, আমিই থাকি ওর কাছে একটা দিন ?"

জিষ্ণু বললো, "থেকে কী করবে ? ও তো বলছে অফিস করবে ক
থেকে।"

"সে কী রে ? বলিস কী ?"

"এবারে পুজোতে গোয়া যাবার জন্যে ছুটি নিচ্ছে সেটা কমাতে চায় না
বলছিলো আমাকে।"

"কী যে বলিস তুই ? আজকালকার মেয়েদের রকম-সকমও আলাদা। বু
না ওদের।"

হীরুকাকা বললেন, "ওরা অন্যরকম। সন্দেহ নেই। তা বলে ওরা যে খারা
সে কথা বলা যায় না।"

"স্বামী-স্ত্রী কি এক ঘরে শুতো না। মনে তো তেমনই হলো।"

হেম বললেন, কৌতূহলী গলায়।

"শুতো না বলেই তো মনে হলো।"

জিষ্ণু বললো।

"তবে কি ওদের মধ্যে ভালোবাসা ......"

হীরুকাকা বললেন, "ভালোবাসা কি দেখা যায়? না, তা দেখানোর জিনিস

"এবার গাড়িটা একটু থামাতে বলো। মুখটা শুকিয়ে গেছে। পান খাব জর্দা দিয়ে।" হীরাকাকা বললেন। "কত কিছুই দেখতে হলো এক জীবনে।"

"তুমি বসো। বসন্তই নিয়ে আসবে পান।"

"তা ভালোই। ঠাণ্ডা গাড়িতে একবার উঠে বসলে আর নামতে ইচ্ছে করে না।"

"তোমাদের দুজনকেই একটা করে দেড়টনের এয়ার কণ্ডিশানার কিনে তোমাদের দুজনের বেডরুমে লাগিয়ে দেবো। হীরুকাকার বাড়িতে তো দরকারই। তাছাড়া তোমাদেরই তো আরাম করার সময় এখন।"

"পাগল হয়েছিস তুই?" হীরুকাকা বললেন। "এমনিতেই অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ঠেলায় বাঁচি না আবার এয়ার কণ্ডিশানার! সব কিছুরই সুসময় থাকেরে বেটা। সময় চলে গেলে কোনো কিছুরই দাম থাকে না আর। এই দ্যাখ, তোদের ঐ পিপির খুকি। সুমন্ত্র তো মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে সময় থাকতে থাকতেই চলে গেলো।"

হেম বললেন, "কে বলতে পারে? ওর হয়তো সময় হয়েছিলো। কখন যে কার সময় আর কার অসময় তা বলা ভারী মুশকিল। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভাবতেও পারছি না যে পিপি কাল থেকে অফিস করবে।"

"করবে। কাজের মতো বন্ধু আর নেই। কাজ সব ভুলিয়ে দেয়। তা ছাড়া এখন থেকে ওর অফিসই তো সব হবে। যতক্ষণ যে মানুষ থাকে তার দাম তো বোঝা যায় না। অতি সস্তা বলে মনে হয়। চলে যাবার পরই বুঝিয়ে দিয়ে যায় তার দাম কতো ছিলো।" সুমন্ত্রর কথা। মেয়ের কথাও। সকলের কথাই।

"তোমরা তো খাওয়াদাওয়াও করোনি সারা দিন! তোমাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমি একটু অফিসে যাবো।"

"এই অসময়ে? সারাদিন তো খাওয়াও হলো না তোর।"

"অফিসের ধারে-কাছেই খেয়ে নেবো কিছু। তবে আজ খাবার ইচ্ছে নেই।"

গলি থেকে বেরিয়ে জিষ্ণু ভাবলো, অফিসে না গিয়ে তারিণীবাবুর বাড়িতেই যায়। এরকম ওর কখনই হয়নি আগে। পুষির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেও নয়। মামণি নামক মেয়েটি যেন ওকে একেবারেই পেয়ে বসেছে। অথচ তাকে কতটুকুই বা দেখেছে জিষ্ণু? এক ঝলকেরই ব্যাপার।

হঠাৎ কী মনে করে জিষ্ণু বললো, "বসন্ত, অফিসই চলো। বুঝলে!"

তারিণীবাবুর বাড়ি এমনিতেই যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। মাস ঘুরে এলো প্রায়। ভাবলো, এক শনিবার, ছুটির দিনে যাবে। এই শনিবার রাতে পরী ফিরবে ব্যাঙ্গালোর থেকে। বলছে যদি রেস-এ যায়, তবে রবিবার ফিরবে। ওদের কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস কলকাতাতে হলেও আসল অপারেশনস ব্যাঙ্গালোরে। এখানের যে টপম্যান সে ব্যাঙ্গালোরের রেসিডেন্ট। তবে লোক ম্যাঙ্গালোরের। পি. কুরুভিল্লা

দারুণ হ্যানডসাম আর প্র্যাগম্যাটিক মানুষ নাকি সে । শুনেছে, পরীর কাছে । কীন রেস-গোয়ার ।

পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি । অফিসে পৌঁছে ডাকটাক দেখে ও একটি ফাইল নিয়ে বসেছিলো । সলিসিটরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো আজই । যাওয়া হলো না । নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছে ল অফিসারকে । এক কাপ কফির অর্ডার করেছে এমন সময় হঠাৎ পিপি কিছু না বলেই ওর ঘরে ঢুকলো !

পিপি বললো, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার ! আপনি এবং আপনার কাকা-কাকিমা যা করেছেন কেউই করে না তা !"

"আজকে তুমি, আপনি এলেন কেন ?"

"আমার পনেরো হাজার টাকা ভারী দরকার ।"

"কী জন্যে ? শ্রাদ্ধ তো করছেন না ।"

"না । সুমন্ত্রর এক রেস-এর মাঠের বন্ধু টাকা চাইতে এসেছিলো । দশ হাজার । আবারও আসবে । বলেছে, ফর ওল্ড টাইমস সেক । টাকাটা সুমন্ত্র নাকি আজই দেবে বলেছিলো । ওর কাছে নাকি ধার ছিলো । টাকাটা আজ তার চাই-ই । ভদ্রলোকটি সাংঘাতিক ।"

"আপনার বিপদের চেয়েও তার বেশি বিপদ ।"

অবাক হয়ে জিষ্ণু বললো

"আমার চেয়েও ।"

"সুমন্ত্রবাবুর সেই রেসের মাঠের বন্ধুর নাম কী ?"

"পিকলু স্যার । আপনারও বন্ধু ।"

"পিকলু ! সে আপনার স্বামীরও বন্ধু নাকি ? কই আমি তো ...."

"আরও পাঁচ ? সেই পাঁচ দিতে হবে সুমন্ত্রর ভাই জয়ন্তকে । আজই রাতের ট্রেনে ও জামালপুরে চলে যাবে । সেখানে সুমন্ত্রর মা আছেন । জয়ন্তদের তো শ্রাদ্ধ করতে হবে ।"

"কী করে এখানে জয়ন্ত ?"

"ওদের একটা ছিটকাপড়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রিটের কাছে ।"

"আপনাকে পাঁচ হাজার এক্ষুণি দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি । সুমন্ত্রর ভাই জয়ন্তকে দেওয়ার জন্যে । আপনি টাকাটা নিয়ে আমার গাড়ি নিয়েই এক্ষুণি চলে যান আর পিকলুবাবু যদি আপনার কাছে আসেন তো এখুনি তাঁকে এখানে এ গাড়িতেই আমার কাছে ফেরত পাঠান । ওঁকে আমি নিজে টাকা দেবো ।"

ইন্টারকম-এ সুব্রহ্মনিয়মকে ডাকলো জিষ্ণু ।

বললো, "একটা আই. ও. ইউ । আমার নামে ভাউচার করে পাঁচ হাজার টাকা এক্ষুণি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন ।"

"কিছু খাবেন পিপি ?"

"নাঃ ।"

"একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক ?"

"না স্যার । একটু জল খাবো ।"

জিষ্ণু নিজে উঠে নিজের গ্লাস নিয়ে গিয়ে করিডরের ওয়াটার কুলার থেকে জল নিয়ে এসে দিলো পিপিকে । যদিও বেয়ারা ছিলো এবং তাকে স্বচ্ছন্দেই ডাকতে পারতো । আজ একটি বিশেষ দিন । পিপির জন্যে যে ও দুঃখিত সেটা বোঝালো ।

তৃপ্তি করে জলটা খেলো পিপি ।

সুব্রহ্মনিয়ম নিজেই এলো ভাউচার সই করাতে ।

জিষ্ণু বললো, "কাল আমি আর. এম.-এর সঙ্গে কথা বলব যাতে মিসেস সেনকে এগ্রাসিয়া কিছু দেওয়া যায় । আফটার অল ওঁর স্বামী তো আর টাইমলি মারা যাননি । বড়ই বিপদে পড়েছেন মহিলা ।"

"ও. কে স্যার ।"

বলে, সুব্রহ্মনিয়ম ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ।

"আমি এবার চলি ।"

"যাওয়া নেই । আসুন ।"

ঠাকুমা-দিদিমারা যেমন করে বলেন, তেমন করে বললো জিষ্ণু ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিপি বললো, "স্যার, ঊ্য আর ভেরী ভেরী কাইণ্ড নডিড । আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন আজ । কোনোদিনও ভুলবো না জীবনে ।"

জিষ্ণু ঘর ছেড়ে গাড়ি অবধি এলো দরজা খুলে উঠিয়ে দিলো পিপিকে । ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওকে একটি অতি সস্তা কালো পাড়ের কালো আঁচলার তাঁতের শাড়িতে । চান করে এসেছে । সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে সব শোনার পর থেকে পিপির সম্বন্ধে ওর দিকে ভালো করে তাকাবার কোনো ইচ্ছাই হয়নি জিষ্ণুর । আজই প্রথম ভালো করে তাকালো ওর দিকে ।

মেয়েটার চোখে তো কোনো পাপ নেই ! কে জানে, পাপীদের পাপ কোথায় থাকে ?

অফিসে ফিরে নিজের জিনিস গোছগাছ করে নিলো । আজকে একটু হাঁটা দরকার । মাথাটা ছাড়বে । সুমন্ত্র সেই লালরঙা স্লিপিং পাজামা, আর বোতামহীন নোংরা আদ্দির পাঞ্জাবি আর রাবারের চটি পরে যে লাল সিমেন্টে বাঁধানো সিঁড়ির উপরে পা ছড়িয়ে বসে রেসের বই দেখছিলো সেই ছবিটি জিষ্ণুর চোখে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে রয়েছে । কিছু কিছু অনাত্মীয়র, অতি সাধারণ ঘটনার ছবিও এমনি করে রয়ে যায় মাথার ভেতরে । আমৃত্যু । যেমন আছে, শিববাবুর দোকানের সামনে হেঁটে আসা মামণির ছবিটি । সকাল থেকে রাতে কত কী-ই তো দেখে রোজ । কিন্তু সে সব ছবির খুব কমই থেকে যায় ।

জিষ্ণু আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলো। ও জানতো যে পিকলু আসবে না। যে-মানুষ এমন সর্বনাশের দিনে কোনো অনাত্মীয় যুবতীর কাছে মিথ্যে ধারের দাবী নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে সে আর মানুষ নেই। ও অনুমান করতে চেষ্টা করছিলো সুমন্ত্রর সঙ্গে পিকলুর যোগাযোগের কথা জেনে যে ; ঠিক কতখানি অধঃপতন হয়ে থাকতে পারে পিকলুর। পিপির সঙ্গেও কি ওর ...... ? মিনিবাসের ভোঁতকা ড্রাইভারের মতোই পিকলুকেও বোধহয় এই পৃথিবী থেকে ডিসপোজ-অফ করে দেওয়া দরকার পিকলু যদি আজ সত্যিই আসে তবে পিকলুর কপালে দুঃখ আছে। জিষ্ণু বড়ই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সহ্যশক্তি আর নেই ওর।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ও টেলেক্স মেসেজগুলো দেখে তিনটি ইম্পর্ট্যান্ট টেলেক্সের উত্তর পাঠিয়ে ব্রিফকেস হাতে করে বেরুলো। ও যেই অফিস কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়েছে দেখে বসন্ত ফিরছে গাড়ি নিয়ে। পিকলু পেছনের সীটে বসে।

পিকলু দরজা খুলে নেমে বললো, "হাই।"

জিষ্ণু একটু অবাক হলো।

বললো, "কী রে !"

পিকলু বললো, "উ্য আর গ্রেট ! টাকাটা জলেই চলে যাচ্ছিলো। ভাগ্যিস তুই ছিলি মধ্যে। আমি জানতুম যে পিপির সঙ্গে তোর বেশ একটা ভালো রিলেশন .... অবশ্য এও জানতুম যে সেটাই শেষ পর্যন্ত বাঁচাবে আমাকে।

ড্রাইভার বসন্তকে ছেড়ে দিয়ে জিষ্ণু বললো, "চল এগোই।"

"টাকাটা ?"

"আমার ব্রিফকেস-এ আছে।"

"ফাইন।"

"তুই কি ড্রিঙ্ক করেছিস, পিকলু ? গন্ধ পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ। একটু। কেন ? ড্রিঙ্ক করা কি অপরাধের ? দ্যাখ, প্রথম তো এই প্রায় ব্যাড-ডেট হওয়া টাকাটা ফিরে পাবার আনন্দ। তার উপর আজ শিশির মঞ্চে একটা কবি সম্মেলন আছে। আমি কবিতা পাঠ করবো সেখানে। একটু খেয়ে না গেলে পা না-টললে লোকে শালা আজকাল কবি বলে মানতেই চায় না। পাবলিক-এর বড়ই অবনতি হয়েছে।"

"তোর কবিতার নাম কী ?"

"জিষ্ণু।"

"বাঃ। আমার শ্রাদ্ধ করেছিস তাহলে ?"

"অবিমিশ্র শ্রাদ্ধ নয়। তবে তোকে নিয়েই লেখা। গুণাবলীও আছে কিছু।"

কথা ঘুরিয়ে জিষ্ণু বললো, "তোর খুকি কী করছে রে ?"

"অনেক খুকিরাই যা করে। ইজের পরে ক্যারাম খেলছে। লুডো খেলছে। কিশলয় পড়ছে বড় হলে পাড়ার লোকের দেওয়া আইসক্রিম খাবে।"

"থাম তুই।"

জিষ্ণু ধমক দিয়ে বললো।

তারপর বললো, "চল, ট্যাক্সি নিয়ে তোকে শিশির মঞ্চে পৌঁছে দিই।"

"গ্রেট। তা পিপিকে কতদিন কেপ্ট রেখেছিস? আমি শুনলাম তোরই প্ররোচনাতে ও ডির্ভোস চেয়েছিলো।"

"তোকে কে বললো?"

"জানি রে জানি। সব জানি।"

"মুখ সামলে কথা বল।"

"তা তুইও তো কাজ-কর্ম সামলে করলেই পারতিস।"

"দ্যাখ পিকলু, আমার ক্যারাকটার-অ্যাসাসিনেট করে তোর লাভ হবে না কোনো।"

"চরিত্র বলে কিছু আছে এখনও তোর? নিজের বোন, সেক্রেটারি কাউকেই তো ছাড়িস না।"

"পিকলু, তুই আমার কাছে মার খাবি আজ।"

"মারটা নিছকই জান্তব শক্তির ব্যাপার। কবি মারকে ভয় পায় না। মানে, যদি দুনম্বরী কবি না হয়।"

"তোকে একটা কথা বলছি, তুই কোনোদিনও আর পিপির কাছে গিয়ে তাকে বিরক্ত করবি না।"

"কেন? তোর রাঁড় বলে?"

"পিকলু, তোকে আমি সাবধান করছি।"

"চুপ কর। তোকে আমি থোড়াই ভয় পাই।"

"ভয় পাবি, যদি কথা না শুনিস। তোকে আমি জেলে ভরবো, স্কাউন্ড্রেল সুইণ্ডলার।"

"পুষিকে যে মিনিবাসের ড্রাইভার মেরে ফেললো তাকেই জেলে ভরতে পারলি না তার আমাকে! ও সব বড় বড় কথা আমাকে বলিস না। আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। জ্যোতিবাবুর অভয়ারণ্যে আমার বাস।"

বলেই যাত্রার নায়কের মতো হাসলো, হাঃ! হাঃ!

"তোকে আমি খুন করে ফেলব পিকলু।"

"কর না। জেলে যাবি। খুসিকেই তুই মেরে ফেললি। আমার আর কোনো ভয় নেই।"

"আমি খুসিকে মেরে ফেললাম?"

"না তো কি?"

"পরগাছা, আত্মসম্মানহীন জানোয়ার!"

"টাকাটা দে। ট্যাক্সি থেকে আমি নেমে যাই।"

"তুই আমার অনেক টাকা মেরেছিস তঞ্চক। তোকে আর এক পয়সাও দেবো না। আমার টাকা কি হারামের টাকা? কষ্ট করে রোজগার করতে হয় না তা?"

"ছাড়। ওসব বক্তৃতা অন্যকে দিস। সুমন্ত্রর কাছ থেকে পাওনা টাকা তুই দিবি না তো কে দেবে?"

"তোকে আমি এক পয়সাও দেবো না।"

পিকলু একদৃষ্টে চেয়ে রইলো জিষ্ণুর মুখের দিকে।

তারপর হঠাৎ বললো, "তাহলে মাল খাওয়া। চারটে খেয়ে এসেছি। আমার আরও খেতে ইচ্ছে করছে।"

"ঠিক আছে। অলিম্পিয়ায় চল।"

"চল।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অলিম্পিয়ায় ঢুকলো ওরা।

"কী খাবি?"

"ডিরেকটরস স্পেশ্যাল খাচ্ছিলাম। তাই খাবো। হুইস্কী।"

"খা।"

"তুই?"

"আমিও খাবো।"

"তুই কী খাবি?"

"রাম।"

"কাটলেট খাওয়াবি না? অলিম্পিয়ার কাটলেট-এর জবাব নেই।"

"খা।"

অলিম্পিয়া থেকে যখন ওরা বেরুলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। পিকলু প্রায় আউট হয়ে গেছে। জিষ্ণুও অল্পসময়ের মধ্যে চারটে খেয়ে "হাই" হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি নিলো একটা।

জিষ্ণু বললো, "তুই শিশির মঞ্চে আজ আর যাস না। বরং আগে চল। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে একটু হাঁটি। মাথাটা ভারী হয়ে গেছে।"

পিকলু বললো, "বাঃ। বেশ পুরোনো দিনের মতো। কী বল? ভালোই বলেছিস। শিশির মঞ্চে না গেলেও হয়। কী হবে গিয়ে? ধ্যুসস ....! যত জালি কবিদের ভীড়! ভোগলা-দেওয়া আবৃত্তি!"

ট্যাক্সিটা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনের গেট ছেড়ে দিয়ে ওরা নামলো।

জিষ্ণু বললো, "চল। ঐ দিকে চল। নির্জন আছে।"

"চল। তুই আমার ন্যাংটোপোঁদের বন্ধু। তুই শালা যে কোনো গর্তে যেতে বলবি যাবো।"

জায়গাটা বেশ নির্জন। মিনিবাসের ড্রাইভার ভোঁতকা যেখানে গুলি খেয়েছিলো তার চেয়েও।.

জিষ্ণুর মাথার মধ্যে ভূতটা বললো ।

জিষ্ণু বললো, "রিল্যাক্স কর । তুই খুব পেন্ট-আপ হয়ে গেছিস ।"

"তুই শালা কমার্শিয়াল ফার্মে কাজ করে ইঞ্জিরিটা পর্যন্ত ভুলে গেছিস । ইংরিজি অবশ্য শিখেছিলি আমার কাছ থেকেই ।"

"হয়তো তাই । গাছে হেলান দিয়ে বোস ।"

"ঠিক বলেছিস । কিন্তু আমার কবিতা ! আমার নম্বর ছিলো লিস্টে তেইশ নম্বর । আজকাল কবিরা যূথবদ্ধ হয়ে গেছে । দলে না থাকলেই ওরা একা পেয়ে আমাকে শেষ করে দেবে ।"

"চুপ কর । যূথ হয়, গোষ্ঠী হয়, জানোয়ার আর ইতর মানুষদের । কবি চিরদিনই একা । একা ছিলো । একা থাকবে ।"

"আমি যাই ...."

"বাইশজন পড়বেন । তবে না তেইশ ।"

"রাইট । ঘুম পাচ্ছে একটু ! কিন্তু আমার টাকাটা ?"

পিকলু বললো ।

"মোটা টাকা পাবার আগে সকলেরই আরামে ঘুম পায় । কটা খেয়ে এসেছিলি আমার কাছে আসার আগে ?"

"চারটে ।"

"তাহলে আটটা খেয়েছিস সবসুদ্ধ ।"

"হ্যাঁ ।"

জিষ্ণু নিজের গলার টাইটা খুলে পিকলুর গলায় পরিয়ে দিয়ে খেলাচ্ছলে একটা ফাঁস লাগালো । গাছে হেলান দিয়ে শুয়েছিলো পিকলু ।

"কী করছিস ?"

"টাইটা তোকে দেবো ।"

"আহা ! মাঝে মাঝে এমন প্রাপ্তিযোগের দিন আসে । কিন্তু টাকাটা ?"

"টাকাটাও দেবো ।"

টাইয়ের নটটা ঠিকমতো বসতেই জিষ্ণুর যেন কী হয়ে গেলো । পুষির মৃত্যু, পরীর পাগলামি, পিকলুর তঞ্চকতা, মামণির মুখ এবং পিপির অসহায়তা সব মিলে মিশে গিয়ে ওর দুটি হাতে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন জোর জোগালো, আর মাথায় জিঘাংসার আগুন । ওর ব্রিফকেসটা পিকলুর পেটের কাছে রেখে তার উপর নিজের দু পা তুলে জোরে টানলো । জোরে ।

দম-বন্ধ হয়ে গিয়ে পিকলু বললো, "জিষ্ণু আমি কিন্তু শালা মরে যেতে পারি ।"

"একদিন যাবি । সকলেই তো মরবে একদিন ।"

পিকলু একবার উঁক করে আওয়াজ করলো । তারপরই ওর জিভটা বেরিয়ে

আসতো লাগলো ।

জিষ্ণুর, পিপির পিংক-ফ্রক পরা ফুলের মতো মেয়েটির কথা, তিতির কথা মনে হলো। পিকলুর মেয়েটাও কি অমনই সুন্দর ?

মনে হতেই হাত ঢিলে করে দিলো জিষ্ণু । তারপর ছেড়ে দিলো পিকলুকে । যে হাত প্রাণ দান করতে এসেছে এখানে, সে প্রাণ নিতে জানে না ।

অনেকক্ষণ পর গোঙাতে গোঙাতে অবিশ্বাসের গলায় পিকলু বললো, "তুই আমাকে খুন করছিলি ?"

"হ্যাঁ । তুই আমাকে অনেকবার খুন করেছিস । যদিও রক্ত বেরোয়নি বা জিভ বেরিয়ে আসেনি আমার ।"

বিস্ফারিত চোখে পিকলু বললো, "তোর বড্ড বাড় বেড়েছে জিষ্ণু । তোকে আমি খুন করব একদিন ।"

পিকলু গাছতলাতেই পা ছড়িয়ে বসে রইলো । ওর উঠতে সময় লাগবে ।

জিষ্ণু যখন উঠে পড়ে চলে আসছে, পিকলু আবারও বললো, "টাকাটা দিবি না তাহলে ?"

"না । জীবনেও নয় । কোনো টাকাই নয় । তুই আমার সামনে আসিস না কোনোদিন । কোনোদিনও না । তুই আমাকে নষ্ট করে দিয়েছিস, আমার ভালোত্ব, বিশ্বাস, সব । আমি মরলে তুই শ্মশানেও আসিস না । শুনেছিস ?"

"হুঁ ।"

পিকলু বললো । বললো, "তোকে আমি খুন করবোই । দেখিস ।"

জিষ্ণু সার্কুলার রোডে এসে একটি ট্যাক্সি ধরলো । ট্যাক্সি ধরে পিপির বাড়ির ঠিকানা বললো ।

কেন যে, তা ও জানে না । ওর ভয় হলো, পিকলু যদি পিপির কাছে যায় এখন ? একা বাড়িতে আছে । পিপির জন্যে ভয় হলো, অথচ পিপি ওর কেউই নয় । আশ্চর্য !

পিপির বাড়ির সব আলোই প্রায় নিভোনো। অথচ রাত মোটে সাড়ে আটটা। একটি
দু আলো জ্বলছে বেডরুম থেকে।

কলিং বেল টিপলো, লাল সিমেন্টের মেঝের তিন ধাপের উপরের ধাপের
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

একটু পর পিপি নিজেই এসে দরজা খুললো।

বললো, "আপনি, স্যার? কি বলবো, আপনাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম।
আমার বড় ভয় করছে আজ রাতে। একা একা। একা থাকতে।"

জিষ্ণু বললো, "পিপি। আমি ভগবান নই। আমি সুমন্ত্রর চেয়েও খারাপ।
আমি অনেক মদ খেয়ে এসেছি। আমিও একা পিপি। খুব একা। আমারও বড়
ভয় করে।"

পিপি বোধহয় আবারও চান করেছিলো। ভরী গুমোট গরম আজকে। একটু
মধু পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিলো গায়ে।

পিপি বললো, "পিকলুবাবুকে টাকাটা দিলেন?"

"না। দিইনি। দেবো না। আমি খুন করবো ওকে।"

তারপরই লজ্জিত হয়ে বললো, "আমি মাতাল হয়ে গেছি পিপি। আমি
এখন ... তোমার মানে, আপনার, তোমার এখন বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাকে
বিশ্বাস ..."

"কী করব? বিশ্বাস কাউকেই না করে যে বাঁচাও যায় না।"

"একটু জল খাবো।"

"পাখাটার নিচে বসুন। এনে দিচ্ছি।"

জল খেয়ে জিষ্ণু বললো, "তুমি সারা রাত একা থাকবে। সরী আপনাকে তুমি
বলছি। নেশা হয়ে গেছে আমার।"

"তুমিই বলবেন। কেন বলবেন না! না। সারারাত একা থাকবো না। একটু
পরেই পারুলদি আসবেন দোতলা থেকে। আমিই তো ইনডায়রেক্টলি খুন করেছি

সুমন্ত্র ও তিতিকে। পাড়ার লোকে কেউ তো আমাকে ভালো বলেননি। বলবেন না। পারুলদির স্বামীও আত্মহত্যা করে মারা গেছিলেন পাঁচ বছর আগে। অ একটি মেয়েকে ভালোবেসে।

পারুলদি একটু আগেই বলছিলেন, আত্মহত্যা করে ভীরুরা।"

"তাই ? কে জানে ?"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "আমি কি কাকিমাকে নিয়ে এসে তোমার কা রেখে যাবো।"

"না না। আমি আজ পারুলদির সঙ্গেই থাকবো। আমার ঘুম তো হবে না তিতি সুমন্ত্র ওদের সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।"

বলেই বললো, "চমৎকার মহিলা কিন্তু আপনার কাকিমা।"

পাশের ঘর থেকে ফুল, এবং ধূপের গন্ধ আসছিলো।

পিপি বললো, "পারুলদি আসা অবধি থাকুন। তাহলেই হবে।"

"ঠিক আছে।"

"আপনাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। কখনও সুযোগ পাইনি। সেনগু সাহেব বহুদিন ধরেই আমার নামে সকলকেই যা -তা বলে বেরিয়েছেন। প্রতিব করব কার কাছে ? কেউ তো জিজ্ঞেস করেনি আমাকে কোনোদিন কিছু। ঐ মানুষ আপনার বন্ধু পিকলু আর স্বামী সুমন্ত্র — তিনজনে মিলে আমাকে তাদের নানা কাজে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইতো। তাই নিয়েই তো ...। সে সব অনেক কথা আপনাকে বলব সব। মানুষ যখন অমানুষ হয়ে যায় তখন জানোয়ারও তার চে ভালো। তাই নিয়েই ডিভোর্স। তিতি কোনোদিনই ওর কাছে শুতো না। ও ভয় পেতো তিতি। ও মারতো তিতিকে মদ খেয়ে। গতরাতে অনেক অনুনয়-বি করলো। ভাবলাম, ডিভোর্স পেয়েছি, তিতিকেও আমিই পাবো। ও না হয় পেলে এক রাতের জন্যে। কেন যে...."

এমন সময় বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। কলিং বেল বাজলো।

জিষ্ণু বললো, "পারুলদি ?"

"পারুলদি তো দোতলা থেকে আসবেন।"

বলেই, দরজা খুলেই পিপি একটি ভয়ার্ত শব্দ করেই চুপ করে গেলো।

পিকলুর গলা। জিষ্ণু শুনলো, পিকলু বলছে, "এই টাইটা জিষ্ণু আমা দিয়েছে। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আজ।"

একটি গোঙানির মতো আওয়াজ ভেসে এলো।

জিষ্ণু দৌড়ে গিয়ে পিকলুর কলার ধরে ওকে ঘরের মধ্যে টেনে আনলো। জি টাইটা পিপির গলায় চেপে বসেছিলো। পিকলুকে ঘরে টেনে এনে দেওয়ালে ঠে ধরলো।

পিকলু বললো, "তোর সময় হয়ে এসেছে রে জিষ্ণু । তোর পিপিকে আর তোকে একসঙ্গেই উপরে পাঠাবো । তুই চিনিস না আমাকে !"

পিকলুকে ছেড়ে দিয়ে জিষ্ণু বললো, "বাড়ি যা এখন তুই । গত পঁচিশ বছরে য তোকে চিনতাম, সে তুইও এই নোস । তুইও চিনিস না আমাকে ।"

পিকলু উঠে পড়ে বললো, "ঠিক আছে । আজ যাচ্ছি ।"

"বলেই, মাটিতে পড়ে-থাকা টাইটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ।

যাবার সময় বললো, "আমার নাম পিকলু । তোরা মনে রাখিস ।"

মানসিকভাবে বিধ্বস্ত জিষ্ণু বললো, "ওর স্ত্রী খুসি ক্যানসারে মারা গেছে । তারপর থেকেই বোধহয় ওর এমন মাথার .... ।" তারপর গভীর অনুশোচনা ও দুঃখের গলায় বললো, "বড় কষ্ট হয় । দীর্ঘদিন ওই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলো এ কথা ভাবলে ।"

পিপি বললো, "খুসিদি মারা গেছে এ কথা আপনাকে কে বললো ? মারা গেছে না ছাই ! খুসিদিকে পাগল বানিয়ে তো রাঁচীতে পাঠিয়ে দিয়েছে । খুসিদির বাপের বাড়ির অনেক জমিজমা ছিলো । খুসিদির বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সাক্সেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী খুসিদির নামে উকিলকে দিয়ে সব দাবীদাওয়া আদায় করিয়ে নিয়ে তারপর খুসিদির সব কিছু সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে তাকে পাগল বানিয়ে রাঁচীতে পাঠিয়ে দিয়েছে । এই পাগল বানাবার জন্যেও একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে হাত করে ঘুষ দিয়েছিলো । আর আমার স্বামী সুমন্ত্রই পিকলুবাবুকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিলো । আমি সব জানি । এমনকি খুসিদিকে রাঁচীতে পাঠাবার আগে ওদের মেয়েটাকে পর্যন্ত বিষ খাইয়েও মেরেছে । আমি সব জানি ।"

"কী বলছো কি পিপি ? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।"

প্রায় ভেঙে-পড়া গলায় জিষ্ণু বললো ।

"মাথা আমার কারাপ হয়নি । তবে মাঝে মাঝে মনে হয় যে, হয়ে যাবে । আপনি আমার অবস্থাটা অনুমানও করতে পারবেন না স্যার । একজন মহিলার স্বামী এবং মেয়ে চলে গেছে চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, অথচ যে স্বামীর শোকে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পারছে না । এমন কি ফুলের মতো মেয়ের জন্যে যে শোক করবে তাও পারছে না ।"

"স্যার নয়, জিষ্ণুদা বলো । এতো সব কথা তুমি আগে বলোনি কেন ? বলো পিপি, তুমি এতো সব যে জানতে, তা আগে বলোনি কেন আমাকে ? তুমি কাজের জন্যে হলেও তো দিনে আমার সঙ্গে প্রতিদিন দশঘণ্টা কাটাতে ।"

"কী করে বলব ? সময় আর সুযোগ না হলে বলি কী করে ? আপনি যদি বিশ্বাস না করতেন আমাকে তাহলে তো আমার চাকরিটাই যেতো । পিকলুবাবু তো আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন । চাকরিটা যে আমার কত দরকার জিষ্ণুদা । চাকরিটা চলে গেলে তিতিকে নিয়ে আমাকেই আত্মহত্যা করতে হত ।"

"বড় দেবী হয়ে গেলো পিপি । সব কিছুরই । বড়ই দেরী হয়ে গেলো ।'
জিষ্ণু বললো ।
"জানেন ! সেদিন পিকলুবাবু আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন । অথচ চিঠিখানা জন্যে আপনি আমাকেই বকেছিলেন । কিন্তু উনি বলেছিলেন, উনি যা বলছেন ত না করলে বিপদ হয়ে যাবে । বিপদের কমই বা কি হল বলুন ? এরকম বিপদে ভয় সুমন্ত্র, সেনগুপ্তসাহেব এবং পিকলুবাবু আমাকে প্রায়ই দেখাতেন । বলতে আরব-শেখদের কাছে বিক্রি করে দেবেন ।"
জিষ্ণু ভাবছিলো, ভিক্টোরিয়াতে পিকলুর গলায় লাগানো টাইয়ের ফাঁসটা আল করা উচিত হয়নি ওর । ওখানেই বদমাইশটাকে শেষ করে দিলে ভালো হতো
পিপিকে শুধোলো, "তুমি পুলিশে খবর দাওনি কেন ?"
"পুলিশ ?"
বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও ।
"আমাকে জানাওনি কেন ? আমার জানাশোনা ছিল ওপরে । অবশ্য হীরুকাকা সূত্রে । অবশ্য জানাশোনা থেকেই বা কী হলো ? আমার ফিঁয়াসে পুষিকে যে-মিনিবা ড্রাইভার চাপা দিয়ে মেরে ফেললো তারই তো জেল হলো না আজ অবধি ।"
পিপি বললো, "সেটা অন্য ব্যাপার । আইনের বিচারে সময় তো লাগেই । তো কাজীর বিচার নয় । সেটা একটা কেস্-এর ব্যাপার । কিন্তু এগুলো ? দিনে পর দিন এই ভয়ের মধ্যে দিন কাটানো ? আসলে আমি কাউকেই কিছু বলতে পারতা না তিতির মুখ চেয়েই । সুমন্ত্র একদিন বলেছিলো, ওর অনেক টাকার দরকা তিতিকেও ও আরব-শেখের কাছে বিক্রি করে দেবে । এক লাখ দাম পেয়েছে বম্বেতে ওর কনট্যাক্ট আছে । আমি ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতাম । সুমন্ত্র আর পিকলুব মিলে সব কিছুই করতে পারতো । ওদের অসাধ্য কিছুই নেই । দেখলেন তো তিতি কেমন করে নিয়ে গেলো আমার কাছ থেকে । বেচারী তিতি !"
বলেই, ডুকরে কেঁদে উঠলো পিপি ।
"আমি ভাবছি, গুণ্ডা-বদমাইশই যদি হবে তবে সুমন্ত্র নিজে আত্মহত্যা করে কেন ? অমন মানুষরা তো সচরাচর আত্মহত্যা করে না । আত্মহত্যা করে অন্তর্মু গভীর অথচ খুব সেনসিটিভ মানুষেরা ।"
"উপায় ছিলো না । ডিভোর্স-এর মামলার রায় বেরুনোটা একটা ছুতো মাত্র ও আর পিকলু আর সেনগুপ্ত সাহেব মিলে কোনো একটা খুব বড় গোলমাল করেছি শিগগিরই, যে জন্যে একসাইজ ও কাস্টমস্-এর লোকেরা ওদের খুঁজছিলো । ব্যাপার ঠিক কি তা আমি জানি না । ড্রাগ-টাগ্-এর ব্যাপারও হতে পারে । ডিটেকটি ডিপার্টমেণ্টের লোকেরাও এসে একদিন আমার অফিসে খোঁজখবর করে গেছিলো আমার মনে হয়, ওরা তিনজনেই একটা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো । ভী ভয় ।"

হঠাৎ পিপি একবার ওঘরে গেলো। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে বললো, "তিতি রোজ ঠিক এই সময়ে খেতো। ভোরবেলা স্কুলে যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতাম। আর কোনোদিন ...."

জিষ্ণুর কণ্ঠার কাছে একটা ব্যথা ঠেলে এলো। ওর এই দোষ। পরের ব্যথাকে পরের ব্যথা করেই রাখতে পারে না। পৃথিবীর সব ব্যথা, সব মানুষের ব্যথা, হীরুকাকার ব্যথা, কাকিমার ব্যথা, পরীর ব্যথা, তারিণীবাবুর ব্যথা, মামণির ব্যথা, আর এখন পিপির ব্যথাও ওর বুকের মধ্যে জায়গা করে নিলো। পিকলুর কথা মনে পড়লো : "আজকাল সেন্টিমেন্টের দিন নয়, টানটান গদ্যর দিন। তুই বড় সেন্টিমেন্টাল। তহি মানুষটা যেমন, তোর লেখাও তেমন, ম্যাদামারা। তোর লেখা কেউই পড়বে না।"

জিষ্ণু ভাবছিলো, পিপির জলভরা মুখেব দিকে তাকিয়ে যে, লেখালেখি ছেড়েই দেবে। লেখালেখি করে নাম করার চেয়ে অন্যর ব্যথার ভাগীদার হতে পারাটা অনেকই বড় ব্যাপার। অনেকে তো ইচ্ছে থাকলেও হতে পারে না। ওই বা কতদিন পারবে ? এই কলকাতায় ?

জিষ্ণু একবার ঘড়ির দিকে তাকালো।

"আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে না ?"

"না, এখনও তেমন রাত হয়নি বাড়িতে ভাববার মতো। ভাবলে, কাকিমাই ভাববেন। একটা ব্যাপারে বড় বাঁচোয়া। আমাকে নিয়ে তেমন চিন্তা করার কেউই নেই।"

"পারুলদি এসে যাবেন এখনই। আপনি আর একটু বসুন। আমার বড় ভয় করছে স্যার।"

"ভয় কিসের। ভয় নেই কোনো। আমি আছি।"

পিপি চুপ করে জিষ্ণুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। হঠাৎ ওব দুচোখ জলে ভরে এলো।

জিষ্ণু বললো, "তুমি এখন কী করবে পিপি ?"

"আমি ? তাই ভাবছি।"

"তোমার মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই ?"

"সকলেই ছিলো। আমরা জামশেদপুরের লোক। যুগসালাইতে বাড়ি ছিলো আমাদের। বিহারী মুসলমান পাড়ার মধ্যে। উনিশ শো উনআশিতে দাঙ্গায় বাবাকে-মাকে, ষোল বছরের বোনকে এবং দশ বছরের ভাইকে মেরে ফেলে ওরা। আমি সেদিন টেল্‌কো কলোনিতে ছিলাম। মারার আগে মাকে .... বোনকে .....। জন্তুরা... কুমিল্লা থেকে ঠাকুর্দা ও দাদুরা একবার উদ্বাস্তু হয়ে আসেন উনিশ শো ছেচল্লিশে। এবং আবারও উদ্বাস্তু হন জামশেদপুরে। উনিশ শো উনআশিতে।"

জিষ্ণু স্বগতোক্তি করে বললো, "ভারতবর্ষে !"

"হ্যাঁ। একদিন হয়তো ভারতবর্ষ থেকেও আমাদের উদ্বাস্তু হয়ে চলে যেতে

হবে । তারপর বললো, সুমন্ত্র এবং ওরা সকলেই জানতো আমার অসহায়তার কথা . জানতো যে, আমার পেছনে আপনার জন বলতে কেউই নেই। একজনও নয় ।"

বাইরে বেল বাজলো ।

পারুলদি এলেন । মাঝবয়সী মহিলা । মুখে গভীর দুঃখের ছাপ । সেই দুঃখের স্থায়ী বাসা এখন তার মুখেই । কতলোকের কতরকম দুঃখ থাকে । তারা সবাই কেন যে জিষ্ণুর সামনে আসেন ?

জিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "নমস্কার ।"

"নমস্কার ।"

পিপি বললো, "আমার অফিসের বস, জিষ্ণু চ্যাটার্জি ।"

পারুলদি বললেন, "এতোদিন কোথায় ছিলেন ? একদিনও তো দেখিনি । আপনার অনেকই আগে আসা উচিত ছিলো পিপির কাছে । আপনার কথা কতো যে শুনেছি পিপির কাছে । আপনার সব কথাই আমার জানা হয়ে গেছে । পিপি যে আপনাকে কী চোখে দ্যাখে তা আপনি ..."

কেন একথা বললেন পারুলদি জিষ্ণু বুঝলো না ।

পিপি মুখ নিচু করে ছিলো ।

পারুলদির কথার এবং মুখের ভাবে গভীর আন্তরিকতা ছিলো ।

বললেন, "তোর খাবার নিয়ে আসছে পিপি, পল্টু । কাল থেকে তো অফিস যাবি ?"

"আমি খাবো না কিছু ।"

"তুই এই একতলায়, এক বাড়িতে থাকবি কী করে ? কিছুক্ষণ আগে একটা চেঁচামেচি শুনলাম । কে এসেছিলো রে ?"

"পিকলুবাবু ।"

"এমন একটা দিনেও নিস্তার নেই । বুঝলেন জিষ্ণুবাবু, এ শহরে আইন নেই, পুলিশ নেই, এমনকি ঈশ্বরও নেই । এখানে পিপির মতো পরিবার-পরিজনহীন সুন্দরী মেয়ের একা একা বাঁচার মতো বিপজ্জনক ব্যাপার আর দুটি নেই । ওকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন জিষ্ণুবাবু । এ বাড়িতে তো উপরে আমি আর নীচে ও ।"

জিষ্ণু উঠে পড়ে বললো, "আমিও তাই ভাবছিলাম । পিপি তুমি কাল অফিস বেরুবার সময় কিছু জামাকাপড় ও জরুরি জিনিস নিয়েই বেরিও । আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো । তুমি আমার কাকিমার সঙ্গেই থাকবে । কদিন থাকো । যদি ভালো না লাগে তাহলে তোমাকে তারিণীবাবুদের বাড়িতে রাখার বন্দোবস্ত করবো । একটু কষ্ট হবে হয়তো সেখানে কিন্তু নিরাপত্তার অভাব হবে না মনে হয় ।"

"তারিণীবাবু কে ?"

"উনি আমাদের বাড়িওয়ালা । তারিণী চক্রবর্তী । বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার্ড । বড়

দুঃখী । এবারে আমি উঠবো ।"

পিপি এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো ।

বললো, "সাবধানে যাবেন ।"

ওর মুখের একপাশে ভিতর থেকে আলো এসে পড়েছিলো । জিষ্ণুর মনে হলো, পিপিকে যেন এই দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় দিতে কতদিন থেকেই দেখছে । কতই যেন চেনা তার !

এই পিপি !

হীরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই হাঁক দিলেন ।

শরীর আজকাল বোঝায় যে আগের দিন আর নেই ।

হেমপ্রভা সারা সকাল কেঁদেছেন । চোখ মুখ ফুলে গেছে । পরী আজই ব
গেছে সকালের ফ্লাইটে । ফ্লাইটটা খুব ভোরে নয় । তার আগে পরী যা বলে গে
হেমপ্রভাকে তাতে তাঁর আর বেঁচে থাকার কোনোই ইচ্ছা নেই ।

ওঁর মুখ দেখেই হীরু বুঝলেন যে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে । হেমপ্রভা নিজে
ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসেছিলেন বেতের চেয়ারে । এই বারান্দাটা পেছনে
দিকে । এতে বসেও গানুবাবুদের বাড়িটা দেখা যায় । তবে এদিকটা অন্য দিক
মার্বেলে পাড় বাঁধানো পুকুর । তার চারপাশে নারকেল গাছের সারি । রঙ্গন, জবা
নানারকমের । টগর ইত্যাদি গাছ । বেল গাছ আছে একটি মস্ত বড় । তার নি
ছোট্ট শিবমন্দির । কর্তামা বাঁ হাতটি কোমরে রেখে এখনও দুজন বামুনঝির সাহায
ককিয়ে কেঁদে একবার ডাইনে ঝুঁকে আরেকবার বাঁয়ে ঝুঁকে রোজ সকালে এদি
আসেন । পুকুরে চান করার পর পুজো দিয়ে ফিরে যান ।

এদিকেও অনেক পাখি আছে । তারা যদিও পোষা নয় কিন্তু প্রায় পোষাই হ
গেছে । তাদের জন্যেও আলাদা করে নানারকম দানা, গম, চাল, ফল ইত্যাদি দেও
হয় ।

হীরুবাবু কখন যে পেছন থেকে এসে পাশের চেয়ারে বসেছেন খেয়াল
করেননি হেম ।

মোক্ষদা যখন হীরুকে জিজ্ঞেস করলো, চা দেবো কি বাবু ? তখনই মুখ ফিরি
হীরুকে দেখতে পেলেন উনি । দেখতে পেয়ে, আবারও মুখ ফিরিয়ে বাগানের দি
উদাস চোখে চেয়ে রইলেন ।

মোক্ষদা উত্তর না পেয়ে এবং হেমপ্রভার থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে নিঃশ
চলে গেলো ।

আকাশ মেঘে ঢেকে রয়েছে । হাওয়া দিচ্ছে পুব দিক থেকে । গানুবাবুদে

বাগানের নানা গাছ থেকে বর্ষার ফুল উড়ে আসছে হাওয়াতে । এখুনি বৃষ্টি নামবে ।

হীরুকে দেখেই দু চোখ বেয়ে অঝোরে জল নামলো আবারও হেমপ্রভার ।

"কী হলো কি তোমার ? হেম ?"

হীরু সহানুভূতির গলাতে শুধোলেন ।

"পাখিদেরও ঘর থাকে । থাকে ফুলেরও ।"

"মানে ?"

হীরুবাবু বললেন ।

"আজ । পরী .... ।"

বলেই, কান্নাতে ভেঙে পড়লেন হেম ।

" কী ? কী করেছে তোমার পরী ? দেবো না তার ডানা কেটে ?"

"সে তো ডানা-কাটাই ।"

হেম বললেন ।

"কী বলেছে কি ?"

গলা নামিয়ে হেম বললেন, "বলেছে, তুমি যে ওর বাবা তা ও জানে । আমি এতো বছর আমার-তোমার সম্পর্কটা লুকিয়ে রেখে স্থিরব্রতর জন্মদিনে মিথ্যে করে ওকে দিয়ে তার ছবিতে প্রণাম করিয়েছি । জিষ্ণুকে মিছিমিছি কাকার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছি ওর । ও জিষ্ণুকে বিয়ে করতে চায় । ওদের দুজনের মধ্যে কোনোরকম রক্তসূত্রের আত্মীয়তা তো সত্যিই নেই ।"

হীরু অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন, বাগানের দিকে চেয়ে ।

অনেকক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বিয়ে যদি করতে চায় করুক না হেম । তাতে তোমার আপত্তি কিসের ?"

"এতো বছর এতো কষ্ট করে ছেলে-মেয়ের মতো মানুষ করে তুললাম ওদের আর সবই বৃথা যাবে ? তোমার কষ্ট ? ওরা কেউই নয় আমাদের ?"

"আমার কোনো কষ্ট নেই । তাছাড়া, আনন্দও তো কম ছিলো না । যখন ছিলো । শুধু কষ্টর কথাটাই মনে করলে চলবে কেন বলো ?"

"তুমি সায় দিচ্ছো এই বিয়েতে ?"

"হ্যাঁ । আমার পূর্ণ মত আছে এতে । আমি দাঁড়িয়ে থেকে এ বিয়ে দেবো । আমার মেয়েব বিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দেবো না তো কে দেবে ?"

"লোকে কী বলবে ?"

"এই লোকের কথা ভেবেই তো তুমি আমাকেও বিয়ে করোনি হেম । পরীর পিতৃপরিচয় গোপন করেও স্থিরব্রতর মৃত্যুর দু-তিন বছর পরে বিয়ে করলে আজকে তোমার এবং আমার এরকম চোর হয়ে থাকতে হতো না সমাজের কাছে । তাছাড়া, প্রথম থেকেই সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দিলে আজকে পরীকে আমার মেয়ে বলে

আমিও তো সম্মানের সঙ্গে দাবী করতে পারতাম। আমাদের সমস্ত জীবনটাই পরের বাড়ি গিয়ে চুরি করে পুতুল খেলা বলে মনে হতো না জীবনের শেষে এসে।"

"ঠিকই বলেছো তুমি।"

হেম বললেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

একটু পর হীরু বললেন, "জিষ্ণু জানে ?"

"জানে কি আর না ? তাছাড়া বিয়ের বাকিই বা কি আছে বলো ? মেয়ে তো আদ্ধেকটি রাত জিষ্ণুর ঘরেই কাটায় আজকাল। যখন ফিরে যায় তখন আমি বন্ধ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওর পায়ের শব্দ শুনি। দরজা খুলে কিছু যে বলব, সে সাহস হয়নি আমার এতোদিন। কাল রাতে, আর না থাকতে পেরে দরজা খুলে বলেছিলাম "কী হচ্ছে পরী ? এসব কী হচ্ছে ?"

"হুমম্। তাতে কি বললো পরী ?"

পরী বললো, "শাট-আপ্।"

"বললো, 'চরিত্রগুলো পালটে দিয়ে দেখো। মনে করো হীরুকাকু যখন আমাদের বাড়িতে থাকতো তখন হীরুকাকুর ঘরে তুমি যাচ্ছো রাতের বেলা। আমি তখন ছোট ছিলাম মা। কিন্তু তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসতে ভয়ে ঘুমোতে পারতাম না। আজ তুমি ভয়ে ঘুমোতে পারছো না আমি যতক্ষণ জিষ্ণুর ঘর থেকে না ফিরি'।"

"আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

"পরী হাসতে হাসতে এবং জানো, টলতে টলতেও ওর ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছিলো। সভ্যতা, সমাজ, লোকভয়, গুরুজনের প্রতি ভয়-ভক্তি সবই উবে গেলো কি এমন করে? এই অল্পকটা বছরে ?"

হীরুবাবু বললেন, "গেছে বইকি ! অস্বাভাবিকও নয়। বদলটাই তো নিয়ম। তাকে মেনে নেওয়াটাই আধুনিকতা !"

বলেই হাঁক দিলেন, "ও মোক্ষদা। মোক্ষদা কোথায় গেলে ?"

ভেতর থেকে মোক্ষদা সাড়া দিলো। সে এলে বললেন, "আমাদের দুজনকেই একটু চা খাওয়াও দেখি। চিনি দিয়েই দাও ভালো করে আমাকে। আর একটা ওমলেটও বানিয়ে দিও।"

মোক্ষদা চলে গেলে, হেম বললেন, "চিনি খাচ্ছো যে ?"

"আর কী হবে ভয়-ভাবনা করে ? এখন যে কদিন বাঁচবো নির্ভয়ে বাঁচবো।"

হেম চুপ করে রইলেন।

"তোমার অত চিন্তার কি বলো তো ? আমার তো মাথা গোঁজার জায়গা একটা আছে। না কি ? তোমার যদি সেখানে যেতে লজ্জা করে তাহলে তোমাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়েই নিয়ে যাবো। বিয়ে করে, বৌই আসলে, তাকে না হয় তিরিশ বত্রিশ

ছর পরেই বিয়ে করব। কী বলো বৌ ?"

হেমের চোখে তখনও জল ছিলো । কিন্তু তার মধ্যেই হেসে উঠলেন ।

"কেন ?"

মোক্ষদা ভিতরের বারান্দা থেকে গলা-খাঁকরে ট্রেতে বসিয়ে চা ও ওমলেট নিয়ে এলো।

বললো, "চিনি আলাদা করেই এনেছি, যেমন মায়ের জন্যে আনি । দুধও । কতটা দেবো বাবু ?"

"আমি নিয়ে নেবোখন । আর শোনো মোক্ষদা । শ্রীমন্তকে ডাকো । এখনও বাজার বন্ধ হয়নি । এখানে না পেলে শ্যালদায় যেতে বলবে মিনি ধরে শ্রীমন্তকে । বলবে, দেড় কেজির একটি ভালো বড় ইলিশ মাছ নিয়ে আসবে । আর তুমি রাঁধবে । টক দইও আনতে বোলো । একটু কচুর শাক । ইলিশমাছের মাথা দিয়ে । একটু ছালা দিও তাতে । যাও। শ্রীমন্তকে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি আমার কাছে একবারটি ।"

শ্রীমন্ত এসে দাঁড়াতেই হীরুবাবু শ্রীমন্তকে টাকা দিয়ে বললেন, "শ্রীমন্ত, তুমি আগে আমাকে দু'বোতল ব্ল্যাক-লেবেল বীয়ার এনে দিয়ে যাও তো শা'র দোকান থেকে ।"

"সেটা কি বাবু ?"

"মদ । গিয়ে বললেই দেবে । ওটা দিয়ে গিয়ে তারপর চট্ করে বাজার সেরে এসো। একটা বোতল ফ্রিজ-এ রেখে অন্য বোতলটা খুলে একটা গ্লাস দিয়ে আমাকে দিয়ে যাবে। কী বলবে ?"

"আপনি বাবু ? মদ ?"

"হ্যাঁ গো শ্রীমন্ত । আমি । লুকোচাপার দিন আর নেই । পরী খাচ্ছে, জিষ্ণুও বাড়ি বসেই, আমাদের ছেলেমেয়েরা ; তা আমি বুড়ো মানুষ একটু না হয় খেলুমই। আজ ভালো করে খেয়ে ঘুম লাগিয়ে জিষ্ণু ফিরলে তার সঙ্গে একবারটি দেখা করে তারপরই যাব । যাও শ্রীমন্ত । দেরী করো না আর ।"

শ্রীমন্ত চলে গেলে হেম বললেন, "তুমি আবার এসব খেতে নাকি ? শীতকালে একটু-আধটু ব্রাণ্ডি ছাড়া আর তো কোনোদিন কিছুই দেখিনি।"

"তুমি আমার কতটুকু দেখেছো হেম ? তাছাড়া, অতীতের কথা ছাড়ো, বর্তমানের কথা বলো ।"

এমন সময় কড়াক্কড় শব্দে বাজ পড়লো । তারপরেই বৃষ্টি নামলো মুষলধারে । চারধার অন্ধকার করে ।

"বাঃ ।"

হীরুবাবু বললেন, বৃষ্টির দিকে চেয়ে ।

"আমি যাই জানলা বন্ধ করিগে ।"

হেম উঠতে গেলেন ।

"আহা, চা-টা রসিয়ে রসিয়ে খেয়েই যাও । অ্যাই দ্যাখো । শ্রীমন্তকে পান আনতে বলতে ভুলে গেলুম !"

"পান মোক্ষদার কাছে আছে ।"

"জর্দা ?"

"বাবা ? একশ বিশতো ? আমার কাছে রাখা আছে ।"

"আহা । তবে তো কোনো কিছুরই অভাব নেই ।"

"তোমার কচুর শাক হতে সময় নেবে কিন্তু ।"

"নিক না । আমার তোমার হাতে এখন সময়ের তো আর কোনো অভাব নেই অঢেল সময় ।"

পরী ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে তিনদিনের জন্যে ।

আজ শনিবার । পূর্ণিমা ।

পিপি গত দশ-বারোদিন হলো এখানেই আছে । কাকিমা খুবই খুশি সঙ্গী পেয়ে । পরী কিন্তু কোল্ড এবং ইন্‌ডিফারেন্ট । কুরুভিল্লাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে পরী । কলকাতা থেকে বদলী নিয়ে ও চলে যাচ্ছে সামনের শনিবারই । ব্যাঙ্গালোরেই থাকবে । তবে কোম্পানীর বস্‌কে বিয়ে করে সেই কোম্পানীতেই চাকরি করার বিস্তর অসুবিধেও আছে । তাই ওদের গ্রুপেরই একটি সাব্‌সিডিয়ারীতে জয়েন করেছে পরী । অ্যাজ মার্কেটিং ম্যানেজার ।

পরীর জীবনে সব ঘটনাই হঠাৎ ঘটে । জিষ্ণুকে ও যেমন হঠাৎই কাছে টেনেছিলো তেমনি কুরুভিল্লাকেও টেনেছে । টেনে জিষ্ণুকে দূরে ঠেলেছে ।

পরী সেদিন বলছিলো জিষ্ণুকে যে, "কুরুকে এ বাড়িতে আনা যায় না । হী ইজ সো ফ্যাবুলাস্‌লি রিচ্‌ । লেটেস্ট মডেলের মার্সিডিস ছাড়া চড়ে না, স্কচ্‌ ছাড়া খায় না, আর যে বাড়িতে থাকে সে তোমাকে কী বলব জিষ্ণু । ভিলা । টেরাকোটা টালির ছাদ । পোর্শিও । টেরাস্‌ । গার্ডেন । অর্কিড-হাউস । সুইমিং-পুল । ভাবাই যায় না । কমপ্লিটলি আউট অফ দ্যা ওয়ার্লড প্লেস ।"

একটু থেমে শ্বাস ফেলে বলেছিলো, "লাইফ ইজ ফর লিভিং জিষ্ণু । নট ফর ব্রুডিং ।"

তারপরই বলেছিলো, "জানো তোমার মতো আগে কাউকেই দেখিনি, তাই তোমাকেই সব চেয়ে ভালো বলে জানতাম । কিন্তু তোমার চেয়েও ভালো যে কেউ আছে বা থাকতে পারে, তোমার চেয়েও হ্যাণ্ডসাম, তা চিন্তারই বাইরে ছিলো । তাছাড়া পুরুষের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য কি তা জানো ? বিত্ত, সম্পদ এবং ক্ষমতা ।"

জিষ্ণু বলেছিলো, "যশ ?"

"যশও । কিন্তু যশস্বী তো সবাই হতে পারে না ।"

পরী নিজে খুশিতে ডগমগ । কিন্তু বাড়ি-সুদ্ধ সবাই পরীর জন্যে দুঃখিত ।

কুরুভিল্লাকে বলেছে, ওর মা-বাবা নেই। গভর্নেসের কাছে মানুষ।

কুরুভিল্লা নাকি বলেছে যে, সে শুধু পরীর জন্যেই পরীকে বিয়ে করছে। পরীর বংশপরিচয়, কুষ্ঠি-ঠিকুজিতে সে আদৌ ইন্টারেস্টেড নয়। শী এলোন ইজ মোর দ্যান এন্যাফ্ টু ফিল হিজ লাইফ।

পরী বলেছিলো, "কুরুভিল্লা মানুষটাও খুব একলা। মাফিয়াটাইপ ব্যবসা চালায়। শনিবারে শুধু একবার একজিক্যুটিস্‌দের মীট করে। অন্য সময় নিজেকে নিয়েই থাকে। নিজের সুখ, নিজের শখ, নিজের আহ্লাদ। জীবন উপভোগ করতে জানে মানুষটা। অথচ কী অল্প বয়স!"

"সাউথেই চলে যাও তোমরা।"

পরী বলেছিলো জিষ্ণুকে, "এবারে সাউথের ফ্ল্যাটটা তুমি নিয়েই নাও জিষ্ণু। দেরী কোরো না। মা তো হীরুকাকার সঙ্গে নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে থাকছেনই। আর যে নতুন আপদটিকে বাড়িতে এনে তুলেছো তাকে অবিলম্বে বিদেয় করো। নইলে, করুণা, দয়া, সমবেদনা, অনুকম্পা এ সবের কক্‌টেল-এ কখন দেখবে যে, 'পেরেম' হয়ে গেছে। বাঙালিদের এই 'পেরেম' ব্যাপারটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কখন যে কোথায়, কার সঙ্গে ; কেন হয়ে যায় তা বলা ভারী মুশকিল। আমাকে দেখে বুঝছো না ? আজকাল বিয়ে ফিয়ের ঝামেলাতে যাওয়াই ভালো। যদি করোই, তবে বিয়ে করবে তোমার লেভেলের কমপক্ষে এক বা দু লেভেল উপরে।"

"হুঁ।"

জিষ্ণু বলেছিলো।

পরীর সঙ্গে ইদানীং কনভার্সেশান চলে না। পরীর সলিলোকিই শুনতে হয় একতরফা।

সেদিন ওর ঘরের লাগোয়া বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলো জিষ্ণু। আকাশে মেঘ নেই। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পরীও এসে দাঁড়িয়েছিলো পাশে। ওদের বাড়ির সকলেরই মন একটা কারণে খারাপ। খুবই খারাপ। গানুবাবুদের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। গাছ-গাছালি সবুজ, পেটা ঘড়ির আওয়াজ, আমীর খাঁ সাহেবের দরবারী কানাড়া, ভীমসেন যোশীর ভূপালী, ছবি ব্যানার্জির কীর্তন, গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের টপ্পা, এ. টি কানন সাহেব আর মালবিকা কাননের গান — এসব আর শোনা হবে না তাঁদের স্বকণ্ঠে দিনরাতের বিভিন্ন প্রহরে। পাখি ডাকবে না আর। পুকুর ভরাট হবে। বৃষ্টিশেষের হাওয়ায় বাতাবী ফুলের গন্ধ আসবে না ভেসে।

সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে মালটিস্টোরিড বাড়ির নির্মাতা। সাল্লু অ্যাণ্ড চৌধুরী। কনট্রাকটরস অ্যাণ্ড প্রোমোটারস। আর্কিটেকটস : রহমুতল্লা অ্যাণ্ড বিসমিল্লা। বড় বড় সার্চলাইট লাগানো হয়েছে, বাড়ি ভাঙা ও গাছ কাটা শুরু হয়ে গেছে। সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি রোজ কাজ চলেছে। এতোক্ষণ ইলেকট্রিক করাতের

আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলো একটানা। গাছ কাটা হচ্ছে ক্রমাগত। স্নায়ু ঝন্‌ঝন্‌ করছে এই বাড়ির সকলের, ও বাড়ির মেঝে থেকে মার্বল তোলার ঠকাঠক আওয়াজে।

গানুবাবুরা এবাড়িতে এখন আর কেউই নেই। বাড়ি ভাঙার আগেই সকলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের ধনসম্পত্তি, বহুমূল্য হীরে-জহরত, তাঁদের বৈশিষ্ট্য এবং যাবতীয় গর্ব এবং দম্ভমেশা বিনয় নিয়ে সাউথের ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনস্‌-এর নবনির্মিত একটি মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে তিনটি চার হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের দখল নিয়েছেন তাঁরা। তারপরের হিসেব-নিকেশের কথা পাড়ার লোকে কেউ জানে না। এখানকার নতুন বহুতল বাড়ি শেষ হলেও এখানে আর ফিরবেন না তাঁরা। "সাউথেই" থাকবেন।

কর্তামা নাকি জীবনে প্রথমবার লিফটে চড়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলেন। ছোট ছেলে বলেছিলো কর্তামাকে — "সাউথে থাকতে অনেক হ্যাপাও আছে। এটুকু না পোয়ালে চলবে কী করে ? মানুষ তো এবারে চাঁদে গিয়েও থাকবে শুনছি। সেখানে তো আরও হ্যাপা।"

ওরা চলে যাওয়াতে পাড়ার লোকে কেউই দুঃখিত হননি। কারণ তাঁরা এ-পাড়ার এবং এ-গলির মানুষদের মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। সকলেরই দুঃখ হয়েছে অন্য কারণে। দুঃখ, একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে, সবুজের শেষ চিহ্নও নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বলে।

বাইরে বোর্ড লেগেছে। "সেল্‌। সেল্‌। সেল। প্রকৃত বার্মা সেগুনের দরজা, জানালা, কড়ি-বরগা, ইটালিয়ান মার্বেল, অ্যান্টিক ফার্নিচার, লেজারার্স কোম্পানীর।"

হঠাৎ গদ্দাম শব্দ করে পাড়া কাঁপিয়ে, মাটির সঙ্গে তার বহু বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে মুখ থুবড়ে পড়লো বিশাল কনকচাঁপা গাছটি।

জিষ্ণু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বর্ষায় ফুলে ফুলে ভরে যেতো। গন্ধে 'ম-ম' করতো সারা পাড়া। কত বছরের কত সুখ-দুঃখের সাথী এই গাছটি। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেলো।

পরী বললো, "জানো জিষ্ণু, ব্যাঙ্গালোরে যে বাড়িতে যত গাছ আছে সেই অনুপাতে কর্পোরেশান ট্যাক্সে ছাড় দেয়, আর এখানে মাল্টিস্টোরিড বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করার সময় গাছ না-কাটার বা গাছ লাগানোর কোনো শর্তই আরোপ করা হয় না। পুরো শহরটা মরুভূমি আর কংক্রিটের পাহাড় হয়ে গেলো দেখতে দেখতে। কারোরই মাথাব্যথা নেই। আবহাওয়া বিহারের মতো হয়ে গেলো।"

"ভালোই করেছো ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে। মানুষের মতো বাঁচতে তো পারবে !"

মোক্ষদাদি এসে ওদের খেতে ডাকলো।

খাবার টেবলে পরী ও জিষ্ণুর সঙ্গে খেতে বসে না পিপি। ওদের টুকটাক

পরিবেশন করে । বলে, কাকিমার সঙ্গে পরে খাবে । একদিন চিতলমাছ রেঁধে
খাইয়েছিলো ও । হীরুকাকা সেদিন খেয়েছিলেন । এবং খেয়ে খুব প্রশংসা
করেছিলেন । জিষ্ণুও । পরী, মাছের ভক্ত আদৌ নয় ।

পিপি অল্প ক'দিনেই কেমন আস্তে আস্তে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে উঠেছে । তবে
কুণ্ঠা ও হীনম্মন্যতা এখনও পুরোপুরি যায়নি । মোক্ষদাদির ঘরটায় রঙ ফিরিয়ে
মোক্ষদাদিকে একতলার গেস্ট রুমটি দেওয়া হয়েছে । দোতলাতেই থাকবে ওর নিজের
যৎসামান্য ফার্নিচার এনে চার-পাঁচ দিন পর থেকে পিপি । কাকিমাকে বলেছিলো
মাসে হাজার টাকা করে দেবে । কাকিমা তাতে বলেছেন, "অত টাকা দেবে কেন ?
পাঁচশো করে দিলেই যথেষ্ট । সেটাও তোমার আত্মসম্মানেরই জন্যে । কিছু না দিলেই
কিন্তু খুশি হতাম আমি । এতো লোক খাচ্ছি আমরা, আর একটা পেটের জন্যে কি
আর বাড়তি খরচ ?"

পিপি নাকি বলেছে, "তা কি হয় কাকিমা ? সব কিছুই বার বার করে
হারিয়ে এতোদিনে নতুন ঘর পেলাম । আপনার কাছে থাকতে পেলাম মা, পেলাম
নিরাপত্তা ......"

আর, এম-কে বলে পিপির মাইনেও সাড়ে চার করে দিয়েছে জিষ্ণু । কোম্পানীর
আয় এখন খুবই ভালো । আর. এম. মানুষটিও ভালো । সেনগুপ্ত সাহেবই যা ......

আশ্চর্য ! কত রকমের মানুষই না থাকে সংসারে । একটি অসহায় মেয়ের সর্বনাশ
করতে না পেরে কী নিপুণভাবে তার চরিত্রহনন করেছিলেন ! চরিতখেকো কোম্পানি
লিমিটেড বলে একটি কোম্পানী খুললে পারেন ভদ্রলোক । সুমন্ত্রর মৃত্যুর পর জিষ্ণুর
চোখে আর চাইতে পারছেন না সেনগুপ্ত সাহেব । জিষ্ণুও চায়নি তাঁর চোখে
খারাপ লোকদের চোখে যত কম চাওয়া যায় ততই ভালো ।

রাতে খাওয়ার পরে সে-রাতে পরী জিষ্ণুর ঘরে এলো । দু'হাতে জিষ্ণুকে জড়িয়ে
ধরে আশ্লেষে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেলো । তারপর বললো, "গুড নাইট । তুমি
আমার প্রথম প্রেমিক জিষ্ণু । চিরদিনই থাকবে । কুরু একটু ট্যাঁ-ফোঁ করলেই তোমার
কাছে ফিরে আসবো । আমার জায়গা যেন খালি থাকে । মনে রেখো একথা ।"

জিষ্ণু ভাবছিলো, কুরুকুলে না বনিবনা হলে পাণ্ডবের কাছে ফিরে আসবে এ
কেমন আবদার !

পরীকে সত্যি সত্যিই রাঁচী পাঠানো দরকার । পিকলুর স্ত্রী খুসির মতো মিথ্যা
মিথ্যা নয় ।

খুসিকেও সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে যাতে তার সব সম্পত্তি তার হাতেই তুলে
দেওয়া যায় তার জন্যে উকিল সলিসিটর ডাক্তার সকলের সাহায্যে নিয়ে যা করা
দরকার তার সব রকম চেষ্টাই শুরু করে দিয়েছে জিষ্ণু । জিষ্ণুর সঙ্গে যদি খুসির
যোগাযোগ একটু বেশি থাকতো তবে হয়তো পিকলুটা এমন করে নষ্ট হয়ে যেতো

। পিকলুর উপরে প্রচণ্ড রাগ হয় জিষ্ণুর । আবার ভীষণ দুঃখও হয় । ওর একমাত্র ন্ধু ছিলো সে । প্রাণের বন্ধু । এরকম তো ও ছিলো না । পিকলুর মতো ভালো, রুচিসম্পন্ন, নম্র, ভদ্র মানুষ জিষ্ণু কমই দেখেছে এ জীবনে । অথচ পিকলু ।

কোম্পানী ওকে দুটি এয়ারকণ্ডিশানার অ্যালট্ করেছে । এখানে এবাড়িতে তা াগানো যায় না । লাগালে, পাড়ার সকলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাবে । গানুবাবুদের তোই হয়ে যাবে ওরা । নাঃ, ওকেও সাউথেই চলে যেতে হবে । যেখানে কেউ উকে বেশি প্রশ্ন করে না । বম্বের মতো । যে-পাড়া পুরোপুরি কসমোপলিটান্ । খানে অতীত নিয়ে কারোই কোনো বিড়ম্বনা নেই । সাউথে না গিয়ে উপায় নেই ার । যেতেই হবে ।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো জিষ্ণু যে, আগামীকাল একবার কেলের দিকে তারিণীবাবুর বাড়ি যাবে । পিপির স্বামী-কন্যার মৃত্যুর পর পিপির াপারে এতোখানিই জড়িয়ে পড়েছিলো ও যে, মামণির কথা সত্যিই মনে ছিলো যে কাছে থাকে, কাছাকাছি থাকে ; তার দাবীই বোধহয় অগ্রগণ্য হয় । কে জানে ? ষ্ণু বুঝতে পারে না নিজেকে । তাছাড়া পিপিকে তো সে অনেক দিন ধরেই জানে । নেক বছর । যদিও সে জানা অফিসেরই জানা । একজন ব্যস্ত চট্পটে কমপিটেন্ট েক্রেটারী হিসেবেই । ঘরোয়া পিপিকে তো সে চিনতো না । অফিসে যে সর্বক্ষণ ার কাছে থাকে, তাকে আড়াল করে রাখে নানা উপদ্রব থেকে ; তার মীটিং, নফারেন্স, লাইফ ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ককটেইল বা লাঞ্চ বা ডিনারের সব নগেজমেন্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং দায়-দায়িত্বর কথা যে মানুষটির মনে করিয়ে দিয়ে সেছে এতো বছর হলো তাকেই বাড়িতে কাকিমার পাশে হালকা প্যাস্টেল রঙা াঁতের ডুরে শাড়ি পরে ঝিঙে-পোস্ত খেতে দেখে অবাক হয়ে যায় জিষ্ণু । প্রত্যেক রীর মধ্যেই অনেকগুলি নারী থাকে । সাপের খোলস বদলের মতো তারা খোলস দলে বদলে নতুন নতুন চেহারাতে প্রতিভাত হয় । সাপ বদলায় ঋতুতে । নারী দলায় প্রহরে । এই তফাৎ ।

পাগলী পরী, জিষ্ণুর জীবন থেকে সরে যাওয়াতে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খন সিরিয়াসলি ভাবার সময় এসেছে জিষ্ণুর । মাঝে মাঝেই ওর সত্যিই একলা াগে বড় । মনের কাছাকাছি কাউকে চায় । যার সঙ্গে বসে একসঙ্গে গান শুনতে ারে, নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারে, ইচ্ছে করলে যাকে আদরও করতে পারে মাজ বা বিবেকের ভ্রূকুটি ছাড়া ; এমন কেউ ।

ওর মনোজগতে সাম্প্রতিক অতীতে অনেকই পরিবর্তন এসেছে । পুষির স্মৃতি ান আস্তে আস্তে ক্রমশই হালকা হয়ে আসছে । তারই আসনে মামণি এবং পিপি, য়তো বেশি করেই পিপি এসে বসেছে । চোখের আড়ালে গেলে মনের আড়ালেও লে যায় মানুষ । এই রূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করেছে জিষ্ণু ।

সেদিন দোতলার সিঁড়ি থেকে ও আর পিপি যখন অফিস যাবে বলে তৈরি হ
নামছিলো, তখন কাকিমা সেদিন হীরুকাকাকে বলছিলেন "ওদের দুটিকে ভারী মানা
কিন্তু। পিপি যেমন সুন্দরী, বুদ্ধিমতীও তেমনই। আমার তো ওকে পুষির চেয়ে
বেশি পছন্দ।"

"আঃ সেদিন আমায় যা কাঁকড়া রেঁধে খাওয়ালে না! কী ভালো যে রেঁধেছিে
হেম।"

হীরুকাকা বলেছিলেন।

দ্রুত নেমে এসেছিল সিঁড়ি দিয়ে জিষ্ণু। কে জানে, পিপি শুনতে পেলো ি
না!

আজই শ্রীমন্তদার কাছে শুনেছে শ্রীমন্তদাকে সঙ্গে করে, ফাইভ স্টার হোটেলে
হাউস-কীপিং স্টাফের মতো জিষ্ণুর ঘরে এসে গতকাল সব গোছগাছ করে গেছিে
নাকি পিপি। ঘুমের ওষুধগুলো নাকি ওই শ্রীমন্তদাকে দিয়ে জোর করে ফেলিে
দিয়েছিলো। বলেছিলো, শ্রীমন্তদা তোমার দাদাবাবু রাগ করলে বোলো যে আমি
ফেলে দিয়েছি। তারপরও যদি আমাকে ডাকেন তবে আমিই যা বলার বলবো

জিষ্ণু ডাকেনি পিপিকে। কিন্তু বুঝতে পারছে যে একটু একটু করে ও জা
খোয়াচ্ছে। মেয়েদের যুদ্ধর কৌশলটা এমনই। তলোয়ার বা বন্দুকের হঠাৎ আঘাে
জেতা তাদের ধর্ম নয়। প্রকৃতি যেমন করে মানুষের কাছ থেকে ধীরে ধীরে ত
কিশলয়ের পতাকা উড়িয়ে রুক্ষ শূন্যতার উপরে দখল নেয়, মেয়েরাও তেমন করে
নেয় পুরুষের উপরে। প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি করে প্রতিভাত হন তো নারীতেই
সুমন্ত্রর মৃত্যুর পর থেকেই কী যেন একটা ঘটছে জিষ্ণুর মধ্যে। লিউকোমিয়
মতো কোনো অসুখ। ক্রমশই ও ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অথচ জ্বর নেই, পে
ব্যথা নেই; মাথাধরা নেই। ভালো লাগছে না ওর। ও বড় ভয় পাচ্ছে।
দারুণ এক আনন্দমিশ্রিত ভয়।

পিকলু মাঝে একদিন অফিসে ফোন করেছিলো। জিষ্ণু মানা করে দিয়েে
পিপিকে কোনো নন্-বিজনেস্ বা পার্সোনাল কল দিতে। অপারেটরকে বলে দিয়েে
ডায়রেক্টলি যেন সব কল জিষ্ণুকেই দেয়। কিছুদিন অসুবিধা হলে, হবে। মা
করেছে কেবল পিকলুরই ভয়ে। পিকলু আবার পিপিকে কী না কী ভয় দেখাে
কে জানে!

পিকলু বললো, "কী রে জিষ্ণু? আছিস কেমন?"

"ভালো। তুই?"

"আমি যেমন থাকার তেমনই আছি। খুসি কেমন আছে?"

"কে?"

"খুসি!"

"ইয়ার্কি করছিস ?"

"ইয়ার্কি কেন মারবো ?"

"তোর কথার মানে বুঝছি না ।"

"রাঁচীতে তাকে পাগল সাজিয়ে বন্ধ করে রেখেছিস তার সম্পত্তি হাতাবি বলে ? ই কোথায় নেমে গেছিস পিকলু ? ছিঃ ছিঃ চিন্তা করতে পারিস ?"

"ও । ঐ মাগীটা বুঝি তোকে বানিয়ে বানিয়ে এই সব বলেছে ? কালনাগিনী রে তুলেছিস তুই । একদিন বুঝবি এখনই বন্ধুর কথা না শুনলে । কলকাতা হরে এমন লোক নেই যার সঙ্গে ও শোয়নি । কতটুকু চিনিস তুই ওকে ?"

"বন্ধুই বটে । কী ভাষার ছিরি ! ছিঃ ! ছিঃ !"

একদিন যে এই লোকটা ওর বন্ধু ছিলো একথা মনে করেও জিষ্ণুর ঘেন্না হয় াজকাল ।

"আমার টাকাটা ? কী করবি ?"

"টাকা তোকে দেবো না তো বলেছি । কোনো টাকাই দেবো না ।"

"শোন্, পাঁচ হাজার নয় । তোর কাছে আমি পঞ্চাশ হাজার চাই । নইলে তার বাড়ির সব কেচ্ছা আমি কলকাতা শহরময় ময়লার গাড়ি করে ছড়িয়ে বেড়াবো । ই কত বড় রেসপেক্টবল্ হয়েছিস তখন বোঝা যাবে ।"

"আমার কোনো গোপন কথা নেই । ব্ল্যাকমেইল করে সুবিধে হবে না । বরং ঙ্গলে যাবার জন্যে তুই তৈরি হ ।"

"তৈরি হয়েই আছি । তোর জ্ঞান না দিলেও চলবে ।"

"দ্যাখ্ পিকলু, খারাপ মানুষ পৃথিবীতে চিরদিনই ছিলো এবং থাকবে । কিন্তু ই কী করে এমন হয়ে গেলি ? নষ্ট হয়ে গেলি ? তুইতো ছিলি না এমন !"

"ভালোই বলেছিস । হাঃ । জীবন, সময়, পরিবেশ, উচ্চাশা এই সবই নষ্ট করে েলো বোধহয় আমাকে । হাঃ । তুইও যেমন নষ্ট হয়ে গেলি জিষ্ণু । নষ্ট হওয়ার ানা রকম হয় তা বুঝি জানিস না ?"

"উচ্চাশা ! এটাই কারণ বলছিস । তাছাড়া, অত হাঃ হাঃ করছিস কেন ? াত্রা-টাত্রা করিস নাকি আজকাল ?"

"সকলেই যাত্রা করে । তুইও করিস । তবে স্টেজে করিস না, এই-ই যা । চারণ' না হওয়ার কী আছে ? আমার কি ইচ্ছে করতে পারে না তোর মতো এয়ার-কণ্ডিশানড্ মারুতিতে ওয়েল ড্রেসড্ বিজনেস্ স্যুট পরে এসে এয়ার-কণ্ডিশানড় াফিসে বসে কাজ করি ? বাড়িতে নিজের কাজিন্-এর সঙ্গে শুই । অফিসে সক্রেটারীর সঙ্গে । তিন-চার মাসে একবার করে ফরেনে যাই ? একদিনের কাজ াতদিনের ছুটি । বড় বড় কথা বলি । বন্ধুরা টাকা চাইলে তাদের জ্ঞান দিয়ে ফিরিয়ে াই । ইচ্ছা করে কি না ? বল । এটা কি আমার উচ্চাশা নয় ? এটাই তো হাইট

অফ উচ্চাশা। তুই তো পড়াশুনোতে আমার চেয়েও খারাপ ছিলি। নেহাৎ ইংরিজি একটু ফর্‌ফর্‌ করে বলতিস। ইংরিজি বলতে পারলেই যদি মানুষ শিক্ষিত হ তবে তো পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথের ফ্রেঞ্চ-ক্যাপ্‌ আর টোব্যাকো বিক্রেতারাও সকলে শিক্ষিত। আমার টাকা চাই জিষ্ণু। টাকা থাকলে এই সমাজে, এই শহরে, এ দেশে লোকের মুখে থুথু দিয়ে, লাথি মেরে আরামে বেঁচে থাকা যায়। যেমন করে হোক, আমার টাকা চাই-ই। বাই হুক্‌ অর বাই ক্রুক। টাকার চেয়ে বড় সুখ ত নেই।"

"তুই বড় লম্বা লম্বা সেন্টেন্স বলিস আজকাল। অসহ্য।"

"হুঃ।"

আবারও যাত্রার নায়কের মতো হাসলো পিকলু।

অসহ্য। মনে মনে বললো জিষ্ণু।

পাশ ফিরে শুলো জিষ্ণু।

পিপি সবকটি ঘুমের ওষুধ ফেলে দিয়ে ঠিক করেনি। হয়তো সবগু ফেলেওনি। বলেছিলো, দিদি নিজের কাছে বোধহয় রেখে দিয়েছে কিছু।

সত্যিই আজ ঘুম আসছে না। রাত একটা বেজে গেলো। পিকলুর কথা ম হতেই। আরও কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে শেষে বিছানা ছেড়ে উঠলো ও কাকিমার ঘরে গিয়ে টোকা দিলো।

"কে ?"

"আমি জিষ্ণু।"

"কী হয়েছে রে ?"

"কাকিমা, পিপিকে বলোনা একটা ট্রাপেক্স দিতে। সব ওষুধ নাকি ও নি রেখেছে। বলেছে, ঘুমের ওষুধ রোজ খাওয়া ভালো নয়। ঘুম আমার কিছুতে আসছে না।"

"কি ওষুধ বললি ?"

"ট্রাপেক্স টু।"

জিষ্ণুর গলা শুনে পরীও দরজা খুলে বেরোলো। দাঁড়িয়ে থাকলো নিজে দরজারই সামনে জিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে।

পিপিও ততক্ষণে দরজার কাছেই কিন্তু কাকিমার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে ঘর থেকে বেরোয়নি জিষ্ণুর সামনে। রাতে কাকিমা পিপিকে সঙ্গে করে নি শুচ্ছিলেন কদিন হলো। পরীর মধ্যে যা পাননি তা হয়তো পিপির মধ্যে পেয়ে কাবি এমন করছেন। কে যে কার মধ্যে কী পায় তা কি অন্যে বলতে পারে ?

পরী বললো, "ট্রাপেক্স ছাড়াও অন্য নানারকম ঘুমের ওষুধ তো হয়।"

"আছে তোমার কাছে ?"

দোনামোনা করে বললো, জিষ্ণু ।

"আছে, ঘরে যাও । আমি যাচ্ছি । গিয়ে খাইয়ে আসছি ।"

জিষ্ণু বুঝলো যে, কথাটা দ্ব্যর্থক । এবং কাকিমার সামনে পরী এরকম একটি ।র্থক কথা উচ্চারণ করবে তা ভাবতেও পারেনি ।

পিপি অপরাধীর গলায় বললো, "ওষুধগুলো আমি সত্যিই ফেলে দিয়েছি । তবে য়োকেমিক ওষুধ দিচ্ছি আমি । আমার কাছে আছে ।"

বলেই, ঘরের ভেতরে গিয়ে ক্যালি-ফস্ সিক্স এক্স-এর একটি শিশি বের করে ানলো ওর বালিশের তলা থেকে । বললো, "একটু টেপিড-ওয়াটারে গোটা আষ্টেক ড়ি ফেলে গুলিয়ে খেয়ে নিন । এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন । কোনো খারাপ এফেক্টও নই ।"

"টেপিড-ওয়াটার এতো রাতে কোথায় পাবো ?"

"ওঃ । যা গরম, এমনি জলেই হবে । প্লেইন ওয়াটারে আমিই গুলিয়ে দিচ্ছি । াতেই কাজ হবে ।"

পিপি ডাইনিং স্পেসে এলো কিন্তু শুধু নাইটি পরে আছে বলে আলো জ্বালালো । । কিন্তু কাকিমার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেডলাইটের আলো এসে পড়েছিলো সখানে । বোতল থেকে কাপে জল ঢেলে, ক্যালি-ফস্ মিশিয়ে একটি চামচ দিয়ে নড়ে তারপর জিষ্ণুকে দিলো ।

বললো, "তিতিকে যখন কনসিভ করি তখন পারুলদি বলেছিলেন আমাকে এ ষুধের কথা । খুব ভালো ওষুধ ।"

তিতির কথা মনে পড়তেই ওর নাম উচ্চারণ করতেই পিপি গম্ভীর হয়ে গেলো ।

পিপি ওর কাছে আসতেই আশ্চর্য হয়ে গেলো জিষ্ণু । একেবারেই বোঝা যায় । অন্য সময়ে । কী চমৎকার দুটি জলপিপির মতো বুক পিপির । পুষি বা পরী ারো বুকই পিপির বুকের মতো সুন্দর নয় । পিপির নাইটির নীল স্বপ্নঘেরা বুক দখে জিষ্ণুর বুকের মধ্যেটা ধক করে উঠলো ।

পিপিও বুঝতে পেরেছিলো জিষ্ণুর চোখের কথা । তাড়াতাড়ি খালি কাপটি নয়ে চলে গেলো । তারপর কাপটি ডাইনিং টেবলে রেখে ঘরে গিয়ে দরজা দিলো । াকিমাও সম্ভবত মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাঁর ঘর থেকে আসা-আলোতে পিপিকে দখেছিলেন । পিপি বুঝতে পেরেছে অবশ্যই । মেয়েদের যে অনেকগুলো চোখ ।

পরদিন ঘুম থেকে উঠলো বেশ দেরী করে । সারা সকালটাই আলসেমি করে াটালো । পরী কলকাতায় থাকলে হীরুকাকা বেশি আসেন না । কেন আসেন া কে জানে !

এ বাড়ির সকলে খাওয়া-দাওয়াটা একসঙ্গেই করে । চিরদিন । কাকিমার শিক্ষা । এবং টেবলেই । বে-জায়গাতে খাওয়া কাকিমার বড়ই অপছন্দ । পরী ব্রেকফাস্টের

পরই বেরিয়ে গেলো । বললো, অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে । নানা রক
কাজও আছে । অয়াইণ্ডিং-আপ প্রসেস চলছে এখন ওর । কলকাতার পাট গুটি
আনছে ও ।

অফিস থেকেও গাড়ি এসেছিলো পরীর ।

পিপি একবার এসেছিলো জিষ্ণুর ঘরে । একটি সাদা খোলের মেরুন রঙা পাড়ে
শাড়ি পরে । ছোট হাতার ব্লাউজ । তাও মেরুন-রঙা । এর আগে জিষ্ণুর ঘ
কখনওই আসেনি ও ।

বললো, "ঘুম কি হয়েছিলো ? রাতে ?"

"হ্যাঁ । থ্যাঙ্ক উ্য । তবে ওষুধগুলো সব না ফেললেও পারতে ।"

ও বললো, "বড় ভয় আমার ঘুমের ওষুধকে । আপনি রোজ বরং ক্যালি-ফস
খাবেন । আমি এনে দেবো, ব্যাড-এফেক্ট নেই ।"

ব্রেকফাস্ট সেরে এসে বারান্দায় বসেছিলো জিষ্ণু । গানুবাবুদের বাড়ি ভাং
দেখছিলো । এতো ধুলো উড়ছে যে বারান্দায় বসা তো যাচ্ছেই না ইদানীং । বারান্দা
এবং ঘরের সব দরজা জানালা পর্যন্ত বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে ইদানীং ।

পিপিও কিছুক্ষণ সেদিকে উদাস চোখে চেয়ে রইলো ।

জিষ্ণু বললো, "বসবে না ?"

"না । কাজ আছে । মাসীমাকে সাহায্য করতে হবে রান্নাতে ।"

"কর্তব্য ?"

"না । আনন্দ । সব কর্তব্যই তেতো নয় ।"

"তা ঠিক ।"

তারপর চলে যাবার আগে হেসে বললো, "জানেন ? স্লীপিং ট্যাবলেটস্ খাওয়া
অনেক রকম ব্যাড-এফেক্টস আছে । তার মধ্যে একটা আমার সবচেয়ে বে
অপছন্দ ।"

"কী সেটা ?"

"স্বপ্ন দেখা যায় না । স্বপ্নকে আটকে দেয় ঘুমের ওষুধ ।"

"তাই ? এটা জানতাম না তো ।"

"ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন । স্বপ্নও না দেখতে পেলে মানুষ বাঁচবে ক
নিয়ে ?"

জিষ্ণু নীরবে একবার পিপির মুখে চাইলো । ভাবলো, তা ঠিক । সকালবেলা
আলোয় আলোকিত বারান্দায় ওর সবে-চান-করে-ওঠা আমলা তেলের গন্ধ-মা
পিঠময় ভেজা চুল-ছড়ানো স্নিগ্ধ চেহারা শরতের চিকন দীঘির মতো টলট
করছিলো ।

পিপি বললো, "আসি ।"

নীরবে মাথা নোয়ালো জিষ্ণু। ওকে বসার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো না। বসতে বলার সময় আসেনি এখনও। চলে-যাওয়া পিপির দিকে পেছন থেকে চেয়ে জিষ্ণু ভাবছিলো।

পিপি চলে যেতে যেতে তার নিতম্বে এবং তার ঘাড়ের কাছে কাছে জিষ্ণুর চোখের পরশ অনুভব করেছিলো। ওর অগণ্য অদৃশ্য অনুভূতি বোধের একটি দিয়ে। পিপি ভাবছিলো, পুরুষরা ভালোই হোক কী মন্দ, অর্থবান কী দরিদ্র। সাধু কী লম্পট ; কিছু কিছু ব্যাপারে তারা সবাই এক।

এটা যেমন দুঃখের ; তেমনই সুখের।

লাঞ্চের সময় পরী এসেছিলো। কাকিমার অনুরোধে। লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে যাবে বলে।

দুপুরটাতেও খাওয়ার-দাওয়ার পর খুব ঘুমোলো জিষ্ণু।

আজ কেন এতো ঘুম পাচ্ছে কে জানে ! মেঘলা আবহাওয়া, গানুবাবুদের বাড়ি ভাঙার ফ্রাস্ট্রেশান, এবং কোনো বিশেষ কারণহীন গভীর এক শান্তি। এই শান্তি বেশ কিছুদিন ধরেই অনুভব করছে ও নিজের বুকের মধ্যে। পিপি এখানে আসার পর থেকেই।

দারুণ সর্ষে-মুরগি রেঁধেছিলো পিপি। কাকিমা রেঁধেছিলেন রুই-এর মুড়িঘণ্ট। মোক্ষদাদি ইলিশ মাছের টক। পরী চলে যাবে বলে আয়োজন অথচ সে তো মাছ দেখলেই থুঃ থুঃ করে। বলে, রাবিশ ! প্রায় সব মাছই ওয়াক-থুঃ করে শুধু চিকেনটা দিয়ে একটু ভাত খেয়ে উঠে গেলো।

পিপিকে বলে গেলো, "ঊ্য রিয়্যালি কুক ওয়েল পিপি। বাই দ্যা ওয়ে, হোয়াট আর ঊ্য কুকিং ?"

পিপি একটু অপ্রতিভ হলো কথাটাতে ! কাকিমা বিরক্ত। জিষ্ণু আহত। কিন্তু পরীর নিজের অ্যাটিট্যুড "ক্যুডনট কেয়ারলেস।"

পরীর এ কথাটাও দ্ব্যর্থকই শুধু নয়, কথাটাতে অপমানও ছিলো।

ঘুম থেকে উঠে আয়েস করে চা খেয়ে কিছুটা হেঁটেই এগোলো জিষ্ণু। ভেবেছিলো, তারিণীবাবুর বাড়ি পর্যন্ত পুরোটা না হেঁটে, কিছুটা গিয়ে ; তারপর ট্যাক্সি ধরবে। আবার কী মনে করে ঠিক করলো, পুরোটাই হেঁটে যাবে বাড়ি থেকে। আজকাল হাঁটা বিশেষ হয় না। বেরুবার আগেই পিপিকে বাইবে যাবার পোশাকে দেখেছিলো এক ঝলক। শুধিয়েছিলো, "কোথায় বেরুবে ?"

"হ্যাঁ। কাকিমার সঙ্গে কালীবাড়ি যাবো আমি।"

পিপি বলেছিল।

"ও।"

পিপি বাড়িতে একরকম সাজে, একরকম কথা বলে, একরকম হাঁটে, একরকম

করে তাকায়, আর ওই যখন অফিসে থাকে ওর হাইহিল্ জুতো পরে হাঁটা-চলা, কথা-বলা তাকানো সবই আমূল বদলে যায়। চেনাই যায় না সেক্রেটারী পিপিকে বাড়ির পিপি বলে আদৌ। বরং অবাক লাগে জিষ্ণুর। পরীকে দেখে, পিপিকে দেখে বোঝে যে একজন মেয়ের মধ্যে একাধিক মেয়ে থাকে। পুষিকে দেখেও বুঝতো।

তারিণীবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে জিষ্ণু দেখলো, মোড়ের কাছে একটি বড় জটলা। প্রথমে ভাবলো, আজ রবিবার, কোনো রাজনৈতিক দলের মিটিং-টিটিং হবে হয়তো। কলকাতার রাজনীতি মানেই তো গলাবাজী আর বক্তৃতা। কিন্তু যতই এগোতে লাগলো ততই বুঝতে পারলো যে, কোনো রাজনৈতিক দলের রোদে-দেওয়া কাসুন্দির হাঁড়ির উচ্ছ্বাস নয়, ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা নয়, সত্যিই কোনো কারণে জনতা অত্যন্ত উত্তেজিত। এ বক্তৃতাবাজী শোনার জন্যে জমায়েত হওয়া জনতা নয়। বোমাবাজীর জন্যে তৈরি হচ্ছে এরা।

ঠিক সেই সময়েই একটি পুলিসের গাড়িও এসে দাঁড়ালো সেখানে। উত্তেজিত জনতা পুলিসের গাড়ির গায়ে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগলো জোরে জোরে। গাড়ি থেকে একজন অফিসার নেমে জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার গায়েও দু-চার ধাক্কা দিলো জনতা।

পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে একেবারেই স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে গেলো জিষ্ণু। ফুটপাথের ঠিক পাশেই তারিণীবাবু পথের উপরে পড়ে আছেন হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে। তাঁর মাথাটা পথের সঙ্গে থেঁতলে এক হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসে এক জান্তব প্রতিবাদের মতো চেয়ে আছে এই শহরের সর্বংসহ মানুষদের দিকে। আর তাঁর এক-দেড় গজ দূরেই তাঁর প্রিয় কুকুর ভুলো। ভুলোর কালো গায়ের ঘন চুলগুলি লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

"মিনিবাস ?"

জিষ্ণু দাঁত চেপে শুধোলো "ইস্‌স্" "ইস্‌স্" করতে-থাকা পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে।

"না। প্রাইভেট বাস। ড্রাইভার বাস নিয়ে পালিয়ে গেছিলো। তারপর কিছুদূর গিয়েই বাস থেকে নেমে ড্রাইভার কনডাকটর পথের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেছে।"

"আপনারা কী করছিলেন ?"

উত্তেজিত, কিন্তু পরাস্ত স্বরে জিষ্ণু বললো।

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি কি ঐ বাসে ছিলাম না কি ?"

ভদ্রলোক আর কী বললেন গোলমালে শোনা গেলো না।

"দেড়শোজন যাত্রীর একজনও তাদের ধরবার কথা ভাবেননি।"

"জনতা বাসটাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছিলো।"

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বললেন।

"ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে ।"

অন্যজন বললেন ।

"পুলিসের গাড়ি ডেড-বডি তুলে নিয়ে এখন মর্গে যাবে ।"

আরেকজন বললেন ।

জিষ্ণু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো !

একজন বললেন, "বারাসতের বাস ।"

অন্যজন বললেন, "নাম্বারটা লিখে রেখেছি । এই নাম্বার । পুলিসকেও দিয়েছি ।"

জিষ্ণু নাম্বারটা টুকে নিলো পকেটের ছোট ডায়ারীতে । কিন্তু ও জানে যে, কিছুই হবে না । বেচারী সার্জেন্ট কী করবেন ? দেড়শো জন যাত্রীর মধ্যে কারোরই যদি বিবেক বলে কিছু না থেকে থাকে, তাঁদের একজনও যদি বাসটি সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে ড্রাইভারকে পুলিসের হাতে দেবার কথা না ভেবে থাকেন, তবে এমন করে রোজ রোজ মানুষ মরাই ভালো । তারিণীবাবু, পুষি কেউই ওঁদের কেউ নন । কিন্তু একদিন ওঁদের ভীষণ কাছের কেউও এমনি করেই মারা যাবেন । সেদিন হয়তো ওঁরা বুঝবেন যে আমরা সকলেই সকলের । অন্যের বিপদ অন্যের আনন্দও যে ওঁদেরও বিপদ ওঁদেরই আনন্দ । যতদিন একথা সকলে বুঝছেন ততদিন এমনি করেই রাজনৈতিক নেতা, কর্পোরেশন, পাড়ার মস্তান, পিকলুর মতো চোর গুণ্ডা বদমাশ এবং পুলিসও এমনি রামরাজত্ব চালিয়েই যাবে । নিজেদের বাঁচালে তবেই ওঁরা নিজেরা বাঁচবেন । এবার স্বপ্নে নয়, বাস্তবেই মারতে হবে ড্রাইভারকে । ভাবলো জিষ্ণু । আইন যে দেশে তামাশা আর যে তামাশা শুধু বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করে দেখতে পারে, সেখানে আইন নিজের হাতে না তুলে নিয়ে কোনো উপায়ই নেই । এ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয় । বাঁচার এখন এই একমাত্র পথ । টেররিজম্ । টেররিজম ইজ দ্যা ওন্‌লি ওয়ে আউট । কবিতা লেখার দিন আর নেই ।

মামণির কাছে কি যাবে একবার ? ভাবলো জিষ্ণু । কী বলবে গিয়ে । তাকে ? কী সান্ত্বনা দেবে ? মামণি তার কে ? হয়তো হতে পারতো । এখন মামণির চেয়েও আরও অসহায় পিপি মামণির জায়গা নিয়েছে । তবে যাবে নিশ্চয়ই । মামণির বিয়ের দায় অনবধানে এখন জিষ্ণুর উপরেই বর্তে গেলো । পরে যাবে । কালকে শ্মশানেও যাবে । দুর্ঘটনায় বা অপঘাতে মৃত্যুর ভয়াবহতার চেয়েও লাশকাটা ঘরে যাওয়া আরও ভয়ময় অপঘাত ।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভারকে বললো, "ভিকটোরিয়া ।"

প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে যখন ট্যাক্সিটা এসেছে তখনই হঠাৎ জিষ্ণু লক্ষ্য করলো যে, তার ট্যাক্সির ঠিক পেছনে পেছনে অন্য একটা ট্যাক্সি । সেটা আসছিলো বেশ

কিছুক্ষণ ধরেই। আগে দেখতে পায়নি ও। এখন দেখলো, সামনের সীটে পিকলু বসে আছে।

কখন এলো ঐ ট্যাক্সিটা ? তারিণীবাবুর বাড়ির মোড়ের থেকেই কি ওরা পিছু নিয়েছিলো ? নাকি ওদের গলি থেকেই কেউ ফলো করছিলো ওকে।

জিষ্ণু একবার ভাবলো, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে যে বাড়ি ফিরে যেতে। তারপরই ঠিক করলো যে, না। অন্যায়কারীর শরীরে বল থাকতে পারে, বুকে তার বল থাকে না। পিকলু কী করতে চায়, দেখবে ও।

ভিকটোরিয়ার পেছনের গেটে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো জিষ্ণু। ও ট্যাক্সি থেকে নামতেই পেছনের ট্যাক্সি থেকে পিকলু এবং আরো দুজন লোক নামলো একজন লুঙি-পরা। অন্যজন পাজামা। দেখে মনে হলো, বিহারী মুসলমান।

পিকলু ওকে হাত তুলে জিষ্ণুকে বললো, হাই ! যেন মস্ত সাহেব।

কী রে ! ময়ূরপুচ্ছপরা কাক।

মনে মনে বললো জিষ্ণু।

মুখে বললো, "কী ব্যাপার ?"

"বেড়াতে এসেছিস তো ? আমিও। চল্, ভিতরে যাই।"

তখনও বেলা ছিলো। দিনের আলোতে অনেক সাহস থাকে। সৎ সাহস তো নিশ্চয়ই।

জিষ্ণু বললো, "চল। তোর সঙ্গে এরা কারা ?"

"রমজান আর জাহাঙ্গীর। আমার সাকরেদ।"

"রেস-এর মাঠের ?"

"রেস-এরও বটে, ডিমলিশনেরও বটে। আজ এরা ডিমলিশনের সাকরেদ।"

রমজান-এর চুল ছোট করে ছাঁটা। বাঁধানো দাঁত। কাকের মতো কালো গায়ের রঙ। গায়ে নীল টেরিলিনের শার্ট। দেখলেই মনে হয়, স্মাগলার। আর জাহাঙ্গীরকে দেখতে ঠিক নিউ মার্কেটের মুসলমান ফলওয়ালাদের মতো। এরা দুজনে কি পাকিস্তানের চর ? ইদানীং অনেক মানুষকে দেখে, যাদের সঙ্গে ভারতের ভালোমন্দর কোনো যোগাযোগ নেই। এদের সংখ্যা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিত বোধ করে জিষ্ণু।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে যে গাছতলায় জিষ্ণু পিকলুকে শুইয়ে টাইয়ের ফাঁস লাগিয়েছিলো সেই গাছটার কাছেই এলো।

পিকলু বললো, "আয় বোস্।"

ওর কথায় সম্মোহন ছিলো।

"তোর সঙ্গে কথা আছে।"

জিষ্ণু বললো।

এই সময়ে জিষ্ণু একবার ভাবলো গলা ছেড়ে লোক ডাকে। তারপরই ভাবলো, দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভয়ে নয়, এক আশ্চর্য একরোখা জেদ ওর পা দুটিকে ও কণ্ঠকে অনড় নিঃশব্দ করে দিলো। ও মনে মনে বললো, পিকলুর মতো একটা বদমাইশের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে ও ? না। পালাতে শেখেনি জিষ্ণু।

জিষ্ণু বললো, "তুই এখনও নিজেকে বদলাতে পারতিস। তুই কী করে, এমন কী করে হয়ে গেলি রে' পিকলু ?"

"তুইও যেভাবে।"

পিকলু বললো, মুখে ক্রূর হ'সি নিয়ে।

আমি বদলাইনি। কিছু পবিবর্তন হয়েছে আমার পরিবেশে, অবস্থায় ; এই পর্যন্ত।"

জিষ্ণু বললো।

"আমারও তো তাই-ই।"

বলেই, বললো, "চিনেবাদাম খাবি জিষ্ণু ? সেই কলেজের দিনের মতো ?"

"নাঃ।"

"তোর মনে আছে ? 'লা দোলসে ভিতার' সেই কথাটা। টু ডাই উইথ আ ব্যাঙ্গ অ্যাণ্ড নট্ উইথ আ হুইম্পার ? তুই খুব পছন্দ করতিস কথাটা।"

"এখনও করি।"

"করিস ? ফাইন।"

পিকলু ওর সামনে বসলো। লোক দুটো দুপাশে। বেলা দ্রুত পড়ে আসছিলো। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিলো। তাদের গলার সজীব সুন্দর পাখির মতো স্বর ভেসে আসছিলো জিষ্ণুর কানে। পিপির মেয়ে তিতির বয়সী ছেলেমেয়ে সব। তাদের মা-বাবারা কি জানেন কলকাতা এক ভয়ংকর জায়গা হয়ে গেছে ? এমনভাবে বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় ? খুন হয়ে গেলে, চাপা পড়ে মরে গেলে, যারা চাপা দেয় বা যারা খুন করে সেইসব ড্রাইভাব এবং খুনীদের কাবোরই শাস্তি হয না এখানে ? যেখানে মানুষ পথে মরে পড়ে থাকে আর তার পাশ দিয়ে পাইলট-কারের পিলে-চমকানো আওয়াজ ছড়াতে ছড়াতে জন-দরদী মিনিস্টারের লাল আলো-জ্বালানো সাত লাখ টাকা দামের গাড়ি হুসস্ করে বেরিয়ে যায়।

অন্ধকার হয়ে গেলো। পিকলু ওর ট্রাউজারের পকেট থেকে কী একটা জিনিস বের করলো।

বললো, "পারিস চিনতে ?"

"কী ?"

"তোর টাইটা। আমাকে দিয়েছিলি না ?"

"দিয়েছিলাম।"